॥ ভূমিকা ॥

বাঙলাদেশ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র। অনেক ত্যাগ, সাধনা ও রক্তের বিনিময়ে এখানে স্বাধীনতা এসেছে। মুক্ত এশিয়ার ইতিহাসে সর্বকালের জন্য বাঙলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে রইল।

বাঙলাদেশ এক সার্বিক গণ-জাগরণের মূর্ত প্রতীক। বলাবাহুল্য, এমন গণ-জাগরণ ও সমর্থনই জাতীয় স্বাধীনতার পটভূমিকা রচনা করে থাকে।

এই ধরনের গণ-জাগরণ গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। বাঙলা-দেশের মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সঞ্জীবিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। বাঙলা-দেশকে 'জাতীয় সঙ্গীত' দিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর 'সমর সঙ্গীত' দিলেন নজরুল। বাস্তবিকই এই দুই মনীষাকে বাদ দিয়ে বাঙলাদেশকে কল্পনা করা যায় না। এই কারণেই বাঙলাদেশ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল আজ একাত্ম ও অভিন্ন।

বাঙলাদেশের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে জাতীয় সত্তার সন্ধানে, অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল মানসিকতা সংগঠনে অনন্য সাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এই চিরস্মরণীয় অবদানের নানামুখী আলোচনা করা হয়েছে এই সংকলনে। দুই বাঙলার বিশেষজ্ঞরা এখানে অংশ গ্রহণ করে গ্রন্থটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেছেন।

এই সংকলনের অধিকাংশ রচনাই বিগত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে (নয় মাস) লেখা, অবশিষ্টগুলিও এই মুক্তিযুদ্ধেরই পটভূমিকায় পরিকল্পিত। স্বাধীনতা লাভের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য ঘটনা স্রোতেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বাঙলাদেশ প্রসঙ্গে অজস্র সাহিত্য সৃষ্টি হলেও ঠিক এই ধরনের সংকলন প্রস্তুত হয়েছে বলে জানা নেই। সেদিক থেকে এই পুস্তকটি জনসাধারণের একটি অতৃপ্ত তৃষ্ণাকে অন্ততঃ কিছুটা মেটাতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রত্যেকটি লেখককে তাঁর গবেষণা ও যোগ্যতম প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এই সংকলন প্রকাশে উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রদর্শন করে ওয়ার্লড প্রেসের শ্রীশ্রীপতি ভট্টাচার্য আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এই ধরনের সংকলনে বিভিন্ন লেখকের অনুসৃত বানান এবং বাক্যগঠন পদ্ধতি ভিন্নভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক ; আমরা সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সেইভাবেই রেখেছি। কারণ, আমাদের মতে, এতে লেখকের নিজস্বতা বর্তমান থাকে। তবে দ্রুত প্রকাশের উদ্যোগে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকবৃন্দ সেগুলি মার্জনা করে নেবেন।

॥ উৎসর্গ ॥

…সেই সব নাম না জানা শহীদের উদ্দেশ্যে—জাগ্রত বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাদের উৎসর্গীকৃত প্রাণ আজ ইতিহাসের বিস্ময় এবং বাঙলা ভাষা ও বাঙালার মর্যাদাকে স্থায়িত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠায় আজ পর্যন্ত যাদের মহৎ প্রাণ নিঃস্বার্থে নিবেদিত, তাঁদেরই স্মরণে…

॥ সূচীপত্র ॥

রবীন্দ্রনাথ
নজরুল
ও
বাঙলাদেশ

প্রথম পর্ব :

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন বাস্তববাদী বিপ্লবী

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনন ও ভাব—এই দুইয়ের সমন্বয়ে যাকে আমরা জীবনের আদর্শ বলে থাকি সেটি রচিত হয়। এই 'রোজ আনি রোজ খাই'-য়ের যুগে শুধু দেহের অন্ন নয়, মানসের খোরাকও এই দিনের প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা সাধারণ মানুষের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়, তারা দিনের চাহিদা মিটতে পারলেই খুসি থাকে। তাদের দোষ দেওয়াও যায় না। প্রতিটি দিনের জৈবিক দাবী মেটাতে তারা এতোই হয়রান যে তার সীমা অতিক্রম করে চিন্তাকে ও ভাবকে রোজকার এলাকার বাইরে অভিসারে পাঠানো ইতিহাসের পরিণতির খোঁজ নেওয়ার জন্যে ও তার হদিশ পাওয়ার জন্যে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। রোজকার জীবনের চাহিদা মেটাতে মানুষ ক্লান্ত ও অবসন্ন। সেই বাড়তি, সেই উপরন্ত শক্তিটুকু কোথায় তাদের যে তা দিয়ে তারা তাদের মানসকে ও ভাবকে চালিত করবে ঐতিহাসিক পরিণতির সন্ধানে!

অথচ এই পরিণতির ধারণা ও ভাবনা না থাকলে জীবন নিরর্থক হয়ে যায়, প্রতিদিনের জীবন-ধারণেরও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। মন রস পায় না জীবনের মৃত্তিকা থেকে, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে বুকের ভিতরটা।

গোড়াতেই বলেছি মনন ও ভাব—এ দুয়ের মিলন ঘটাতে না পারলে আদর্শের নাগাল পাওয়া যায় না। শুধু চিন্তা দিয়ে হয় না, শুধু ভাব দিয়েও হয় না। মগজের চিন্তাটাকে বুকের ভাবের রসে জারিয়ে নিতে হয় তবে চিন্তা গতি লাভ করে।

কিন্তু এই যে আদর্শ, যাকে স্পর্শ করে মানুষের সত্তা শত হতাশা, লাঞ্ছনা ও বাইরের পরাজয়কে তুচ্ছ করে জীবনের পথে চলে,—চিন্তায় ও ভাবে দৈন্য ছিলো না, ফাঁকি ছিলো না, এই কারণেই একজন মানুষ তার প্রাণের বহু-বাঞ্ছিত দীর্ঘ-প্রত্যাশিত, সারা জীবনের আহুতির দ্বারা একান্ত ভাবে পূজিত সেই আদর্শ সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এইটে সে দেখে যাবেই এটা কি বলা যায় নিশ্চয়তার সঙ্গে? আদবেই সেটা বলা যায় না। কেন না এক ব্যক্তির চিন্তার ও ভাবের সঙ্গে যেমন অনেকের মননের ও ভাবের মিল আছে, তেমনি বহু লোকের

চিন্তার ও ভাবের গরমিলও আছে। তাই এই বহু বিভিন্ন চিন্তার ও ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাতের ফলে যে আদর্শকে একজন মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছে ও সেবা করেছে তার সামাজিক প্রতিফলন সেই ব্যক্তির জীবনে সম্ভব নাও হোতে পারে। তবুও মানুষ সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই আদর্শকে ধরে থাকে কেন ও কি করে ?

এই জন্যেই সে পারে যে তার জীবনের অতি সীমিত কালের পরিধির মধ্যে সে তার আদর্শকে বন্দী করে রাখেনি বলে।

খণ্ডকালের দেনাপাওনার হিসেবে যেটি অ-বাস্তব, মানব-ইতিহাসের সুদীর্ঘ বহুদূর-বিস্তৃত বিরাট কালের গতি-সন্ধানী মর্মগ্রাহী মনের কাছে সেটি বাস্তব। স্বীকার করতেই হবে যে আদর্শবাদীর এই বাস্তবের মধ্যে মনন ও ভাবের সঙ্গে কল্পনারও মিশ্রণ যথেষ্ট আছে। তবুও কতোটুকুই বা সত্যি করে পাওয়া যায় জীবনে, আর কতো বিরাট থেকে যায় জীবনে না-পাওয়ার অংশ! মানুষ তার অন্তরের সেই না-পাওয়ার শূন্যতাকে কল্পনা দিয়ে ভরাট করে নেয়, আর তার হৃদয়ে আদর্শ-মানসীকে না পাওয়ার জন্যে যে বিরহ আছে, কল্পনা সেই বিরহের ক্ষণে ক্ষণে মিলনের আশ্বাস দেয়। কল্পনা তাই সেই শক্তি যা না-পাওয়াকে পাইয়ে দেয়, আদর্শ-মানসীর সঙ্গে বার বার হৃদয়ের মিলন ঘটায়, ও মানুষকে সেই অন্তমিলনের শক্তিতে দুঃখজয়ী করে তোলে।

এ না হলে সংবেদনশীল আদর্শবাদী মানুষ ঘটনার নির্মম আঘাতে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে যেতো। তাই শুধু বিশ্লেষণ, বিচার ও ইতিহাসের গতির স্বচ্ছ ধারণাই যথেষ্ট নয় মানব-যাত্রীর পক্ষে, মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্যে অন্তরের গভীর ব্যাকুলতা, প্রবল ভাব-পিপাসাও একান্ত প্রয়োজনীয় শক্তি যুগিয়ে দেয় তাকে পথ চলার কালে।

এই ভাব বাস্তবকে অস্বীকার করে, যা নিত্য ঘটছে তার চারপাশে তার অনিত্যতা সম্বন্ধে কোনই সংশয় পোষণ করে না সে অন্তরে। মাটিতে ফুটে সূর্যমুখী যেমন দূর আকাশের সূর্যের সঙ্গে মিতালি পাতায়, ঠিক তেমনি করে অন্তরের ভাব-জগৎ সমকালীন ঘটনার প্রবল আঘাতকে ক্ষণিকের বীভৎসতা বলে ঘোষণা করে, তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করে, প্রাণও দেয় তাকে বাধা দিতে গিয়ে। ভাবের এই পরম শক্তি কিন্তু শুধু বুদ্ধি, বিচার ও বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। আত্মিক বোধ, কল্পনার উপাদান—সব কিছু এই ভাবের অন্তরে বিরাজমান।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একেই আমি রোম্যান্‌টিসিজম্ বলি—সুদূরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে মানুষের পথ-চলা। এই রোম্যান্‌টিসিজমের অন্তরে আছে প্রচণ্ড বিদ্রোহের শক্তি, অবিশ্রাম-গতিপ্রবণতা, স্থাণুত্বের প্রতি ঘৃণা, কাঠামো-সর্বস্বতার বিরুদ্ধতা, সামাজিক কাঠামো ভেঙে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার ইঙ্গিত, মানুষকে সৃষ্টিশীল করবার সাধনা, মানুষের যেটা স্বরূপ, তার যাত্রীর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা।

প্রতিটি বিপ্লবী, প্রতিটি সৃজনধর্মী মানুষের অন্তরে তাই আছে রোম্যান্‌টিসিজম্ অর্থাৎ আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে, পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে, আনন্দিত মনে পথ-চলার অপরাজেয় শক্তি।

মানব-ইতিহাসের প্রতিটি বিপ্লবের যুগে অগুন্‌তি সৃষ্টিশীল রোম্যান্‌টিক মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। খাঁটি রোম্যান্‌টিসিজমের সঙ্গে তাই সৃজনশীলতার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। এই সৃজনশীল মন সত্য করে রঙ ও রসের আস্বাদন পেয়েছে বলে ক্রূরতা, ছন্দোহীনতা সহ্য করতে পারে না ব্যক্তিগত কিম্বা সামাজিক জীবনে। তাই বিদ্রোহ হচ্ছে রোম্যান্‌টিক মনের স্বাভাবিক প্রকাশ। এই রোম্যানটিসিজ্‌মের সঙ্গে তাই ঝুটো রোম্যানটিসিজ্‌মের কোনো সম্পর্ক নেই। ঝুটো রোম্যান্‌টিসিজ্‌ম্ বিদ্রোহ করে না অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সে সরে পড়ে, গৃহকোণে লুকিয়ে থাকে ও দিবাস্বপ্নে মশগুল্ হয়ে দিন কাটায়। এই মনোবৃত্তিকে রোম্যান্‌টিসিজম্ আখ্যা দেওয়া একেবারেই সঙ্গত নয়—এর যথার্থ নাম হচ্ছে ক্লীবত্ব, আত্ম-বিলাসী, ব্যক্তি-সত্তা-বিরোধী ও সমাজ-বিরোধী মনোভাব।

এই রোম্যানটিক মনোভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব কবিতা আছে তাঁর 'নবজাতক' কাব্য-গ্রন্থে। কবিতাটির নাম—'রোম্যাণ্টিক'।

কবি বলছেন—"আমারে বলে যে ওরা রোম্যাণ্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ-পথের পথিক।"

কবি অকপটে পরম গর্বের সঙ্গে স্বীকার করছেন যে তিনি রোম্যাণ্টিক, রস-তীর্থের পথে তিনি যাত্রী। তিনি স্রষ্টা, বিধাতার কারুশালা থেকে রঙ ও রস চুরি করে এনে তিনি রচনা করেন কবিতা, তিনি বাঁধেন গান। তাঁর সৃষ্টি বাস্তবের ফোটগ্রাফ নয়, বাস্তবের নকলনবিশিয়ানা নয়। স্রষ্টার বাস্তব, কবির বাস্তব সেই ভবিষ্যত যে ভবিষ্যতে কুশ্রীতা নেই, দৈন্য নেই, পাশবিকতা নেই। যা ঘটছে, যা জীবনকে পীড়া দিচ্ছে ও কলুষিত করছে সেই ঘটনাগুলিকে দূর করবার জন্যে

'বাস্তব' সাজবার প্রয়োজন নেই। সৌখিন বাস্তববাদী সেজে জীবনের এই কুশ্রীতা দূর করবার অভিনয় করবার দরকার নেই।

যে রোম্যাণ্টিক্ সেই এই কুশ্রীতা দূরে করবে, কেন না রোম্যাণ্টিক তার অন্তরে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছে, সে জানে ও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে মানুষের জীবন ঘিরে যে অন্ধকার তাকে দূর করাই হচ্ছে মানুষের মহোত্তম ব্রত।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

"যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি,
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম;
সেথায় নির্মম কর্ম;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ';
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে,
চলে হাতে হাতে।"

রঙীন উত্তরী ফেলে বর্ম পরে সুন্দরের সাথে ভৈরবের মিলন ঘটিয়ে যে কর্মের জগতে চল্তে পারে, সেই প্রকৃত রোম্যাণ্টিক, একমাত্র সেই পারে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে কুশ্রীতা দূর করে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে।

'রোম্যাণ্টিক' রবীন্দ্রনাথের সমকালীন জগতের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কি ধারণা ছিলো সেটি জান্‌লে 'শৌখিন বাস্তব' যাঁরা তাঁদের যে বিশেষ কোনো উপকার হবে সে আশা করি না, কিন্তু এই ঝুটো বাস্তববাদী ছাড়া যে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

১৩৪২ সালে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাতে বলেন—"মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকের চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে।"

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে কবি ভারতবর্ষের রূপ বর্ণনা করেছেন অপরূপ ভাষায়—'অয়ি ভুবনমন-মোহিনী' গানে তিনিই আবার ছাত্রদের সম্ভাষণ করে বলছেন—"ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপর শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন এ কথা ধ্যান করা নেশা মাত্র, কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানা পুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহা রোগীকে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।"

অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞানকে ধিক্কার দিয়ে 'রোম্যান্টিক' রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"কেবল মাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়া জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।"

'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয়, নিজের নিষ্কর্ম থেকে।"

১৩১৩ সালের ৪ঠা কার্তিক তারিখে নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"তোমরা বাঁচাও এই দেশকে। অন্ন দাও, শিক্ষা দাও, ধর্ম দাও।...দেশে যখন ফিরে আসবে তখন দেখতে পাবে এখানে করবার জিনিস অনেক আছে কিন্তু করবার পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। শুধু তাই নয়, এখানকার হাওয়া আলস্য জড়তার বীজে পূর্ণ। চারিদিকের লোক কেবলই ছোট চিন্তা, ছোট কথা, ছোট কাজ নিয়ে আছে—সেই দেশব্যাপী ক্ষুদ্রতার ভাবাকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল, এখানে সমাজের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চয় নেই—নিজের ভিতর থেকে কল্যাণের উৎসকে উৎসারিত করতে হবে। এই ক্ষুদ্রতার সপ্তরথী বেষ্টনের মধ্যে পড়ে হতাশ হোয়ো না। প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে যখন আশু সফলতার লক্ষণ দেখতে পাবে না তখন যেন নিজের বা দেশের বা বিধাতার উপর রাগ করে হাল ছেড়ে দিও না। মনে এ কথা স্থির রেখো যে সিদ্ধিই যে একমাত্র লাভ তা নয়, সাধনাও মস্ত লাভ।"

১৩১৫ সালে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় যখন কিছুদিনের জন্যে শিলাইদায় স্থানান্তরিত হয় তখন শিক্ষক ভূপেশচন্দ্র রায়কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"প্রজাদের বাস্তবাড়ি ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস কলা খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে মজবুত সূতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমূল, আঙুর প্রভৃতি গাছ

স্থায়ী হবে এবং ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে থাকবে, কেন না এইটেই বর্তমান কালের সঙ্গে সঙ্গত।"

ফসল বাড়ানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথ সমবায় প্রণালীতে কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্তনের উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়েছিলেন, আর কংগ্রেস গভর্মেণ্ট ও তথাকথিত বামপন্থীদের যুক্তফ্রণ্ট গভর্মেণ্ট চাষীদের ভোট নিজেদের কোঁচড়ে কুড়াবার জন্য আল-বাঁধা টুকরো জমিগুলোকে আরো টুকরো করে চাষীদের মধ্যে বণ্টন করবার নীতি গ্রহণ করেছিলো। তার ফলে বাংলার কৃষি-ব্যবস্থার সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। উৎপাদন বাড়া তো দূরের কথা, উৎপাদন ক্রমশই কমে যেতে বাধ্য অর্থনীতি-বিরুদ্ধ এই নীতি অবলম্বন করার ফলে।

এইতো গেলো অতি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। এখন এই সমকালীন জগৎ ও তার সমস্যাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন সেটা দেখা যাক। সাচ্চা দেখনেওয়ালাদের দৃষ্টিতে সমকালীন সমাজ হচ্ছে সেই বীভৎস ব্যবস্থা যেখানে মানুষের বলি অবাধে করে চলে ধন-ব্যবসায়ীরা, যেখানে জাতীয়তাবাদের অপদেবতার পূজা, যেখানে ক্ষমতা-দানবের পায়ে মাথা লুটায় মানুষ। ধনতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ সমস্ত পৃথিবীকে দখল করতে উদ্যত, তার রাক্ষসী লোলুপতার জন্যে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে রক্ত-বন্যায়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দেখা এই বর্তমান জগতের, এই সমকালীন মানব-সমাজের রূপ কি? রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"আজকাল চলছে যা কিছু সব ধনপতির হাতেই চলছে।" (কালের যাত্রা)

বলছেন মহাকবি—"এ যুগে পুষ্পকরথের ছিলেটাও বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার। তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।" (কালের যাত্রা) শুধু কি তাই? সমকালীন জগতে প্রাকৃতিক কারণে একটি মানুষেরও মরবার কোনো হেতু নেই। একটি দেশে যদি আকাল আসে, বন্যায় সব ফসল নষ্ট হয়ে যায় কিম্বা বৃষ্টির অভাবে ফসল না ফলে, তাহলেও সেই দেশের লোকদের অন্নাভাবে মরবার কোনই কারণ নেই। সারা পৃথিবীতে এতো অপর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য তৈরী হচ্ছে আর এতো শীঘ্র সেই সব খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দেওয়া যায় দেশ থেকে দেশান্তরে যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাকে জয় করেছে মানুষই এই বর্তমান যুগে। তবুও মানুষ অনাহারে মরছে কি কারণে? মরছে প্রাকৃতিক কারণে নয়—

রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে। ধনতান্ত্রিক সমাজের যারা মোড়ল তারা সব উৎপন্ন ফসলের একচেটিয়া অধিকার নিজেদের হাতে রেখে মুনাফা লোটবার উন্মত্ত লালসায় খাদ্যদ্রব্যগুলি আটক করে রাখছে, বুভুক্ষ মানুষের কাছে পৌছতে দিচ্ছে না। কোনো জিনিস বেশী উৎপন্ন হলে, তাকে নষ্ট করে এই সর্বনেশে কৃত্রিম উপায়ে তার দাম বাড়াচ্ছে—এক কথায় বিশ্বের অপরিমিত খাদ্য-উৎপাদন মুনাফাখোর নর-রাক্ষসদের পৈশাচিক ব্যবহারে বিশ্বমানবের কল্যাণে লাগ্‌ছে না। এই সামাজিক কারণেই মানুষ আজ অনাহারে মরছে—মুনাফা-লোলুপ নর-রাক্ষসরাই মানুষের অনাহারে তিল তিল করে মরার কারণ।

এই নির্মম ধনতান্ত্রিক মুনাফাধর্মী সমাজ-ব্যবস্থার মুখ থেকে মেকী সভ্যতার চিকন ঘোমটাটিকে টেনে খুলে ফেলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গভীর সমাজ-চেতনার পরিচায়ক কয়েকটি কথায় মানুষের উপবাসের কারণ দর্শিয়েছেন। তিনি লিখছেন —"ভরা ফসলের ক্ষেতে বাসা বেঁধে আছে উপবাস।"—ফসলহীন ক্ষেতের দরুন মানুষ মরছে না উপবাসে এ যুগে। এ যুগে ভরা ফসলের ক্ষেতে উপবাসের আস্তানা—অর্থাৎ পর্যাপ্ত ফসল থাকা সত্বেও মানুষ আজ অন্নহীন, উপবাসী। এর অর্থ অতি সুস্পষ্ট। টীকা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— "মুনাফার লোভে, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষায় মানুষের সত্য আজ সর্বত্র যেমন আচ্ছন্ন হয়েছে এমন আর কখনো হয়নি।" (যাত্রী)

বল্‌ছেন মহাকবি—"যে দুঃখের কথাটা বলছি এই জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে, আজ মুনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এই জন্যেই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা, এতো সহজ হল। মানুষের ফুলে-ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপ্‌সে-যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। সর্বভুক পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয় নি।" (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী)

পরশ্রমভোগী ধনিকদের এই নির্মম লুণ্ঠনকে রবীন্দ্রনাথ 'সর্বভুক পেটুকতা'-র বীভৎস প্রকাশ ও চূড়ান্ত অমানুষিকতা বলে নিন্দা করেছেন।

শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবে গ্রামবাসীদের সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার থলি নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বড়ো বড়ো হিসাবের খাতা ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার সঙ্গে কারো সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই করে তার মধ্যে সে বসে আছে, সর্বসাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়?

··দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্থ হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন দেখে 'তারা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ সুগম করবে'—এই ভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্থ হয় তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।··· এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে? তাদের সুখদুঃখের কি হিসেব আছে? প্রতিদিনের পাওনা গুণে দিয়ে তার কাছে বসে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, সুখও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবত্ব। দয়ামায়া, পরস্পরের সহজ আনুকূল্য, দরদ—কিছু থাকে না।"

সমকালীন সমাজ-ব্যবস্থার হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কতো সচেতন ছিলেন ও কি কঠোর ভাবে যে তার সমালোচনা করেছেন তা তাঁর উক্তিগুলি থেকেই সুস্পষ্ট।

বর্তমান সময়ে সভ্যতা নাম দিয়ে যে অপরূপ বস্তুটি ধনতান্ত্রিক সমাজের ঘোড়লবা ফিরি করে ফিরছেন সেই সভ্যতার স্বরূপ উদঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"বর্তমান সভ্যতায় দেখি এক জায়গায় একদল মানুষ উৎপাদন-চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। এক দিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করেছে, অন্য দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ সেখানেই কেন্দ্রীভূত। স্বভাবত সেখানেই আরাম, আরোগ্য, আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্য দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। **এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বেঁধে আছে তার বাসা বেশী দিন টিকতেই পারে না।"**

এই কথাই নানা ভাবে বারবার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বলছেন মহাকবি—

"ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে,

ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।"

বলছেন—

"প্রতাপের ভোজে আপনারে
যারা বলি করেছিল দান,
সে-দুর্বলের দলিতপিষ্ট প্রাণ,
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে,
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।"

একদিকে যখন ক্ষুধাতুর অন্ন বিনা মরছে, ভূরিভোজীরা সভ্যনামিক পাতালে লুটের ধন জমাচ্ছে, নরমাংসাশীরা দুর্বলের মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে ও সমস্ত পৃথিবী রক্তের পাঁকে ভরে দিচ্ছে, তখন যারা লোহার সিন্দুক ভরে নিয়েছে লুটের মালে তারা শান্তির বুলি আওড়ে নিজেদের লুট বাঁচাবার চেষ্টা করছে। এই সকল ধার্মিকদের অগ্নিজ্বালা কঠোর বিদ্রূপ করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গীর্জায়
চাটু বাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা ভীত প্রার্থনা-রবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শতশত দড়িদড়া।
স্তূপাকার লোভ বক্ষে বাঁধিয়া জমা,
কেবল শাস্ত্র মন্ত্র পড়িয়া লবে বিধাতার ক্ষমা।
সবে না দেবতা হেন অপমান, এই ফাঁকি ভক্তির,
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ কল্যাণশক্তির।
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করিয়া শেষে,
নূতন জীবন নূতন আলোকে জাগিবে নূতন দেশে।"

কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত তার জন্তে অপেক্ষায়মান যুগের প্রান্তে এই লোভী, ভীরু ও কৃপণ নকল-ধার্মিককে তার ইসারা দিয়ে কবি তাঁর অন্তর দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

"মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও,
শক্তি দাও মোরে, কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী।
শিশুঘাতী, নরঘাতী কুৎসিত বীভৎসাপরে
ধিক্কার হানিতে পারি যেন,
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের হৃৎস্পন্দনে।"

এই তো বর্তমান বিশ্বের অবস্থা, সমকালীন মানব-সমাজের চেহারা, এই অবস্থাই কি চিরন্তন হবে? ক্ষেত ফসলে ভরা থাকতেও কি কোটি কোটি লোক উপবাসে মরবে, যেহেতু লোভী, কৃপণ, শিশুঘাতী ও নরঘাতী নকল-ধার্মিকের দল সমাজ ও রাষ্ট্র দখল করে বসে আছে? মানুষের মনুষ্যত্বে অশেষ-আস্থাবান, মানুষের স্বর্গজয়ী অপরাজেয় শক্তিতে অসীম-বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ কি কখনো এই নারকীয় অবস্থাকে অপরিবর্তনীয় বলে মানতে পারেন?

কবি বলছেন— "এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাটোর কবর রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।"

এই যুগের অবসান যে রক্ত-মাখা পঞ্চম অঙ্কে হবে, ঝড় যে আসছে যুগ-দিগন্তে, সে ঝড় যে কঠিন ভাবে যাচাই করবে আমাদের, সে কথা কাল-বৈশাখীর মতো আমাদের প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"দামামা ঐ বাজে,
দিন বদলের পালা এলো
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
... .
শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে—
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কি যাবে কি রইবে।
পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তাই উঠেছে বাজি।"

সেই অনাগত ভবিষ্যৎ কি ব্রত সাধন করবার জন্যে আমাদের ডাকছে তার ইঙ্গিত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"কী হবে মন্তরে! কালের পথ হয়েছে দুর্গম। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত। করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।" (কালের যাত্রা)

কালের পথটি প্রতিটি মানব-যাত্রীর জন্যে সমান করতে হবে, তবেই মানুষে মানুষে বিদ্বেষ দূর হবে, এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে।

কালের পথটি সকল মানুষের জন্যে সমান করবার কথা রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা দুটি চিঠিতে বলেছেন। ১৮৯৩ সালে লেখা একটি চিঠিতে লিখছেন—"যারা বলে কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবন-ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিসও বন্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব, অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে পরতে পারবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাসনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই, তারা ভারি কঠিন কথা বলে।"

১৮৯৩ সালে লেখা চিঠিতে বলছেন—

"...এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়—।...সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীর ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব জানি নে—**যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য!"**

রবীন্দ্রনাথের প্রাণের দরদ যে কোন সমাজ ব্যবস্থার উপর তা কি এর থেকে সুস্পষ্ট নয়? তাঁর যে নির্দেশ সেটি কি প্রতিক্রিয়াশীল নির্দেশ? এই দরদী মনোভাব প্রকাশ করেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। বিপ্লব কেন আসে ও কি ব্রত সে সম্পন্ন করে সে কথাও তিনি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"জগতে যতো কিছু বিপ্লব সে এমনি করেই হয়েছে। যখন প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে—যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে তখন সমাজে ঝড় এসেছে। যিনি অদ্বৈতম্ তিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না।" (চিরনবীনতা)

• সমস্ত বৈচিত্র্যকে ঐক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতেই হবে মানব-সমাজে। মানুষে মানুষে যে মূলগত ঐক্য আছে, সেই ঐক্য যেখানে আঘাত পায়, খণ্ডিত

হয় ধনের ও ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ও ভেদ-বিভেদের দ্বারা সেখানে বিপ্লব দেখা দেয়। বিপ্লব তাই পুঞ্জিত প্রতাপ, ধন ও ক্ষমতার শত্রু, ঐক্য-সাধক শক্তি।

এই ঐক্য-সাধক শক্তির অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিহাস-গতি-চেতন দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন ও স্বীকার করেছেন।

এই হোলো রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-বোধ ও সেই বোধের আলোকে প্রদীপ্ত সমাজ-চেতনা।

সমকালীন পশ্চিম বাংলার বাস্তববাদী বিপ্লবীরা কি জ্ঞানে ও অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চেতনার কাছাকাছিও পৌঁছতে পেরেছেন?—অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার কথা না হয় বাদই দিলুম। তাকিয়ে দেখুন তাঁরা পূর্ব বাংলার বিপ্লবীদের দিকে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবাদী ধারণাকে মশাল করে পূর্ব বাঙলার জনসাধারণ এগিয়ে চলেছেন মুক্তির দিকে। আর পশ্চিম বাংলা? মানবতা-বোধহীন লোকদের নেতৃত্বে ক্রমশই বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ

আনিসুজ্জামান

অধুনা যে ভূখণ্ড বাংলাদেশ বলে পরিচিত, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ আযৌবনের। জমিদারির তত্ত্বাবধানে শিলাইদহে পা দিয়েছিলেন সাতাশ বছর বয়সে। সেই তাঁর প্রথম আসা এ অঞ্চলে। তার পরের দশ বছর প্রায় অবিরাম আসা-যাওয়া করেছেন। শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর ও রাজশাহিতে জীবনের অনেকগুলো দিন কেটেছে। আত্রাই, চলনবিল, পদ্মা, মেঘনা, ইছামতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে প্রগাঢ়। সে-দশ বছর চলে যাবার পরও দেশের এই অংশে এসেছেন অনেকবার। প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করতে কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে এসেছেন, এসেছেন মানুষের হৃদয়ে আসন করে নিতে। শেষ এসেছিলেন বোধহয় তিরোধানের বছর চারেক আগে।

বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের দশটি বছরই তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। পৃথিবীকে যেন নতুন করে দেখেছিলেন এইখানে এসে। উচ্ছ্বাসের সুরে সে-দেখার আনন্দকে ধরেছিলেন 'ছিন্নপত্রে': "অনেকদিন পরে আবার এই বড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখা-সাক্ষাৎ হল।" আর "পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।" সবচাইতে বেশি উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন বোধহয় পদ্মাকে নিয়ে: "বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা—আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশি পোষ-মানা নয়, কিছু বুনোরকম—কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে।· আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো।"

শুধু প্রকৃতিকে নয়, মানুষকেও কবি নতুন দৃষ্টিতে দেখবার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন পূর্বভূমিতে এসে: "আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো—নিরুপায়—তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই।· সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব

ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভাবী হতভাগ্য!" সেই-যে ঠিকে মুহুরী, পিসিমাকে ডাকতে ডাকতে যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, তার মধ্যে মানুষের মহত্ত্বকে দেখতে পেলেন অকস্মাৎ—সেই দর্শন তো নির্ঝরের আরেক স্বপ্নভঙ্গ।

রবীন্দ্র-ভুবনের নির্মাণে পূর্ব বাংলার নিসর্গ ও মানবের প্রেরণা ধরা পড়েছে 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-'চৈতালি'তে, 'কল্পনা'-'ক্ষণিকা'য়; বহু ছোটগল্পে, অজস্র গানের ধারায়। এখানে এসেই তাঁর মনে পড়েছিল: "জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ"। সেই নিমন্ত্রণে তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। কবির প্রতি তাই আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

দুই

কিন্তু ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীর অভাব হয়নি যেমন কোনদিন, তেমনি অভাব হয়নি তাঁর নিন্দুকেরও। অনুরাগের ভিত্তি যেমন এক নয় সবত্র, তেমনি নয় নিন্দারও।

বাংলাদেশে তিন ধরনের পাঠকের মনে তিন রকম প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এক দল রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের উপাসক ও হিন্দু ভাবধারার বাহক হিসেবে। 'কথা ও কাহিনী'-'নৈবেদ্যে'র মতো কাব্য, 'দুরাশা'র মতো গল্প কি "ব্রাহ্মণে"র মতো প্রবন্ধ এঁরা নমুনাস্বরূপ দাখিল করেন। "শিবাজী উৎসবে"র মতো কবিতার কথাও এঁরা ভুলতে চান না। আরেক দল রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার ভক্ত। 'গীতাঞ্জলি'-'গীতালি'-'গীতিমাল্যে' কি 'রাজা' নাটকে তাঁদের অভিপ্রেত আদর্শের সন্ধান পান। এ আধ্যাত্মিকতা যে মুসলমানের মর্মবোধের কত কাছাকাছি, এ কথাটাই এঁরা বিশেষ করে বলবার পক্ষপাতী। তৃতীয় শ্রেণীর রবীন্দ্র-পাঠকই দলে ভারি। তাঁরা বিশেষ করে প্রেরণা পান 'বলাকা' থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, 'ঘরে বাইরে' থেকে উপন্যাসে, 'রাজাপ্রজা' কি 'সভ্যতার সংকটে'র মতো প্রবন্ধে, 'রক্তকরবী'র মতো নাটকে।

পাকিস্তানের সরকারী নীতিতে এই তিন দলের মধ্যে প্রথম পক্ষের মতামতই গ্রাহ্য হয়েছিল। বাঙালির রবীন্দ্রপ্রীতি তাই তাঁদের শিরঃপীড়ার কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথকে যাতে বাঙালি ভুলতে পারে, সেজন্য তাঁরা নজরুলকে বড় করে তুললেন। বাঙালির চিত্তে নজরুলের স্থান চিরকালীন; তার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে

বিসর্জন দেবার দরকার হয় না। নজরুলের রবীন্দ্রপ্রীতি বাঙালির অজানা নয়। সুতরাং এ পথে কাজ হল না। পাক-ভারত সংঘর্ষের সুযোগে বেতারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হল, ভারত থেকে বই আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হল আইন করে। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন, এবারে বাঁচা গেল। বন্ধ হল তাঁর গান, বন্ধ হল তাঁর বইয়ের প্রচার। কিন্তু বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের ক্রমাগত দাবির ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার আবার শুরু হল রেডিও-টেলিভিশনে। বই আনাবার সর্বচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আইনের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে ছাপা হতে লাগল রবীন্দ্রনাথেরও বই। সরকার এবার ঘোষণা করলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারের সময় কমিয়ে দেওয়া হবে রেডিও-টেলিভিশনে। সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী আলোড়ন, প্রতিবাদ-সভা, ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন। সরকার হাল ছাড়তে বাধ্য হলেন।

"রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ"—একথা ঘোষণা করেছিলেন সেদিনের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু একথা কি ঘোষণার অপেক্ষা রাখে। তবু বলতে হয়েছিল দেশের ভাগ্যবিধাতাদের উদ্দেশ্যে যেন "সাংস্কৃতিক নীতিনির্ধারণে এই বক্তব্যের তাৎপর্য সম্যক প্রতিফলিত হয়।" দেশের মানুষকে বোঝাবার প্রয়োজন হয় নি যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের কণ্ঠে ভাষা দিয়েছেন, তাঁর সম্মান দিয়েছে আমাদের পরিচয়সূত্র। আমাদের অনুভবশক্তি তাঁর হাতে-গড়া, আত্মবিশ্বাসের উৎসও তিনি।

বাংলাদেশের মানুষের অকথিত বেদনা অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা, মানুষকে ভালবাসবার প্রেরণা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তোলার শিক্ষা রবীন্দ্রনাথে বাণীরূপ পেয়েছে। দেশব্যাপী পালা বদলের দিনে তাই মানুষের মুখে মুখে আলোড়িত হল তাঁরই গান: "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।"

তিন

যে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই গীতাঞ্জলি, সেই বাংলাদেশ আজ রক্তাপ্লুত, মদমত্ততায় দলিত, শত নাগিনীর নিষ্পেষণে মথিত। সেখানে মানুষের জীবন বিসর্জিত, নারীত্ব লুণ্ঠিত। মুহূর্তে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। তার সংগ্রাম মুক্তির জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, মানুষের মতো বাঁচবার অধিকারের জন্যে।

যে-বর্বরতার পরিচয় মিলেছে বাংলাদেশে, তা মানুষের শেষ পরিচয় হতে পারে না। এই চরম সংকটে সারা বিশ্ব তেমন করে নিপীড়িতের পাশে এসে

দাঁড়ায় নি। কেননা, সভ্যতার যে-সংকট জীবন-সায়াহ্নে কবিকে বিচলিত করেছিল, সে-সংকট আজও কাটে নি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। তাই বিশ্বাস করব, মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান সারা পৃথিবী মূক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে না। বিশ্বাস করব, ভীরু অন্যায় "পথ-কুকুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।" বিশ্বাস করব, বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারায় নতুন উষার স্বর্ণদ্বার উদঘাটিত হবে আমাদের জন্যে।

আমাদের দেশেরই যে-মোহগ্রস্ত ধর্মান্ধতা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে পীড়িত করেছিল, তার থেকে বহুল পরিমাণে মুক্ত হয়েই বাংলাদেশের মানুষ আজকের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। কণ্টকক্ষেত্রের জমি তুলে ফেলেই পুষ্পপত্র ফলাবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের এ এক বড় পরিচয়। মানবতার যে নিত্য-লাঞ্ছনা কবিকে বেদনার্ত করেছিল, তার প্রতিকার ঘটাতেও বাঙালি আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যারা সভ্যতার পিলসুজ, "শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে" যারা চিরকাল কাজ করে নতশিরে, তাদের ভাগ্যপরিবর্তনও এই মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্য।

জাতীয়তাবোধ যেন জাতিবৈরিতার ভাবে আচ্ছন্ন না হয়, যে সতর্কবাণী রবীন্দ্রনাথই উচ্চারণ করেন। আজ একথার গুরুত্ব কম নয়। দেশ বলতে মাটি বোঝায় না, বোঝায় দেশের মানুষ—এ শিক্ষাও তো তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। সেই মানুষকে ভালবেসেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী আজ

ছুটেছে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠার,
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, সাফল্যের তোরণে পৌঁছেও তাঁকে পাব।

'সোনার বাংলা'য় রবীন্দ্রনাথ : ১৮৯১-১৯০১

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
(মরি হায়, হায় রে)—
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে, কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
(মরি হায়, হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥*

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত 'বাংলা দেশের' এই জাতীয় সংগীতটির প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি উচ্ছ্বাস অনুসরণ করলে এই একটিই জীবনসত্য আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় যে, সংগীতটির রচনাকার রবীন্দ্রনাথের অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে অনুভূতির সৃষ্টি তাই-ই শব্দের মাধ্যমে উচ্ছ্বাসের উল্লাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। এবং এই অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দু রবীন্দ্রনাথের বঙ্গদর্শন [অধুনা 'বাংলাদেশ']-কালে সঞ্জীবিত—একথা আমরা রবীন্দ্রজীবনীর অন্তরঙ্গ পাঠক মাত্রই জানি।

বস্তুতঃ 'আঞ্চলিকতা' কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকারের গৌরবের না অগৌরবের এবিষয়ে নানা মুনির নানা মত, আমরা সে বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না। তবে বিশেষ কোন কোন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা যে কোন কোন সাহিত্য-শিল্পীর জীবনে লক্ষ্মিশ্রীর পসরা নিয়ে আসে এ আমরা দেশীবিদেশী অনেক সাহিত্য-সাধকের জীবনেই দেখেছি। সূক্ষ্ম বিচারে একে ঠিক আঞ্চলিকতা বলা যায় কিনা তা নিয়েও তর্কের অবকাশ আছে।

*রচনাকাল ১৯০৫ খ্রীঃ [রবীন্দ্রনাথের পূর্ববাংলা পরিভ্রমণের মাত্র চার বৎসর কাল ব্যবধানে রচিত], সুরের উৎস শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরার লেখা 'আমি কোথায় পাব তারে'।
—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই জানুয়ারী, ৭২

সাহিত্যসাধকের সে অভিজ্ঞতার পটভূমি কোথাও বা বিজন পার্বত্যভূমি, কোথাও কল্লোলিত সমুদ্রতট, ধূসর মরুভূমি, কিংবা কোলাহলমুখর জনপদ—যা-ই হোক না কেন, প্রকৃত শিল্পী তারই মধ্যে আপন মনের মানুষেরে খুঁজে পায়। কেউ জানেন, আলোর রূপ আছে, কিন্তু অন্ধকারেরও যে এত রূপ আছে—তা উপলব্ধি করেন অন্তর দিয়ে, কেউ রাঢ়ভূমির রুক্ষ শুষ্ক মাটির মধ্যে জীবধাত্রীর সন্ধান পান, কেউ বা কয়লা কুঠির দেশে নূতন জীবনের পরিচয় পেয়ে মেতে ওঠেন, কেউ সীমাহীন সমুদ্রের দিক্‌ভ্রান্ত বিভীষিকার মধ্যে এক আনন্দরস উপভোগের প্রয়াস পান, কেউ অন্ধকারাচ্ছন্ন হিমালয়ের নিস্তব্ধ পর্বতগাত্রে লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে বিশ্বরূপের সন্ধান পান, আবার কারো কাছে বা আরণ্যক সৌন্দর্য মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়। রবীন্দ্রনাথও এই ধারাপথেই এক সার্থক প্রকৃতি লালিত শিল্পী। প্রথম যৌবন পর্যন্ত তিনি অন্ততঃ যে দুটি ধারায় আকর্ষণ বোধ করেছেন, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তা এক শাশ্বত অবদান রেখে গেছে—উত্তরকালের পাঠকদের কাছে যা পরম গৌরবের ও গর্বের।

১৮৯১ থেকে ১৯০১। এই কালপর্বে কবি পদ্মার বুকে নৌকায় করে ভেসে বেড়াচ্ছেন। নানা কারণে মন অশান্ত — দেশের নরম পন্থী ও চরম পন্থী, এই দুই রাজনৈতিক দলের সংঘাতে চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত। এদিকে নৌবাহী দিনগুলি সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা হয়ে উঠে কবির কাছে বিশ্বলোকের বার্তাকে বয়ে নিয়ে আসছে। প্রকৃতির ওই বিস্তৃত উদার পটভূমির মধ্যে কবিমনে একদিকে সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা, আর একদিকে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ধরিত্রীর অচঞ্চল আকর্ষণ। পদ্মার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলা সেই দিনগুলোর মধ্যে ঊর্ধ্বের নীলাকাশ আর নিম্নের শ্যামল শস্যক্ষেত্রের ছায়াপাত ঘটেছে। আর একদিকে মূঢ়ম্লান মূকের সকরুণ চাহনী, নিতান্ত সহজ সরল গ্রাম-জীবনের ছোট সুখ, ছোট দুঃখ পদ্মার ঢেউয়ের মতো জাগছে, ভাঙছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কল্পনার যে ললিত জগতে বসে কবি এতদিন ছিন্নবাঁধা পলাতক বালকের মতো সারাদিন বাঁশীর সুরের গুঞ্জরণ তুলেছিলেন, পদ্মার কোলঘেঁষা এই গ্রামজনপদের অন্নহীন, স্বাস্থ্যহীন, প্রাণহীন নিবদ্ধ অন্ধকারময় জীবনযাত্রার ছবি তাঁকে সেই কল্পলোক-বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এসে বাস্তবের ধূলিমলিন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে। এত দিনের কর্মজীবনের একমুখী অসম্পূর্ণতা দূর করে দিয়ে পদ্মাতীরের সাধারণ মানুষগুলি সেখানে পূর্ণতাকে, ঐশ্বর্যকে বহন করে নিয়ে এলো। পূর্ণ যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পদক্ষেপের এই কালটুকুতে রবীন্দ্রনাথের মন প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ

একান্ত ; জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিকে তিনি এখন পরম রমণীয় ও অপূর্ব রহস্যময় বলে অনুভব করেছেন, নিজেকে একান্ত নির্লিপ্ত করে প্রকৃতির সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনুভবও করছেন। উত্তর কালের একটি কবিতায় তার প্রতিবেদন—

শুধু এই চেয়ে দেখা এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া
এই আলো এই হাওয়া
এই মত অস্ফুট ধ্বনির গুঞ্জরন
ভেসে যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ
যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ ॥

[বলাকা]

সোনারতরী-চৈতালিপর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই আনন্দের উৎসার। আর সমকালীন রচনাগুলির মধ্যে মানব-জীবনের আনন্দ-বেদনার সেই প্রতিফলন। নৌকায় করে যেতে যেতে মুহূর্তে তীর ও তীরের মানুষ তাঁর একান্ত আপন হয়ে উঠেছে ; তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে কবি নিজেকে নিবিড়ভাবে জড়িয়েছেন, পর মুহূর্তেই নির্দয়ভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। একদিকে পরমাত্মীয়তা, পরম অন্তরঙ্গতা, লোকালয়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে একান্ত সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা—আর একদিকে জলস্রোতের মতোই পরম নির্লিপ্ত নির্বিকার ঔদাসীন্য। এটিই তৎকালীন রবীন্দ্র-মানসিকতায় চিহ্নিত চিত্রলেখ, যার অনেক পরিচয় রয়েছে 'ছিন্নপত্রে'র পত্রে পত্রে এবং সমকালীন অন্যান্য রচনায়। প্রত্যেক সৃষ্টির প্রাক্ মুহূর্তে একটি আনন্দ-বেদনার জন্মলগ্ন থাকে। বহির্জগতীয় ঘটনাবস্তু বা চিন্তা কবির মনোলোকে অধিবাসিত হয়ে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মূর্তি ধরে সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনাকালের পূর্বে কবি কোন্ চিন্তায় নিবিষ্ট ছিলেন সেই দুরধিগম্য রহস্যের সন্ধান করা সমালোচকের কর্তব্য। চিঠিপত্রাদি এই কাজকে অনেকটা সহজ করে তোলে। বস্তুতঃ সাহিত্যিকের পত্রগুলি যেন সৃষ্টির সাজঘর ! কেননা কাব্যের মধ্যে বা সৃষ্টির মধ্যে যে চিন্তাগুলি সুসংবদ্ধ ও সুসজ্জিত তাদের আদিমরূপটি এই পত্রের সাজঘরে সম্পূর্ণ করে চেনা

যায়। অর্থাৎ পত্রের মধ্যে থাকে সাহিত্যের উপাদান; সাহিত্যে পাই পরিপূর্ণ শিল্পরূপ, পত্র এবং কাব্য উভয়কে মিলিয়েই কবির চিন্তার পরিপূর্ণ রূপটি পাওয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ, গল্পকার রবীন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় বিষয়ী হিসেবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বিশাল জমিদারী তদারকের ভার রবীন্দ্রনাথের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। বিষয়ী হিসেবে তিনি যে অসার্থক ছিলেন এমন কোন তথ্য আমাদের জানা নেই বরং বৈষয়িক রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি সচেতনতা এবং প্রজাবাৎসল্য, উচ্ছল হাস্যরস এবং বুদ্ধির চকিত দীপ্তি; প্রকৃতির প্রতি নিবিড় মমতা এবং শিল্পকলার প্রতি গভীর আকর্ষণ—এমনি দ্বৈত প্রকাশ এই পর্বের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সহজলক্ষ্য। আবার এগুলির অন্তরালে এক সর্বব্যাপী বিষাদ ও বৈরাগ্যের সুরও শ্রুতিগোচর হয়; সৌন্দর্যের অকৃপণ প্লাবনের মধ্যে একটি গভীর হতাশা ও নিরাকুল নৈরাশ্য! মর্ত্যমমতার সঙ্গে মর্ত্যবেদনার এমনি অন্তরঙ্গ পরিণয় অন্যপর্বের রবীন্দ্র সাহিত্যেও বড় একটা লক্ষ্য-গোচর হয় না। বাংলাদেশের উন্মুক্ত পরিবেশ, প্রভাত-সন্ধ্যার আনন্দময়তা, উল্লসিতা পদ্মার তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাঁর মনে বারম্বার এই হর্ষ-বেদনার সৃষ্টি করেছে:

> যাহা কিছু হেরি চক্ষে
>
> কিছু তুচ্ছ নয়,
>
> সকলই দুর্লভ বলে
>
> আজি মনে হয়,
>
> দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
>
> দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

বহির্মুখী তীব্র প্রকাশ-ব্যগ্র কল্পনা সর্বদাই বিশ্বে তার প্রতীক খোঁজে। রবীন্দ্রনাথও নদীর মধ্যে তাঁর প্রিয়তম প্রতীকটি আবিষ্কার করেছেন। নদীর স্রোত সম্মুখ-প্রগত, অথচ দুই বেলাভূমিতে সে রচনা করে প্রান্তর-জনপদ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাও বেগবতী এবং তীরে তীরে সে রচনা করে কাব্যের শস্যভূমি, গল্প-উপন্যাসের লোকালয়। এইখানেই রবীন্দ্রসাহিত্যে নদীর সার্থকতা। আলোচ্য পর্বে রচিত 'ছিন্নপত্রে'র ৫৬ সংখ্যক পত্রে নদীতে ভেসে যেতে যেতে তাঁর 'নব নব আকাঙ্ক্ষার' জন্ম হয়েছে, এই স্বীকৃতি আছে। অন্যত্র বলেছেন, 'ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়। বেগবান

একাগ্র-গামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্রশালিনী স্থিরভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।' যথার্থ লেখক নিজেকে বিগলিত করে লেখার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন। লেখকের মন যেন তুষারের স্তূপ! সামান্যতম আবেগের উত্তাপরশ্মিতে সেই মন বিগলিত হয়ে বিষয়কে অভিষিক্ত করে। "এই সময়ে আমি প্রথম অনুভব করেছিলুম যে বাংলাদেশের নদীই বাংলাদেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে।" তাই বাংলার আকাশ, বাতাস আমের বন, ভরা ক্ষেত, বটের ছায়ার সঙ্গে নদীর কূলও অনিবার্য ভাবে এসে পড়েছে। আর রবীন্দ্র-জীবনী পাঠক হিসেবে আমরা জানি, কবির জীবনে অসংখ্য নদীর মধ্যে পদ্মার একটি স্বাতন্ত্র্য আছেই।

রবীন্দ্র-জীবনে পদ্মা যেমন একটি ভাব বা ভাবমূর্তি, তেমনি বা ততোধিক একটি লৌকিক সত্তা, নতুবা তার সঙ্গে কবির হৃদয়বিনিময় সম্ভব হতো না। আর এই হৃদয়বিনিময়ের ফলেই পদ্মা কাব্যের সামগ্রী হয়ে উঠেছে, অন্যথা তাকে তত্ত্বের বহিরঙ্গনেই পড়ে থাকতে হতো। একটি পত্রে কবি-স্বীকৃতি—

"বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড় ভালোবাসি। · এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে, বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে, একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে, আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে।..."

এ তো গেল প্রাকৃতিক দিকটা। প্রকৃতি আর মানুষে মিলে বিশ্বের সৌন্দর্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে এই পর্বের প্রকৃতির মধ্যেই মানব দিকটা কেমন করে ফুটে উঠেছে দেখা যেতে পারে।

" আমার ডানদিকের পারে চরের উপরে চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গোরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমার বাম পারে শিলাইদহের নারকেল এবং আমবাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে...যারা অল্প বয়সী তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না। একবার স্নান করে উপরে উঠছে, আবার ঝুপ ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে। পুরুষেরা গম্ভীরভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যকর্ম সমাপ্ত ক'রে চলে যায় কিন্তু মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব—পরস্পরের সঙ্গে যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে। জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল্ ছুল্ জল্ জল্ করতে থাকে।...মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে টেনিসন বলেছেন: Water unto wine! আমার আজকের মনে হচ্ছে জল unto

জল। তাই জল মেয়েতে ও জলেতে বেশ মিশ খায়। অন্য অনেক রকম ভার বহন মেয়েকে শোভা পায় না; কিন্তু উৎস থেকে, কুয়ো থেকে ঘাট থেকে জল তুলে নিয়ে যাওয়া কোনোকালেই মেয়েদের পক্ষে অসংগত মনে হয় না। গা-ধোওয়া, স্নান করা, পুকুরের ঘাটে এক কোমর জলে ব'সে গল্পকরা এ-সমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভন। আমি দেখেছি, মেয়েরা জল ভালোবাসে কেননা উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজ প্রবাহ এবং কলধ্বনি জল এবং মেয়ে ছাড়া আর কারও নেই। ...

এই উক্তির তাৎপর্য থেকেই বুঝতে পারা যায় এই পর্বের রবীন্দ্র-ফসলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'গল্পগুচ্ছে'র নারী চরিত্রগুলি কেন সমধিক উজ্জ্বল, পুরুষ চরিত্রগুলির তুলনায় সার্থকতর। 'গিরিবালা' চরিত্র সৃজন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, তিনি মানবস্বভাবের সঙ্গে প্রকৃতির রঙ, রস এবং স্নেহ মিশিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন। শুধু গিরিবালা প্রসঙ্গে নয়, রবীন্দ্র-সৃষ্ট এই পর্বের অধিকাংশ চরিত্র সম্পর্কেই সাধারণভাবে একথা বলা চলে বলে মনে করি।

নদীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল, একে তিনি আপন কবি-প্রতিভার চিত্রকল্পরূপে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন, কোথাও-বা চঞ্চলা নদীকে জীবনের গতিবাদের প্রতীক বলে কল্পনা করেছেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রথম কবিতা যা রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির ডালি পূর্ণ করেছে; এই নির্ঝর নদীরই পূর্বরূপ। তাই তিনি নদীর প্রতি কৃতজ্ঞ। পদ্মা তাঁর কাব্য-জীবনের রূপক। পদ্মার পরেই কবির হৃদয়ে স্থান কোপাই-এর, যাকে তিনি তাঁর বিগত গদ্য-জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নদী যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে দোলায়িত করেছে, তার কারণ বাংলা নদীমাতৃক দেশ। ছিন্নপত্রের যুগে (১৮৯১-১৯০১) রবীন্দ্রনাথ যদি নায়ক হন, তবে পদ্মানদীকে বলা যায় নায়িকা। অবশ্য পদ্মাকে তিনি বহু ক্ষেত্রে নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১] বস্তুতঃ শিলাইদহ বাসকালে পদ্মাকেই তিনি দিনরাতের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের পদ্মা—বর্ষার পদ্মা, 'চিত্রা'য় শরতের পদ্মা আর 'চৈতালি'তে চৈত্রের পদ্মা বা বসন্তের পদ্মা। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই 'রহস্যময়ী পদ্মার দিব্য সূত্রে গাথা' শিল্পীরূপে। তবে রবীন্দ্রনাথের বক্ষমান যৌবন কালের সাহিত্যে কেবল পদ্মারই প্রাধান্য, একথা সত্য নয়। এই পর্বের রচনায় পদ্মা ব্যতীত আরো অনেকগুলি

১ ছিন্নপত্রের পত্রসংখ্যা ১৯, ৪৩, ৭৯, ৯৫।

নদীর কথা আছে, যেগুলি অনুরূপ প্রকৃতিপ্রিয়তা এবং নদীকল্লোলিত বাংলার প্রতি কবির গভীর আকর্ষণ মনে করিয়ে দেয়। ইছামতী নদীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, "ছোট নদীটির উপর ঘন বর্ষার সমারোহের মধ্যে একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে। যেমনা গোধূলিতে নিরালা ঘরে মৃদুমন্দস্বরে গল্প করে যাওয়ার মতো চিঠি"।[২] এই চিঠির নামই 'ছিন্নপত্র'। সুতরাং ছিন্নপত্রের তথা আলোচ্য পর্বে সমগ্র প্রেরণা ও ভাবাদর্শ এই নদীপ্রান্তবর্তী বাংলাদেশের স্নিগ্ধ গোধূলিতে লালিত হয়েছে, একথা ভাবা অন্যায় নয়।' পদ্মা ও ইছামতীর পারস্পরিক আলোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবেদনটি আরো সুন্দর: পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ ঘেঁষা নদী। তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। পদ্মার মতো বড়ো নদী—এতই বড়ো যে সে যেন ঠিক মুখস্থ ক'রে নেওয়া যায় না, আর এই কেবল ক'টি বর্ষা-মাসের-ধারা-অক্ষর-গোনা ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে। গোরাই নদীতীরে সন্ধ্যা রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি অবিস্মরণীয় উপলব্ধি। মানচিত্রে অনির্দেশিত ক্ষীণস্রোতা এই নদীটির তীরে এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কোন এক অজ্ঞাত বসন্ত-সন্ধ্যার অন্ধকারে অনুভব করেছিলেন এই বাংলার মাটিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করার সুতীব্র আকুতি।[৩] প্রকৃতপক্ষে এই যুগে রবীন্দ্র-প্রতিভা অতিমাত্রায় নদী বৎসলা। বাংলা দেশের অতি পরিচিত চিত্র—নদনদী, নৌকা, জলযান ইত্যাদি উল্লেখবস্তু হিসেবে কিংবা সাংকেতিকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে নানাস্থানে, কোথাও কবি নিজে বর্ণনার ভাষা হারিয়েছেন, "আর কতবার বলব—এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে গ্রামের উপরে সন্ধেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ! সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়"।

রবীন্দ্রনাথ নানাচেতন বহুমুখী কবি। সাহিত্যের কোন একটি শাখায় তাঁর প্রতিভা সুস্থির হতে পারেনি। প্রকাশ নৈপুণ্যে তিনি একলব্যের মত ঐকবিষয়ী নন, বরং বলা যায় অর্জুনের মতো সব্যসাচী। বাংলা দেশের পল্লী প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে কেমনভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল তার কিছু আন্দাজ করা যাবে নিম্নের তালিকাটি অনুসরণ করলে। ১৮৮৫-১৮৯৫ পর্যন্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যের সৃষ্টি-গঙ্গায়

২ ছিন্নপত্রের পত্রসংখ্যা ১৪৭।
৩ পত্রসংখ্যা ৮৪

চলেছে পূর্ণ জোয়ার। সৃষ্টির সোনারতরীতে তিনি বয়ে আনছেন গদ্য-পদ্যের উজ্জ্বল সমারোহ। সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালী—এই কাব্যত্রয়ী; অজস্র ছোটগল্প; রাজা ও রানী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, বিদায় অভিশাপ, মালিনী ইত্যাদি নাট্যগ্রন্থ; অগণ্য পত্র ও প্রবন্ধ এবং রাজর্ষি উপন্যাস এই সময়-কালেই রচিত। বিশ্ববিধাতা যেমন প্রহরে প্রহরে এই মাটির পৃথিবীর উপর নানা রঙের তুলি বুলিয়ে চলেছেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁর সমকালীন দিন যাপনের রঙীন অনুভাবনাগুলি রজত পটের মতো ভাষার রঙে ধরে রেখেছেন। "কত দিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি।..."[৪] বিচিত্র প্রবন্ধের 'নববর্ষা' প্রবন্ধটি এমনি এক নির্জন পদ্মাতীরে 'মেঘদূত' পাঠের ফল। যেটাকে রবীন্দ্রনাথ "বাইরের থেকে সঞ্চয় করে আনা এক একটা দুর্লভ সৌন্দর্য ও দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী" বলে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন 'আমার জীবনে অসামান্য উপার্জন'!

বর্তমানের বাংলাদেশসহ উত্তরবঙ্গের গ্রাম-প্রকৃতি ও লোকালয়ের দৃশ্যের মধ্যে পদ্ম-মেখলা বালুকাবেলা এবং জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন প্রান্তরের মধ্যে নিসর্গের যে অসামান্য আনন্দরস ছড়ানো আছে একটি স্বপ্নালু যুবক সমগ্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথ দিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে তা পান করেছেন। প্রাত্যহিক দৈনন্দিনতার মধ্যে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের গতানুগতিক পথপরিক্রমার মধ্যে প্রকৃতি যে দুর্মূল্য রত্নকণিকা ছড়িয়ে রাখে সাধারণ মানুষ তার সন্ধান রাখে না। কিন্তু 'সোনার তরী'র পরশ পাথর লুব্ধ সেই সন্ন্যাসীর মতো এক লুব্ধ কবি ব্যাগ্র অন্বেষণে তার মুগ্ধ প্রহর ভরিয়ে রেখেছে। কেমন করে এবং কোন্ জাদুতে? "এই যে ছোটনদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাত্রে শতসহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে।" —জগৎসংসারের এই আশ্চর্য মহৎ ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের অনাগরিক প্রকৃতির মধ্যেই প্রথম উপলব্ধি করেন। মনে হয়, জীবনের অন্যান্য বিষয়ের উপরে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিতে পেরেছিলেন বলেই এই পর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হতে পেরেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি কবির মোহের নিদর্শন হিসেবে আর একটি পত্রের উল্লেখ করবো: "চারিদিকে কেবল মাঠ ধু-ধু করছে, মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের গোড়াগুলিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন"।[৫] কে জানে এইরকম কোন শস্যরিক্ত মাঠের উদাস বেদনাই

৪ ছিন্নপত্র, সংযোজন।

৫ পত্র সংখ্যা ১৪

রবীন্দ্রনাথকে এই পর্বে 'সোনার তরী'র কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা (গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা/কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা) লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল কিনা! ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশের সৌন্দর্যস্মৃতির তালিকায় ১০, ১৪, ১৮, ১৯, ২৩, ২৬, ২৭, ৩৫, ৪২, ৬৪, ৯৯, ১০০, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১৫১ সংখ্যক পত্রগুলি দ্রষ্টব্য। এই পত্রগুলি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে রবীন্দ্রনাথের আরো দুটি তৎকালীন মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে, দিন যাপনের প্রাত্যহিক আনন্দ, (—'আজ দিনটি বেশ হয়েছে') এবং দ্বিতীয়টি দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সৌন্দর্যের স্মৃতিরক্ষায় দুর্মদ বাসনা। প্রথম বৈশিষ্ট্যটি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবিতাগুলির মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি সমসাময়িক ছোটগল্পগুলির মধ্যে অপূর্বভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের একটিমাত্র জীবনদর্শন— 'সুখ অতি সহজ সরল'। কবি দেখেছেন, ধানের ক্ষেত সর সর করে কাঁপছে। আকাশে সাদা সাদা মেঘের স্তূপ, নারকেলের পাতা বাতাসে ঝুর ঝুর করছে— সবশুদ্ধ বেশ একটা সুখের দৃশ্য। [বলা বাহুল্য, সর্বকালের বাংলাদেশের এটিই প্রকৃত উপলব্ধি]।

…বিদেশ থেকে থেকে যে লোকটি এইমাত্র গ্রামে ফিরে এল তার মনের ভাব তার ঘরের লোকদের সঙ্গে মিলনের আগ্রহ এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই ঝিরঝিরে বাতাস এবং গাছপালা, তৃণগুল্ম, নদীর তরঙ্গ সকলের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে একরকম অভিভূত করে ফেলেছিল।[৬] প্রায়শঃই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমের উৎস নিসর্গের খণ্ডরূপ থেকেই। পদ্মালালিত শিলাইদহকে ভালোবাসার কারণ শুধুমাত্র বঙ্গের বিস্তীর্ণ সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ নয়, বরং অধিকাংশ স্থলে, দিন-যাপনের একপ্রকার মুমূর্ষু আনন্দই রবীন্দ্রনাথকে অতিমাত্রায় নিসর্গনিষ্ঠ করে তুলেছে এবং এক একটি দিন তাঁর কাছে হর্ষ-বেদনায়, আনন্দ-বিষাদে পদ্মপত্রে কম্পিত জল-বিন্দুসম ধরা দিয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের আর একটি বৃহত্তর পরিচয় ব্যাখ্যাত না হলে আলোচনা স্বভাবতই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কবির এ-পরিচয় সংগীতস্রষ্টা-রূপে। এই পর্বে কবির সুরসাধনাপ্রীতি, সাংগীতিক উৎসাহ এবং ভারতীয় য়ুরোপীয় সঙ্গীতের নিবিড় পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করছে ছিন্নপত্রের ৯৩, ১০৫ ও ১১৪

৬ পত্রসংখ্যা ৩৬

সংখ্যক পত্র। এই পর্বের প্রাকৃতিক পটভূমি অধিকাংশ স্থলে প্রভাত থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রসারিত হলেও কোন কোন রচনায় দ্বিপ্রহরের প্রতি কবির মানস দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, দ্বিপ্রহরের যে একটি স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা এবং বিষণ্ণতা আছে তাই-ই যেন রবীন্দ্রনাথের সমকালীন চিন্তায় বিষাদ ও বৈরাগ্যের আরোপ করেছে। চৈতালির 'মধ্যাহ্ন' নামক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ সুদূরের গান গেয়েছেন, অসীমে উধাও হবার আকৃতি প্রকাশ করেছেন; তাঁর সেই সুদূরপ্রীতি ও অসীমচারিতার মূলে একটি দ্বিপ্রহর-প্রীতি রয়েছে—এই কালপর্বে যার সূচনা বলা যায়।

এই পর্বে রবীন্দ্র-মানসে আর একটি ভাবনাও উপ্ত হয়েছে—যাকে বলা যেতে পারে 'দ্বৈত ভাবনা'। রবীন্দ্রনাথ প্রায়শঃই দুই বিপরীত কোটির আকর্ষণ অনুভব করেছেন আপনারই মধ্যে। সমালোচকেরা একে কোথাও 'সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব' আখ্যা দিয়েছেন। কোথাও 'সেন্ট্রিপেটাল কোর্স' এবং 'সেন্ট্রিফুগাল কোর্স'-এর টানা-পোড়েন—এমনি নানান অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। আমার মতে, রবীন্দ্রনাথের এই দ্বৈতভাবনায় রোহভূমিও পূর্ব বাংলার নদীপ্রকৃতি। বিশেষ করে পদ্মার মধ্যে ভাঙাগড়ার কিংবা শীতের শান্ত সলিলারূপ আবার বর্ষার প্রলয়ঙ্করীরূপ দর্শনে কবির অন্তরেও দুই ভাবনার জন্ম হয়ে থাকা অসম্ভব বলে মনে হয় না, সোনারতরী-চিত্রা-চৈতালীর কাব্যকুসুম পদ্মা বিধৌত। এই পর্বের সকল রচনার মধ্যেই নানা অনুভূতির গুঞ্জন ও আনন্দ-বেদনার অন্তরালে কান পাতলে পদ্মার কলধ্বনি স্পষ্ট শোনা যায়। গ্রাম-বাংলার এমন অন্তরঙ্গ মনোরম দৃশ্যচিত্র—পদ্মাপ্লাবিত বাংলাদেশের মৃন্ময়ী শ্যামলিমা, মেঘ-বৃষ্টি-রৌদ্রের স্নেহ সিঞ্চিত করুণা, প্রভাত-সন্ধ্যার হৃদয়গ্রাহী রাগিনী, শস্যপ্রান্তরের বিপুল বিস্তার—এই বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের বিস্ময় মুহূর্তে কবিকে সীমাবদ্ধ মৃৎখণ্ডের মধ্যে, লীলায়িত মুহূর্তের মধ্যে, প্রভাতরাত্রিবিদ্ধ একটি নশ্বর দিবসের মধ্যে, যেন এক অনন্ত, অনির্বচনীয় অসীমের সন্ধান দিয়েছে। 'মৃত্যুমন্দস্বরে গল্প করে যাওয়ার' অবসরও পেয়েছেন কবি। সেই সঙ্গে এই গ্রাম্য প্রকৃতি এবং গ্রাম-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রে পদ্মার উত্তাল উচ্ছ্বাসের মধ্যে কবি যেন উপলব্ধি করেছিলেন—

> আজিকার এই ছবি,
> জনশূন্য নদীতীর, অস্তমান রবি

ম্লান মূর্ছাতুর আলো রোদন-অরুণ,
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন, এই গভীর বিষাদ
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ।

সম্পূর্ণ পৃথক প্রেক্ষাপটে হলেও চেষ্টা করলে, সন্ত সমাপ্ত যুদ্ধতারাক্রান্ত বাংলাদেশের অবস্থার সঙ্গে 'এই ছবি' মিলিয়ে নেওয়া যায়। বর্তমান মুক্তি-আন্দোলনের পটভূমিকায় ঋষিকবির আর একটি উপলব্ধিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য: যেখানে জীবনের শিষ্টাচারবিহীন 'সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতার' জন্য কবির আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে সেখানেই আবার তিনি রৌদ্রস্নাত বসুন্ধরার প্রতি এক নিশ্চিত নাড়ীর টান অনুভব করেছেন—

> যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে। সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।

রবীন্দ্র-উপলব্ধ এই 'জীবনের আবেগ' আমরা কী মুক্তিযুদ্ধে সামিল সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি না, কিংবা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের শ্মশানে দাঁড়িয়ে নতুন করে গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্যে এই 'থর থর শিহরণ' কী প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতে পারছি না তাদের মধ্যে যারা "স্বর্গের উপর আড়ি ক'রে দরিদ্র মায়ের ঘর আরও বেশি করে ভালোবেসেছে"? কিন্তু প্রদীপের ঠিক নিচেই থাকে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার, সুন্দরের পাশেই অসুন্দরের অবস্থান। এক সময়ে কবির উপলব্ধি:

> মনে হয়, একটি জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে আমি বাস করছি, বাস্তব জগতের কোনো কঠিনতাই এখানে যেন নেই।

আবার প্রায় একই পরিবেশে 'গ্রামের চতুর্দিকে ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন অন্ধকার' জলপথে পাট-পচা দুর্গন্ধ নীলবর্ণ জলের পাশে উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলোর চরম অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য এবং দারিদ্র্য-পীড়িত পূর্ববঙ্গবাসীদের সম্পর্কে যখন মন্তব্য করেছিলেন—

> ...সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি—প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে

তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। একরকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একে বারে পলাতক হওয়া উচিত—এদের দ্বারা জগতের কোনো মুখও নেই, শোভাও নেই ।[৭]

অধুনা বাংলাদেশে পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বিশ্বকবির এই অভিজ্ঞান মনে হয় অনেকটা অভিমানের সুরে গাঁথা, নতুবা ঐ একই ব্যক্তির নিকট থেকেই এই শাশ্বত ভবিষ্যৎদৃষ্টি কেমন করে সম্ভব ? —

> ···আজকে বিচার করে দেখতে হবে, যে কাজের ভার দিয়েছি তার প্রকৃতি কী। আমাদের উদ্‌বৃত্তটুকু দিয়ে আমরা দাতা বৃত্তি করতে চাইনি। দেশের মধ্যে যে প্রাণশক্তি মূর্ছিত হয়ে পড়েছে তাকে সতেজ করবার সংকল্প আমাদের। এই প্রাণের দৈন্যই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো অপমান—"[৮]

এটিই আজ মুক্ত বাংলাদেশের পরম উপলব্ধি, জাগ্রত প্রত্যয়। যে উপলব্ধি এবং প্রত্যয় এসেছে রবীন্দ্রনাথের বাণী থেকে—তাঁর সঠিক চিন্তাধারা থেকে। তাই-ই রবীন্দ্রনাথ আজ দুই বাংলার দিশারী রূপে চিহ্নিত ও পূজিত।

"মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো"—আমরা কি অনুমান করতে পারি, রবীন্দ্রনাথই সত্তর দশক পূর্বে প্রথম জাগ্রত বাঙালী যিনি বাংলাভাষার মধ্যে অমৃতের আস্বাদন পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যে অমৃতভাণ্ডকে রক্ষা করতে লক্ষ প্রাণের তাজা শোণিতে ভিজে লাল হয়েছে বাংলাদেশের অনেক প্রান্তর জনপদ। সত্তর দশক পরে বাংলা মায়ের ম্লান মুখের কালিমা ঘোচাতে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হচ্ছে তবে এই বাংলারই এক কবি সেদিন মায়ের মলিন মুখ দেখে নয়ন জলে ভেসেছিলেন পরম আন্তরিকতায়।

পরিশেষে, যোগ্য পূর্বপুরুষেরা চেতন- বা অবচেতনভাবে শিল্প-সাধনায় এমন কিছু স্বাক্ষর রেখে যান, যার মধ্যে উত্তরপুরুষেরা জীবনপথের উৎসাহ খুঁজে পায়, তখনই তারা পূর্বপুরুষদের মহত্ব উপলব্ধি করে। বাংলাদেশে বর্তমানে এই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। রবীন্দ্রনাথের রচিত গান সেখানে জাতীয় সংগীতের মর্যাদায়, নজরুলের গান সমর সংগীতের মর্যাদায় ভূষিত। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর প্রাণের মন্ত্রঋষি, নজরুল উদ্দীপনার

৭ ছিন্নপত্রাবলী, পল্লীপ্রকৃতি, পৃঃ ২১০

৮ পল্লীপ্রকৃতি [রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি সংকলন], পৃঃ ৭২

পাথের। এই অবুত নিভন্দী ঋষিমন্ত্রকে সামনে রেখে ঘরছাড়া বাঙালীও উৎসাহ পাচ্ছে, তাই তারাও আজ বাংলাদেশের জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত পূজারী, কণ্ঠে তাদের রবীন্দ্রসংগীতের বেদমন্ত্র—

ফিরে চল্ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে
চেয়ে আছে মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে,
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে।
দিক হতে এই দিগন্তরে
কোল রয়েছে পাতা,
জন্মমরণ তারই হাতের
অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা
সাগর-পানে আত্মহারা রে
প্রাণের বাণী বয়ে আনে।

প্রগতি-পরিচায়ক রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুদিরাম দাশ

মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থ স্বল্পমাত্রও আহত হওয়ার সম্ভাবনায় সেই স্বার্থের রক্ষক রাষ্ট্র কী ভয়ংকর অমানবিক হতে পারে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্যে পর্যাকুল অবস্থায় এই মুহূর্তে আমাদের দিন কাটছে বলা যায়। এই মুহূর্তে অস্ত্রশক্তি-সহায় রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর প্রজাসাধারণের সন্দেহ ঘনীভূত হওয়াও স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সাম্রাজ্যিক দুর্বিপাক থেকে সদ্যমুক্ত মানুষ আত্মশাসনের ক্ষেত্রে যদি তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে এসে পড়ে তাহলে বুঝতেই হয় রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপনার মূলেই গলদ থেকে গেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাওয়ার পূর্বে আত্মসংগঠন হয়নি। এখন, হয় কায়েমি স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ করে বংশপরম্পরায় কথঞ্চিৎ জীবদেহ রক্ষা করতে থাকো, নয়, রক্তের মূল্যে পূর্ণ জীবন অর্জন করো। অথচ এই সাবধানবাণীই পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করেছেন একালের জীবনদ্রষ্টা মহাকবি, যাঁর রচনাবলীর অর্ধেকেরও উপর স্থান দখল করে আছে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চিন্তা, জাতির দুর্দশায় বিলাপ, মোহমুক্তির উৎসাহ এবং পথনির্দেশ। তাঁর অষ্টোত্তরশতাধিক প্রবন্ধ এবং ভাষণ রাষ্ট্র-সমাজ-চিন্তায় ব্যয়িত হয়েছে, এ ছাড়া চিঠিপত্রে এবং ডায়েরিতে প্রসঙ্গক্রমে দেশের সমস্যা নিয়ে স্বতই তাঁকে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করতে হয়েছে বহুবার। এমন কি কাব্যকবিতাতেও তিনি শুধুই স্বপ্নের মায়া বিস্তার করেননি, জীবনভাবুকতার শীর্ষে উঠে জাতিকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়েছেন। এ সংগ্রাম কিন্তু কেবলমাত্র তৎকালীন বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে নয়, এ সংগ্রাম জাতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার সঙ্গেই বিশেষভাবে। সম্প্রদায়-ভেদ ও জাতিবর্ণ-ভেদ, অশিক্ষাজনিত কুসংস্কার ও সনাতনী প্রথার অন্ধ দাসত্ব, জঘন্য স্বার্থবুদ্ধি, অতিবুদ্ধি, ঈর্ষা, দলাদলির নীচতা থেকে মুক্তিই রবীন্দ্রনাথের অভিলষিত প্রাথমিক স্বাধীনতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন। গ্রামকেন্দ্রিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে কার্যকরভাবে এ দু'টিতে এসে পৌঁছালে ইংরেজ-শাসন এবং শোষণ সহজেই স্খলিত হয়ে পড়বে, এই ছিল তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।

রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আদ্যন্ত সুসমঞ্জস পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা নেই, এমন মন্তব্য কেবল অসংগতই নয়, নিষ্প্রয়োজনও। কারণ, যিনি মুখ্যভাবে সাহিত্যিক তাঁর কাছে মুখ্যভাবে রাষ্ট্রতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু কল্পনাশীল কবি হলেও, জীবনের কবি হিসেবেই তিনি আমাদের সবিশেষ প্রিয়, আর জীবনদর্শনের সঙ্গে সমাজদর্শন অভিন্ন। রাজনীতি-চর্চা তাঁর লেখায় ধারাবাহিক বিশ্লেষণে তেমন ছড়িয়ে নেই, যেমন আছে সামগ্রিকভাবে। অথচ প্রয়োজনীয় কোন বিষয়েই তিনি না কথা বলেছেন? শিক্ষা, সামাজিক আচার, বর্ণ বৈষম্য, হিন্দু-মুসলমান, ইংরেজের শাসননীতি, প্রথম পর্যায়ের স্বদেশী, গান্ধীজীর আন্দোলন, গুপ্ত স্বদেশী, কৃষি, জমিদারি, সমবায়—প্রায় সব ব্যাপারেই। আর এগুলির মধ্যে তাঁর চিন্তা বহুধা বিভক্ত এবং স্ববিরোধী হয়েছে এমন ধারণাও ঠিক নয়, যেমন ঠিক নয় তাঁর স্বদেশী রাষ্ট্রচিন্তা ভাবাকুল বিশ্বপ্রেমে অথবা উপনিষদীয় ভগবৎ-ধারণায় সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এমন ধারণা। তাঁর ভাষায় কাব্যগুণ আলংকারিকতা স্বাভাবিক বলে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি মাঝেমধ্যে উপনিষদকে মাঝে মধ্যে গ্রহণ করেছেন বলে এসবের দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন এমন অনুভব অসম্যক দৃষ্টির পরিচয়। তবে একথা ঠিক যে, কালের গতিতে এবং স্বদেশিক বৈদেশিক ঘটনার ভূমিকায় তাঁর ধারণার অল্পস্বল্প পরিবর্তন ঘটেছে। এসব মিলিয়ে এবং তাঁর সহজ মৌল অনুভবকে সামনে রেখে তাঁর দেশ ও সমাজ-চিন্তার একটা স্পষ্ট ছবি গড়ে তোলা যায় এবং তা বোধ হয় তাঁর কাব্যিক উপলব্ধির সঙ্গে মিলিয়েও নেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। যে লক্ষণীয় ভাবসূত্র তাঁর সব খণ্ডপ্রকাশকে অখণ্ড করে অনুভব করায় তা হল এই যে, তিনি চিরনূতনের উপাসক। কাব্যজীবনের প্রথমের দিকে রোম্যানটিক কবিকল্পনায় তিনি প্রাচীন ভারতকে চিত্তাকর্ষকরূপে অনুভব করেছেন। কিন্তু একালের দেশ ও সমাজের রূঢ়তা যখনই তাঁর কাব্যভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তখন থেকে তিনি পুরানো পথ, পুরানো সংস্কার সর্বতোভাবে বর্জন করারই নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক, কালবাহিত ভাবনা ও ধারণা বহন করে রবীন্দ্রনাথ একালের আমাদের মুগ্ধ করেন নি। তিনি যদি নোতুনের দিশারী এবং জীবন-সংলগ্ন না হন তাহলে তিনি কিছুই না। বলা বাহুল্য, তাত্ত্বিকতা এবং প্রাচীন-পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ কবি নিজেই করেছেন বহুবার, মৌলিক লেখার মধ্যে তো বটেই, চিঠিপত্রে এবং ভাষণেও। হয়তো ভুল বুঝেছি, হয়তো ইচ্ছে করেই ঠিক বুঝতে চাইনি।

বাংলাদেশের মারণ-যজ্ঞের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচেতনার কথাই প্রথম দেখা যাক। বহুপরিচিত তাঁর একটি গান হল—

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে।

'রাজা' নাটকের রাজা প্রজা সম্পর্কের গান। রাজা অধ্যাত্ম-নাটক, কিন্তু রবীন্দ্র-অধ্যাত্ম মানুষ এবং নিসর্গের বাইরের কোনো তুরীয় ব্যাপার নয়। তা ছাড়া বাস্তবের রেখাচিত্র অনুসরণ না করে, বর্ণিত বিষয়কে প্রতীতিসিদ্ধ না করে সার্থক কল্পনা ও সংকেতসৃষ্টিও সম্ভব নয়। সুতরাং কবির রাষ্ট্রিকতা-বোধ গানটির নির্মাণের মূলে কাজ করেছে। প্রজারা এতে স্বাধিকারের আনন্দ ব্যক্ত করছে, কিন্তু এ আনন্দ নৈরাজ্যের নয়, রাজাকে অর্থাৎ রাষ্ট্রকে স্বীকার করেই এ আনন্দ। রাষ্ট্র আছে, তার দাসত্ববোধ নেই। শাসনদণ্ডের চালনার প্রয়োজনই হয় না, এ সম্ভব হয় যদি প্রজার ইচ্ছা এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য এক হয়ে পড়ে। প্রজার স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক কর্মবন্ধনের যোগসূত্রমাত্র সেই রাষ্ট্র যদি হয়, নিঃশেষ প্রজাকল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থে যদি রাষ্ট্র নিহিত না থাকে তাহলে সন্ত্রাস এবং শাসনের কোনো প্রয়োজনই থাকে না। এ যেন এক স্বেচ্ছাবন্ধন যার মধ্যে নিয়মকানুন এবং স্বাধীনতা একার্থবাচক। বলা বাহুল্য, মানুষের উন্নত সমাজ-বোধই এরকম 'থেকেও নেই' রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্ভব করতে পারে। 'রাজা' লেখা হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে, যতদূর মনে পড়ছে কবি তখন শিলাইদহে, প্রত্যক্ষ জমিদার-প্রজা সম্বন্ধের মধ্যবর্তী হয়ে। এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ভালোভাবেই অধ্যয়ন করেছেন, ইংরেজ-ভারতবাসী সম্পর্ক নিয়ে লিখেছেনও বেশ কিছু, এবং কেবল স্বদেশের শোষণ-শাসন নিয়েই নয়, চীন ও আফ্রিকায় পুঁজি-উপনিবেশ স্বার্থের নিতান্ত নগ্ন প্রকাশ নিয়েও। তা ছাড়া কিছু পূর্বে বঙ্গবিভাগের ফলে যে প্রবল স্বাদেশিক আন্দোলন প্রারব্ধ হয় তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে জড়িয়েও পড়েছিলেন কবি। তাঁর রাষ্ট্রিক ও মানবিক চৈতন্য এই ঘটনাতেই পূর্ণভাবে উদ্বোধিত হয়, আর সেই উদ্বোধনের ফলেই নোতুন এবং মৌলিক সমাজনীতি-চিন্তার দ্বারও তাঁর কাছে খুলে যায়।

এই চিন্তার প্রকাশ তাঁর "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ, প্রকৃত বঙ্গবিচ্ছেদের প্রাক্

একবছর আগে লেখা। এই ভাষণের মূল কথা হল গ্রামকেন্দ্রিক নব্যরীতির সমাজশাসনব্যবস্থার সংগঠন, পূর্ণ স্বরাজের পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসন শিক্ষা, সংক্ষিপ্ত বাক্যে গঠনমূলক স্বদেশী, যা তখনকার সোচ্চারকণ্ঠ অথচ ইংরেজকৃপাভিক্ষু নব্যশিক্ষিত স্বাদেশিকদের চিন্তা ও উদ্‌যোগের ত্রিসীমায় ছিল না। কিন্তু পরেও কি সত্যকার কোনো সংগঠনপ্রয়াস হয়েছে? নরম এবং চরম, অসহযোগ এবং সহযোগ, কাউন্সিল প্রবেশ এবং অপ্রবেশ, গ্রহণ এবং বর্জন, ডোমিনিয়ন এবং স্বরাজ, অনশন এবং অনশন-প্রত্যাহারের বিষম আবর্তে অর্ধশতাব্দী ঘুরপাক খেয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে যাত্রীবোঝাই নৌকা সেই আঘাটাতেই এসে ভিড়ল যেখানে কোনক্রমে হালে পানি পাওয়া গেলেও প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে উঠল। দেশ গঠনের প্রয়োজন ছিল পূর্বাহ্ণেই, তা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন—'বড়ো দুঃখের মধ্য দিয়েই সকল দেশ সার্থকতায় পৌঁছেছে।' তিনি জানতেন ইংরেজদের ফেলে-যাওয়া এই শ্মশানে শবলুব্ধদের মেলা বসবে, তার পর সুকঠিন চিতাগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার পর যথার্থ চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটলে তবেই মুক্তি মিলবে, মানুষ মানুষের অধিকার ফিরে পাবে। রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী বলেই জটিল দুর্বিপাকের মধ্য দিয়েও মানুষের বাস্তব মুক্তির ছবি দেখেছেন। কী হয়নি এবং কী হতে পারত একথা ভেবে আজ হয়ত লাভ নেই, তবু রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার মধ্যে এমন কিছু সাধারণ সত্য থেকে গেছে, যার অনুসরণে ব্যাপক সর্বনাশের মধ্যেও পথের সন্ধান হয়ত বা পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র বলতে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃষ্ট সমাজবন্ধনের স্বরূপকেই বুঝেছেন এবং তাকে গ্রামকেন্দ্রিক করতে চেয়েছিলেন এই অর্থে যে, গ্রামীণ মানুষের সংখ্যা তখনকার ভারতে শতকরা নব্বই এবং জীবিকা হিসেবে কৃষি এবং কৃষকেরই প্রাধান্য। দেখতে হবে তখন কল-কারখানা এবং শ্রমিক-জীবন-সমস্যা উল্লেখযোগ্য মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়নি। পরে যখন তা হয়েছে তখন সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথই তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। যাই হোক, জীবনের কৃষি-কেন্দ্রিকতা ছাড়া সুচিরাগত একধরনের সমাজ-সহযোগিতাও আমাদের দেশে ছিল, যার জন্য গ্রামকেন্দ্রিক আত্মশাসনকেই তিনি দেশগঠনের ভূমিকা হিসেবে দেখেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর পরিকল্পিত সমাজকর্মি-সভার সংবিধানও তিনি রচনা করেছিলেন এবং আধুনিক রাষ্ট্রের যা যা করণীয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, অর্থভাণ্ডার ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকার সংস্থান, বিচার-ব্যবস্থা পর্যন্ত প্রায় সবই এই

স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য, বৈদেশিক শাসনের অন্তর্বর্তী অবস্থায় এরকম প্রায় পূর্ণস্বরাজ সম্ভবপর ছিল কিনা সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রশ্ন হতে পারে, না-হয় সরকারি স্কুলে হাসপাতালে কোর্টে না-ই গেলাম, মাতৃভাষাতেই আমাদের শিক্ষা না-হয় হল, কিন্তু সরকার-নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর দেব কিনা, নির্ধারিত মুদ্রামান অগ্রাহ্য করা কতদূর চলবে, সরকারি চাকরি গ্রহণ করব কিনা, কলকারখানা স্থাপনে বিদেশীর ব্যবস্থা হব কিনা, দ্বৈতশাসনের জটিলতা অতিক্রম করা কতদূর সাধ্যায়ত্ত হবে, জমিদারি ব্যবস্থার কী গতি হবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার উপর সমাজ-নিয়ন্ত্রণ কীভাবে প্রয়োগ করা হবে— এইসব সম্ভাব্য সমস্যার ফাঁক এই পরিকল্পনায় থেকেই গিয়েছে, তা ছাড়া এরকম উদ্‌যোগে সাম্রাজ্যবাদীর সদিচ্ছার উপরেও হয়ত অলিখিতভাবে নির্ভর করা হয়েছে, এবং সর্বোপরি নানা বর্ণে-সম্প্রদায়ে বিভক্ত স্বভাবতই স্বার্থসন্ধানী এই জাতটার উপরেও রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু প্রাথমিক প্রত্যাশা ন্যস্ত করেছেন, অর্থাৎ তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁক থেকে গেছে, তবু বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের ভাবমুহূর্তে বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে আপোষহীন এরকম সমাজনির্ভর সংগ্রামপদ্ধতি স্বাধীনতার পরবর্তী দেশগঠনে প্রবলভাবে সহায়ক হত নিঃসন্দেহে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য হয়ত এই পথেই সহজে সম্ভব হত, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের এবং নবশিক্ষিত চাকুরিসহায় বাবু ভদ্রলোকদের সঙ্গে অশিক্ষিত কৃষক ও মেহনতী মানুষের দুইমেরু-ব্যবধান ক্ষীণ হয়ে পড়ত। এরকম সামাজিক রাষ্ট্রগঠনের মৌলিক কার্যকারিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশচিন্তার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিঃসংশয় ছিলেন এবং বিষয়টির অকুণ্ঠ পুনরাবৃত্তি করেছেন বহু প্রবন্ধে এবং ভাষণে। আত্মশক্তি, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, অবস্থা ও ব্যবস্থা, পাবনা সম্মিলনীতে ভাষণ, ব্যাধি ও প্রতিকার, সমবায় প্রভৃতি স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমকালীন রচনা থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রদত্ত ময়মনসিংহের জনসভায় ও শ্রীনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণাবলী পর্যন্ত কবির বক্তব্যের এই একই সুর। তাঁর এই কার্যকরী স্বাদেশিকতার ধার দিয়েও যে সেকালের রাজনীতিকেরা গেলেন না তাই নিয়ে তাঁকে বহুবার খেদোক্তি করতেও শোনা যায়, যেমন—"আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন" অথবা "আমি অনেকবার বলেছি, কবি ব'লে আমার কথা শোনে নাই"।

হিন্দু-মুসলিম বিরোধ যা আমাদের স্বাদেশিক আন্দোলনের অসাফল্যের মুখ্য

কারণ, তার সমাধান রবীন্দ্রনাথ সামাজিক মিলনের মধ্যে দেখেছিলেন। রাজনীতিগত ধর্মীয় আপোষের ঐক্যকে তিনি বালুকার বন্ধন বলেই মনে করতেন। আমরা মনে করি, সামাজিক মিলন বা সামাজিক সমকক্ষতা বলতে তিনি সামাজিক ওঠা-বসাকেই বোঝেননি, বিবাহের দ্বারা গঠিত আত্মীয়তা-সম্পর্কও অনুমান করেছিলেন, যদিও একথা ঠিক যে কাম্য হলেও সমাজের পক্ষে অতিতুরূহ এই ব্যাপার নিয়ে স্পষ্ট কোনো নির্দেশও তিনি দিতে চাননি। তাঁর ধারণা বোধ হয় এই ছিল যে কর্মক্ষেত্রে মিত্রতা ঘটলে এবং অশিক্ষার অন্ধকার দূর হলে হিন্দুপক্ষে আচারের দাসত্ব এবং মুসলিম পক্ষে ধর্মের গোড়ামি চলে যাবে এবং গভীরতর মিলনের ক্ষেত্র আপনা থেকেই উন্মুক্ত হবে। একবার সংগঠনের পথ চালিত হলে জনস্রোত নিজের পথ নিজেই ঠিক করে নেবে। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের দুস্তর পার্থক্যের বিনাশেও রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই আশা পোষণ করতেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান বিষয়ে চিন্তা এবং পথনির্দেশ তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে।

'স্বদেশী সমাজ' ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "যে লোকের ব্যবসা বাঁশি বাজানো, সহসা সর্পাঘাতের উপক্রম হইলে সে বাঁশিকে লাঠির মতো ব্যবহার করিয়া থাকে, আমার যাহা কিছু শক্তি আছে তাহা উদ্যত করিয়া আজ দেশের এই দুর্দিনে আসন্ন অমঙ্গলকে ঠেকাইতে চেষ্টা করিয়াছি· আমি শুধু উদ্দীপনার জন্য এই প্রবন্ধ পাঠ করি নাই।" এরকম উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় কবিকে কর্মীর ভূমিকায় নামতে দেখে। শিলাইদহে সমবায় পদ্ধতিতে চাষে উৎসাহ, পতিসর ও কুষ্টিয়ায় সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনা, শ্রীনিকেতনে গ্রামসংগঠনের স্থায়ী উদ্যোগ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নৈষ্ঠিকতা এবং শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অনীহা তুলনা করে দেখবার বিষয়। পরম দুঃখে ও ক্ষোভে তিনি একবার বুদ্ধিজীবীদের ভৎসনা-সহযোগে লাঞ্ছিত করে ছেড়েছিলেন। সে ১৯৩৭ এর কথা। শ্রীনিকেতনে কবিকে কেন্দ্র করে রবিবাসরীয় দলের সাহিত্য-সভা। অপ্রত্যাশিত ভাবে কবি তাঁর ভাষণ শুরু করলেন এই বলে—"এখানে আমি কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করিনে। এখানে আমার এই কর্মের ক্ষেত্রে আমি কী করেছি না করেছি তারই পরিচয় আপনারা পাবেন। · যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকের অভাব অভিযোগ, এবং কতবড়ো অভাগা যে তারা তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই সব গ্রামবাসীরা যে

কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে।.... গ্রামের লোকের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি একথা নিশ্চয় ক'রেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য-জীবনের কথা প্রকাশ করেননি।.. তখন কেবলই মনে হত জনকতেক ইংরেজি জানা লোক ভারতবর্ষের উপর—যেখানে এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে।...” এইভাবে বলতে বলতে কবি তৎকালীন স্বার্থসন্ধানী এবং নেতৃত্বের ভিখারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বরূপ অতি দুঃখে ও ক্ষোভে উদঘাটিত করে দিলেন এবং অভিযোগ সহকারে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি অন্তরের দিক থেকে ঠিক ঐ মনোভাবের নন —“আজ আপনারা সাহিত্যিকরা এখানে এসেছেন, আপনাদের সহজে ছাড়চি নে --আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদের এই অনুষ্ঠান। দেখে যেতে হবে দেশের উপেক্ষিত এই গ্রাম, বাপ-মায়ের তাড়ানো সন্তানের মতো এই গ্রামবাসীদের, এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন ক'রে ছিন্ন বস্ত্র নিয়ে অর্ধাশনে দিন কাটায়। আপনাদের নিজের চোখে দেখতে হবে, কত বড়ো কর্তব্যের গুরুভার আমাদের ও আপনাদের উপর রয়েছে। .. আমি ধনীসন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না—এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন।...”

তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমেই রবীন্দ্রনাথ জমিদার হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর জমিদারি জমিদারির বিপরীত দিকটাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি কাব্যকল্পনার চোখে প্রজাদের দেখেন নি। নায়েব গোমস্তা পুলিশের শোষণ ও অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করেছেন যেটুকু সাধ্য এবং মহাজনদের হাতে দরিদ্র চাষীর জমি বিক্রী না হয়ে যায় সেদিকেও যেটুকু সাধ্য নিশ্চয়ই নজর রাখতেন। এবিষয়ে প্রমাণ তাঁর অন্তরঙ্গ চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধাদিতে বহুবার প্রকাশিত তাঁর কৃষক-প্রজার দুর্দশা বর্ণন। রায়তদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার তো তাঁর মজ্জাগত সংস্কার ছিল বললেই চলে। এসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যেত যদি শিলাইদহ-

সাজাদপুরের নথিপত্র এবং প্রজাদের কাছে রক্ষিত দলিল প্রভৃতি অনুসন্ধান করা যেত। সে সম্ভাবনাটুকুও এখন নষ্ট হয়ে গেল পাকিস্তানী সৈন্যের উন্মত্ত ধ্বংস-লীলায়। রবীন্দ্রনাথ স্থির জানতেন যে 'জমির স্বত্ব ন্যায়তঃ জমিদারের নয়, সে চাষীর' এবং জমিদাররাই বিদেশী সরকারের সবচেয়ে বড় আমলা। তবু কেন তিনি জমিদারি উঠিয়ে দেওয়ার সপক্ষতা করেন নি তার সদুত্তরও তিনি দিয়েছেন নানা জায়গায়। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন যে তাহলে স্বল্পভূমি দুর্বল রায়তের জমি গ্রাস করে প্রবল রায়ত এবং মহাজন নোতুন জমিদার হয়ে উঠবে এবং এদের অত্যাচার প্রজার পক্ষে আরও অসহ্য হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ জমিদারি বিলোপ এবং সেই সঙ্গে রায়তের স্বত্ব সংরক্ষণ ব্যাপক সামাজিক বা রাষ্ট্রিক শক্তির অপেক্ষা করে। সে সুযোগ এখন এসেছে, বিদেশী শাসনে তা অকল্পনীয় ছিল। কবির পাবনা-সম্মিলনীতে ভাষণের কথা স্মরণ করা যাক—"এই উপলক্ষ্যে দেশের জমিদারদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্‌যোগী না হইলে এ কাজ কখনোই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে"……ইত্যাদি। 'ছিন্নপত্র' প্রভৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাদের উপর অকপট প্রীতির কথা জানিয়েছেন, তাতেও নিশ্চিত বুঝা যায় যে তাঁর প্রজাপ্রীতি নিষ্ক্রিয় সাহিত্যিক ব্যাপার ছিল না। মনে রাখতে হবে, কবির এসব কথা এদেশে কৃষক-আন্দোলনের বহু আগেকার এবং এদেশের তখনকার সেরা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে কৃষকদের সম্বন্ধে বহুদিন পর্যন্ত নিতান্তই নীরব সেখানে স্বকীয় সীমিত উদ্‌যোগে কৃষকদের দুঃখদুর্দশা এবং অশিক্ষা নিরাকরণের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথেরই।

বস্তুতঃ এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি সামগ্রিক ধারণার অধীন ছিলেন, তা ভাববাষ্প-বিমলিন ছিল না এবং উদারতা ও সক্রিয় বাস্তবতার সম্মিলনে তা একান্তভাবে মৌলিক ছিল। শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ এবং শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব তাঁর এই সামগ্রিকতারই অঙ্গীভূত। দেশগঠনের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল

কোনো সংস্কার তাঁকে পশ্চাদ্‌গতি করতে পারেনি। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার এবং যন্ত্রচালিত কলকারখানার সম্প্রসারণে মানুষের লক্ষ্মীলাভ বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল ধারণা তিনি বহুবার ব্যক্ত করেছেন। তাঁর আপত্তি ছিল যান্ত্রিক উৎপাদনের মুনাফালোভী মালিকানায়। স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনায় ধনী জমিদার ও মহাজনদের স্থিতির বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যাননি সত্য, কিন্তু তাদের ধনাধিকারকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীন করে দেখেছেন। পরবর্তী কালে গান্ধীজী যে অছিবাদের কথা বলেছেন তা থেকেও এই সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ অধিকতর কার্যকর ব'লে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। রাশিয়া ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে তিনি তাঁর সীমিত উদ্‌যোগে যা করতে চেয়েছিলেন সেখানে তারই দেশব্যাপী তোড়জোড়। যেমন, রাশিয়ার চিঠির প্রারম্ভেই বলছেন—"আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে।..... প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে আর কী হতে পারত।" আর সকল প্রয়াসের সব উদ্‌যোগের যে-সারতত্ত্বকে এখানে স্বীকৃত দেখে তিনি নিজ উদ্‌যোগকেও যথার্থ বলে মনে করলেন, তা হল শিক্ষা—জনশিক্ষা। ভারতের অশিক্ষার দুর্গতিকে মানুষের স্বাধিকার অর্জনের প্রবলতম বাধা বলে অনুভব করে এরকম কথা বহুপূর্বেই তিনি বারংবার বলেছেন—"আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেন না আমাদের লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এই জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন জারি করিবার জো নাই।"

দেশগঠন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সামগ্রিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন তাতে কোথাও স্ববিরোধ ছিল এমন আমরা মনে করি না। এমনকি তাঁর মনন এবং কবিকল্পনার মধ্যেও স্বভাবের বিপর্যয় অনুভব করা যায় না, যদিও একথা ঠিক যে তাঁর উপলব্ধি কালক্রমে নূতন অভিজ্ঞতার স্পর্শে বিস্তার ও বিকাশলাভ করেছে। মৌলিক এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার অধিকারী ছিলেন বলেই প্রথম দিককার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর মেলেনি, অথচ ঐ সময়েই তিনি শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী আদর্শকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। জীর্ণ প্রথা এবং সংস্কারের দাসত্বে আবদ্ধ, অনৈক্য অসাম্য এবং স্বার্থকলুষিত বিভেদে বহুচ্ছিদ্র

অবস্থায় সাময়িক তাগিদারা রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ অনাগ্রহী ছিলেন, একজ যখন গান্ধীজী রঙ্গমঞ্চে এলেন তখনও বয়কট এবং চরকা-খদ্দর-অনশনের সঙ্গে তিনি নিজেকে মেলাতে পারলেন না। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহী ব্যক্তিত্বের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, অসহযোগকে জনজাগরণের মূল্যে সার্থে স্বীকারযোগ্য বলেও তিনি মনে করেছিলেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সরকার নিজের পছন্দমত এক এক দফা রঙীন কানুন ছাড়বেন, আর তাই নিয়ে ছেলেমানুষি কাড়াকাড়ি দলাদলি উত্তেজনা আরম্ভ হবে এ তিনি সহ্য করেন নি। গণ-অধিকারের প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন বলেই কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রায় শেষ পর্যায়ে স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের প্রতিবাদ করেছিলেন। রাজনীতি আখ্যার দল্‌-স্বার্থনীতি এবং কৌশলজাল বিস্তারকে তিনি ঘৃণাই করেছেন এবং দেশের মৌল সমস্যাগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের তেমন যোগ নেই বলে একে যথাসম্ভব পরিহারই করেছেন, সুতরাং শান্তিনিকেতনে এই ধরনের সাময়িক উত্তেজনা প্রবেশ না করে সে বিষয়ে সতর্কও হয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনকে কখনো কখনো এবং হরিজন আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন, অথচ গান্ধীজীর চরকা-খদ্দর-অনশনের অসমর্থন থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সংগ্রামের কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু অভ্যাসজাত সংস্কার, নির্বিচার প্রথানুসরণ এবং গুরুবাদের পরম বিরোধী ছিলেন ব'লেই এগুলি মেনে নিতে পারেননি। গুপ্ত স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব ছিল ব'লে তিনি সমালোচিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অসমর্থনের পিছনে এই যুক্তি ছিল যে নিরস্ত্র দেশে এধরনের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রয়াস অসার্থক হবে, এ বীরত্বের আত্মঘাত। তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতার 'কী যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে' পঙ্‌ক্তিতে এ বিষয়ে তাঁর সহানুভূতি অথচ অসমর্থন দুইই প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের কয়েকটি স্থানেও তিনি গুপ্ত স্বাদেশিকতার সংগ্রামী বীরত্ব এবং দুঃখবরণের দিকটিকে সকরুণ উদার দৃষ্টিতে দেখেছেন, যেমন—'অসহিষ্ণু তারুণ্যের হৃদয়বিদারক প্রমাদ' 'সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের মহিমা' 'হৃদয়াবেগকে একমাত্র সম্বল করিয়া তাহারা দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে' প্রভৃতি মন্তব্য। তবু 'ঘরে-বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে গুপ্ত বিপ্লবীর চরিত্রাঙ্কনের সমর্থন যথার্থই কঠিন হয়ে পড়ে। এমন অবশ্য হতে পারে, তিনি সাধারণভাবে রাজনীতিক চরিত্রে যে আন্তরিকতার অভাব দেখেছিলেন তার প্রভাব এতেও পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবী মনোভাবের উৎকৃষ্ট এবং যথার্থ বাহন তাঁর কাব্য-

কবিতা ও নাটক। সেখানে উচ্চকল্পনাবলে সমগ্রদৃষ্টিতে তিনি ইতিহাস ও জীবনকে দেখেছেন এবং পুরাতনকে সবলে দূরে নিক্ষেপ করে নোতুন জীবনের জন্য সংগ্রাম ও মৃত্যুকে বরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই রবীন্দ্রনাথই আমাদের বিস্ময় এবং পুনঃ পুনঃ নমস্য। কাব্যে যা বলেছেন গদ্যে প্রবন্ধে তা বলেননি এমন নয়, তবে অত সুনিশ্চিত এবং ব্যাপকভাবে হয়ত নয়। এ স্বাভাবিক, কারণ, রাজনৈতিক প্রবন্ধে সশস্ত্র বিপ্লবকে পারিস্ফুটভাবে সমর্থন জানানো তাঁর পক্ষে তখন অসম্ভবই ছিল। তবু প্রবন্ধে যা বলেছেন তাও কম নয়, নিচের কয়েকটি দৃষ্টান্তই তা বুঝিয়ে দেবে। কাব্যের কথা পরে বলছি। অন্ততঃ ত্রিশ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ মানুষে-মানুষে যে অসাম্য দেখে এসেছেন ১৯৩৪এ তারই ধনতন্ত্রগত মূর্তি উপলব্ধি করে স্বার্থবাদীদের তিনি সাবধান করে দিয়েছেন—"এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে, কেন না শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে" ঐ 'দেশের কাজ' ভাষণেই উচ্চারিত নিম্নলিখিত বক্তব্যটি ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তান সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল দেখছি।—"পৃথিবীতে ধন-উৎপাদক এবং অর্থ-সঞ্চয়িতার মধ্যে সেই সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত ধরেব কাছেই দেখতে পাব। বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করতে রক্ত জল করে যাচ্ছে, অথচ সেই পাটের অর্থ বাংলাদেশের নিদারুণ অভাব মোচনের কাজে লাগছে না। এই যে গায়ের জোরে দেনা পাওনার স্বাভাবিক পথ রোধ করা, এই জোর একদিন আপনাকেই আপনি মারবে। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক অসাম্যের চির-প্রতিবাদী হলেও দেখা যায়, রাশিয়া-পরিদর্শনের পর থেকে এই অসাম্যকে আর একটু গভীরতর অর্থে দেখছেন। রাশিয়ায় অশিক্ষা এবং দারিদ্র্য দূর করার ব্যাপক আয়োজনে চমৎকৃত অথচ স্বদেশের জন্য মর্মাহত কবি তাঁর বক্তব্যে উচ্চসম্প্রদায়ের সমালোচনার সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করেই বললেন "আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।' উপসংহারের দিকে বলছেন—"এই বহুবিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না একথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোঁয়ার্তুমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে সেই হতভাগারাই দুঃখবিধাতার

প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়, তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।" এতে স্পষ্টভাবে শ্রেণীস্বার্থময় সংঘাতের আভাস দেওয়া হচ্ছে। এর পূর্বে যে সব জায়গায় সংঘাত ও বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে তাতে ধনতান্ত্রিক অসাম্য ছাড়া অন্যবিধ অসাম্য এবং অন্ধতাও স্থান পেয়েছে। তবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক শোষণের হরিহর সম্পর্কের বিষয় তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই ধরেছিলেন।

ভারতবর্ষে বহুকাল-আগত পাকা করে গাথা সার্বিক শ্রেণীবৈষম্যের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ যেমন করে বুঝেছিলেন সেকালে তেমন করে বোঝা এবং তেমন করে বলার আন্তরিক প্রয়াস কোনো রাজনীতিক নেতার মধ্যেও দেখা যায় না। নেহরু এবং সুভাষচন্দ্রের প্রগতিবাদী মানস-গঠনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের সম্ভাব্যতার বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ধনতান্ত্রিকতার যে একটা সম্পর্ক আছে তা রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু করেছেন তাঁর রাশিয়া পরিদর্শনের পূর্বেই, এমনকি রুশ-বিপ্লবেরও আগে। পশ্চিমী Nationalism-এর বিপক্ষে তিনি যে সব ভাষণ দেন তাতে অস্ত্রসহায়ে উপনিবেশকে শোষণ এবং য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রভূত ধনসঞ্চয়ের কথা তিনি বারংবার বলেছেন। 'জাপান-যাত্রী' এবং 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র পাঠকও তা নিঃসন্দেহে বুঝবেন। 'জাপান-যাত্রী'তে পণ্যবাহী য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে এক জায়গায় বলছেন—"একে দেখে মনে হয় যে, এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানবগুলোর মত .... সে যে কেবলমাত্র থাবা থাবা জিনিষ খাচ্ছে তাই নয়, সে মানুষ খাচ্ছে—স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না... আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত করছে, আপন শব্দের দ্বারা বধির করছে, আপন আবর্জনা দ্বারা পৃথিবীকে মলিন করছে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত করছে। মুনাফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এই বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে?" পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে বলছেন—"বীভৎস সর্বভুক্ পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্স্ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁটকাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।" অথবা "সর্বভুক্ পেটুকতার এত বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনোদিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয়নি।" আমেরিকা দর্শনে ধনতন্ত্রের অমানবিকতা কবির কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু আশাবাদী কবি এরই মধ্য থেকে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন—"লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো ক'রে সেইগুলোকে

আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি ক'রে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে। এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না।" রাজনীতি ও অর্থনীতির ছাত্র নন বলে এবং সম্ভবতঃ সঠিক সংবাদের অভাবেও রবীন্দ্রনাথ জানতে পারেননি যে একথা যখন লিখছেন তখনই মহাকালের নির্দেশ এসে গেছে, পৃথিবীর অন্তত একটা জায়গায় ঐ দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে নিপীড়িত শূদ্র মানুষ সেইমাত্র তার ন্যায্য অধিকার পেয়ে গেছে। পণ্য-উৎপাদন এবং মুনাফার রহস্য এবং বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ রবীন্দ্রনাথ হয়ত পুরোপুরি জানতেন না শেষ পর্যন্ত, তাঁর পক্ষে জানার কথাও নয়, আর জানলেও এ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে তাঁর সর্বাংশে মিলও হয়ত সম্ভবপর ছিল না, তবু তাঁর কণ্ঠ থেকেই আমরা বাংলা ভাষায় শোষণজনিত সংগ্রামের প্রথম পরিচয় পাই, এও অত্যুক্তি নয়।

ধনতান্ত্রিকতাই হোক আর জাতিবর্ণ বৈষম্যই হোক তাঁর বাস্তব ও সুবৃহৎ মানবিকতার মধ্যে সব নিঃশেষে মিলে গেছে, এজন্য তাঁর প্রাবন্ধিক বক্তব্যে ও কাব্যের অর্থে কোনো বিরোধ লক্ষ্য করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, উপনিষদ কথিত রস এবং আনন্দ তিনি নিসর্গ এবং মানুষের মধ্যেই রূপায়িত অনুভব করেছেন, তুরীয় কোনো লোকান্তরে নয়। তাঁরই উক্তিমতে "আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানুষের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ।" এই মানুষ ইতিহাসের ধারায় চলমান, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়-সংগ্রাম পতন-উত্থানের মধ্য দিয়ে অজানা পূর্ণতার যাত্রী বাস্তব মানুষই।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, যা এখনও আমাদের শ্রোতব্য এবং জ্ঞাতব্য তা এই যে তিনি বিন্দুমাত্রও পুরাতনের পথিক ছিলেন না, তিনি চির-নূতনের বার্তাবহ এবং তা সর্বতোভাবেই। তুলনায় দেখা যায় এদেশের বুদ্ধি-জীবীরা তাঁর কল্পনা এবং ভাবনা থেকে চিরকাল পিছিয়েই পড়ে থেকেছেন। যারা রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের ব্রহ্মগত রস অমৃত প্রভৃতির বাহক বলে মনে করেন তাঁরা ভেবে দেখেন না যে রবীন্দ্রনাথ মানবীয় স্নেহপ্রেম আত্মত্যাগ দুঃখ-বরণের মধ্যেই অমৃত এবং ভূমাকে পেয়েছেন। তিনি জীবনের এত উচ্চ মূল্য দিয়েছেন যে তার বর্ণনায়, ভাষার অভাবে, ঐ সব শব্দ ব্যবহার করেছেন। নতুবা তিনি বর্ণাশ্রম এবং ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে গেছেন এমন কথা তাঁর অতিবড় শত্রুরও বলা উচিত হবে না। সংস্কারবিমূঢ় প্রাচীনতার পক্ষপাতী অদূরদর্শী বিচারকেরা

পাচ্ছে তাঁকে ভুল বোঝে এজন্য তিনি আত্মপক্ষ বিশ্লেষণে নিরত হয়েছেন বার বার, তবু ঐ প্রাচীনপন্থীদের ঋষিত্ব-সংস্কারের জোর এত বেশী যে এরকম জীবনের মহাকবিকে তাঁরা পিছনেই ফেলে রাখতে প্রয়াস করলেন, যার ফল আজকের তরুণেরা রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার করে বিদায় দিতে দ্বিধা করছে না। কিন্তু শিল্পী রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা শোনা যাক—"নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী" (কালান্তর)। "পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্যধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে থাকে। মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে। পুরাতন সংস্কারে কোনোদিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না" (গান্ধীজী)। "আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়, অর্থাৎ খুঁটিগাড়া মত ও পদ্ধতি অতীতকালে আড়ষ্টভাবে বদ্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেয়কে নিবদ্ধন করতে পারবে একথা আমি মানিনে" (কালান্তর)। আমরা পূর্বেও বলেছি, এখানেও বলছি, উপনিষদ প্রভৃতির বচনগুলিকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনের ও তাঁর নিজ আধুনিক ধারণার অনুকূলে গ্রহণ করেছেন। একটা সহজ দৃষ্টান্ত ধরা যাক, 'তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'। এই তমঃ বলতে রবীন্দ্রনাথ অশিক্ষামূলক ভারতীয় কুসংস্কারের অন্ধতাকে বুঝলেন, আর মৃত্যু বলতে বুঝলেন ভীরুতা, জড়ত্ব, যাবতীয় অচল দাসত্বের বোঝা। তাঁর ধারণায় "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—এ কথাটি য়ুরোপেরও অন্তরের কথা। কারণ, য়ুরোপ বীরের ন্যায় সত্যবত গ্রহণ করিয়াছে, বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে, কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না।" দেহহীন আত্মা, অর্থাৎ জীবনধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন আদর্শ এবং ধর্মের চর্চা রবীন্দ্রকল্পনারও বাইরে, এবং যথার্থ জীবনই ধার্মিক জীবন এই তাঁর মনোভাব, যেমন—"আজ যেমন করিয়াই হোক আমাদিগকে এই দেহতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে। যেমন করিয়াই হোক আমাদের এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে, কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে" (পথের সঞ্চয়)। এ ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সম্পূর্ণ মিলে যায়। কিন্তু এই বিবেকানন্দকে আমরা সযত্নে সমাধিস্থ করে ফেলেছি, এমনভাবে, যাতে তাঁর পুনরুত্থানের কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও কি সেরকম করব, তাঁর সর্বাঙ্গ বল্মীক দিয়ে ঢেকে তাঁকে চ্যবনপ্রাশের উন্নততর বিজ্ঞাপনে পরিণত করব?

পূর্বেই বলেছি যে সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কার এবং অত্যাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের আহ্বান এবং বিপ্লবের আভাস তিনি তাঁর কাব্যকৃতির মধ্যেই বিশেষভাবে জানিয়েছেন। এর অনেকগুলিরই মর্ম আমরা ঠিক ধরতে পারিনি, বুঝতে পারিনি বলে মনে করেছি কবি জীবনদেবতা ভগবানের স্তব করেছেন। যেমন ধরা যাক 'বলাকা'র 'পাড়ি' কবিতা ('মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে')। এর প্রথম স্তবকের ব্যঞ্জনাময় নৈসর্গিক দুর্যোগের মধ্যে সমাজে শ্বাসরোধকারী অমানবীয় অবস্থায় বিপ্লবের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। এই দুর্দিনে নাবিকরূপে যিনি আসছেন তিনি ইতিহাস-বিধাতা বা কবির বহু-উচ্চারিত মহাকাল। বিশেষভাবে দুর্যোগ বিপ্লবের মধ্যেই তাঁর জয়যাত্রা। দ্বিতীয় স্তবকে বলা হয়েছে যে বিপ্লবে কী পরিবর্তন আসবে, কোন পথে জীবনের মোড় ঘুরবে তা পূর্বাহ্ণে কেউই বলতে পারে না, তবে একথা নিশ্চিত যে "অগৌরবার বাড়িয়ে গরব" অর্থাৎ লাঞ্ছিত মানুষকে স্বাধিকার দিতেই তিনি আসেন—"সে হাতকে এক পাশের পাশে অদিনে যার তবে বাহির হ'ল নেয়।" তৃতীয় স্তবকে মহাকালের ঐ আর্তের সন্ধানে উদার জীবনের উপহার নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ স্তবকে ঐ লাঞ্ছিত মানুষের দুর্দশার করুণ ছবি-

> রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে সিক্তপলক আঁখি,
> ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,

পঞ্চম এবং শেষ স্তবকে আশাবাদী কবি এদেশে ঐ ইতিহাসের নিয়ামকের আবির্ভাবের এবং নব জীবন প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়েছেন।

কবির 'খেয়া' কাব্যে 'আগমন' বলে একটি কবিতা আছে ("তখন রাত্রি আঁধার হ'ল")। এর সারার্থ কবি নিজেই এক জায়গায় দিয়েছেন। তারই অনুসরণে বলা যায়, সংশয়ী এবং নিশ্চিন্ত সুখে সমাসীন লোকেরা শেষ পর্যন্তও ভাবতে পারে না যে পরিবর্তন আসবে এবং তাদের পাকা করে বাঁধা আরামের ভিত ভেঙে পড়বে। দু' একজন দূরদর্শীর চোখেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু যখন সত্যই ভাঙনের মধ্য দিয়ে তিনি আসেন তখন—

> বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
> বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে
> ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা।
> ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখরাতের রাজা॥

কবির ধ্রুব ধারণায় অশান্তির মধ্য দিয়ে না গেলে স্থায়ী শান্তি আসতে পারে না। তাঁর নিজেরই ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত অনুসরণে—"বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি"—

আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান॥

এসব কথা ছন্দে গাঁথা হয়েছে বলে এগুলির গুরুত্ব কম নয়। প্রবন্ধে এবং ভাষণে তাঁর যা বক্তব্য তার সঙ্গে এগুলি স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া যায়।

বাস্তব দুঃখ দুর্বিপাককে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই দেখেছেন, এদেশে মনুষ্যচরিত্রের অধঃপতনও তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে নানা ঘটনায়, ফলে বাস্তবকে রবীন্দ্রনাথ দেখেন নি একথা ঠিক নয়। যেমন, কবি নিজেই বলছেন—

"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে"

অথবা,

"অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ।"

কিন্তু তিনি আশাবাদী বলেই কাব্যে অসুন্দরের ছবি বেশি আঁকেননি। তাঁর ধারণায় কুৎসিত জীবন আত্যন্তিক সত্য নয়। এইজন্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েও মানুষ-ইংরেজের শুভবুদ্ধির প্রত্যাশা রেখেছেন। তবু কবিতায় না হোক, নাটকে গল্পে সাহিত্যিক প্রয়োজনবশেই তাঁকে অসুন্দরের ছবি কিছু কিছু গ্রথিত করতে হয়েছে। সাম্রাজ্যিক কুশাসন, শাস্ত্র-পুঁথি ধর্মতন্ত্রের শাসন, ধনবাহিত এবং রাষ্ট্রসহায় শ্রেণী-পীড়ন এবং ঐ নিপীড়ন থেকে মানুষের উদ্ধারের স্বপ্ন প্রভৃতি বিষয় কবিতার অবয়বে সম্যক পরিস্ফুট করা যায় না বলে কবি কয়েকটি নাটকের আশ্রয় নিয়েছেন এবং বাস্তবের সঙ্গে সংকেত ব্যঞ্জনা মিশিয়ে তাঁর উপলব্ধি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। এইভাবে 'প্রায়শ্চিত্তে' সাম্রাজ্যবাদ ও একনায়কতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারমূলক অমানবিকতা, 'অচলায়তনে' জীর্ণ মধ্যযুগীয় প্রথা ও শাস্ত্রের ধ্বজাবাহীদের সঙ্গে সংগ্রাম, 'মুক্তধারা'য় যন্ত্রবিজ্ঞান নির্ভর উগ্র জাতীয়তাবাদের অবলুপ্তি, 'রক্তকরবী'তে পুঁজিবাদী নিষ্পেষণে মৃতকল্প শ্রমিকের মুক্তি এবং 'কালের যাত্রা'য় মেহনতী শূদ্রের গুরুত্ব পরিস্ফুটভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। জড়ত্ব এবং স্থবিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং পুরাতনকে ভেঙে নূতনের প্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহ্বান রূপ পেয়েছে 'ফাল্গুনী', 'তাসের দেশ' প্রভৃতিতে। অচলায়তনে অস্পৃশ্য শূদ্রের সঙ্গে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আভাস

দিয়ে ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে চুরমার করা হয়েছে। এই নাটক লেখা হবার পর সনাতনী হিন্দুরা কলরব তুলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের উপর আঘাত করেছেন। তাঁরা বোঝেননি ধর্ম এবং ধর্মতন্ত্র, হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুয়ানি এক জিনিস নয়। 'রক্ত করবী'তে মুক্তিপ্রয়াসী মেহনতী জনতার অভিযান বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও দেখানো হয়েছে যে মুনাফালোভী মালিকও স্বর্ণের দাসত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং আত্মসংগ্রাম করতে করতে অবশেষে লোভের জাল ছিঁড়ে ফেলে জনতার সঙ্গে এক হয়ে পড়েছে। এটুকুই কবির আদর্শ, কিন্তু তা হোক, কবি তাঁর সমকালের গতিশীল জীবনের ধারা থেকে কোনোমতেই পিছিয়ে থাকেন নি এবং কোনো সনাতনী আদর্শ প্রচার করতে চাননি এইটিই লক্ষণীয়। এই নাটকগুলিসংকেত ধর্মী হলেও সে সংকেতে জীবনকেই দেখানো হয়েছে, তুরীয় কোনো তত্ত্বকে নয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মোটামুটি একটা বিশ্লেষণে দেখা যায়, সোনার তরী-চিত্রা-কল্পনায় তিনি মুখ্যত নিসর্গচারী রোম্যান্টিক এবং আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ জীবনচারী ; খেয়া-নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলিতে ঐ কল্পনাধর্মেই নিসর্গ এবং মানুষ সমান অধিকারে বিমিশ্রিত ; গীতালি-ফাল্গুনীতে ক্রমশ নিসর্গের অধিকার শেষ হয়ে জীবনের দাবি প্রধান হয়ে উঠেছে। ঋতুপর্যায়ের নাটকগুলিতে নিসর্গলীলার সঙ্গে আভাসিত হয়েছে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের চিরনবীনতা। 'বলাকা'য় সংগ্রামমুখর পরিবর্তমান প্রগতিশীল জীবন এবং জীবনের ধারায় মানবমহিমাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। এই সংগ্রাম ও প্রগতিবাদ প্রণয়বর্ণনার ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার ক'রে আমাদের চিরাচরিত প্রণয়কে গোপন বিলাস থেকে মুক্ত করে রৌদ্রদগ্ধ পথিকের পথের সঙ্গী ক'রে তুলেছে। সংগ্রাম ও কর্মে অহরহ অগ্নিময় জীবনের সঙ্গে প্রেমকে মোহহীন ক'রে একত্রিত করার একটি আশ্চর্য কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথেরই এবং এ বিষয়ে তিনি আজও অনন্য। এর পরের 'পুনশ্চ' কাব্যে সাধারণ মানুষকে প্রত্যক্ষের মধ্যে অনুভব করতে চেয়েছেন কবি এবং পরের কাব্যগুলিতে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের মধ্যে স্থায়ী শক্তিরূপে নিতান্ত সাধারণ এবং তুচ্ছ মানুষই তাঁর কাছে সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়েছে। একালে কবির এই মানুষপ্রীতি এতই আন্তরিক হয়ে উঠেছে যে তিনি নিজে ঐ নিত্যদুঃখসহচর সতত সংগ্রামী জীবনের অধিকার পেলেন না ব'লে ব্যক্তিগত ভাবে খেদ প্রকাশ করেছেন—

সেই রুদ্রমানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চ'লে।

গীতাঞ্জলির কিছু পূর্বকাল থেকেই কবি সৃষ্টি এবং সমাজজীবনের মধ্যে ভাঙাগড়ার বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন ("মরণ-মিলন" কবিতা, "পাগল" প্রবন্ধ প্রভৃতি), কিন্তু 'বলাকা' কাব্য রচনার পর থেকে জাতির উত্থান-পতন এবং নিসর্গের পরিবর্তনচক্র কবিকে কিছুকাল প্রবলভাবে অভিভূত ক'রে চিরচঞ্চল এবং চিরনবীন অদৃশ্য ইতিহাসচারীর পথবর্তী করেছে। বসন্তের মধ্যে এই নবীনকে ভাঙনের দূতরূপে কবি কেমনভাবে দেখেছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'মহুয়া'র 'বোধন' কবিতাটির মধ্যে। যেমন,—

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা;
দস্যুর মতো ভেঙে চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার,
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা।

বুঝতে হবে এই রূপান্তরিত নবীনই 'মহাকাল' বা 'রুদ্র' এবং তাঁর "ভগবান তুমি যুগে যুগে দূতে"র ভগবান, "বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে" প্রভৃতির বিধাতা। আমাদের পরিচিত ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে এর তেমন মিল নেই। কথিত রুদ্রের আবর্তনের বাম এবং দক্ষিণ পদক্ষেপের মধ্যে কোনটির অধিকার রবীন্দ্রচিত্তে বেশী? কবি বলছেন—'মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে'; আরও বলছেন—'তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়'। একদিকে ইতিহাস-সচেতন, দেশ ও সমাজের দুর্বিপাকে কাতরচিত্ত এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে বহু আঘাত ও মৃত্যুর সম্মুখীন কবি সহজেই ধ্বংসের দেবতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ও ভাষণে কবি যা বলেছেন, কাব্য-নাটকের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ মিল দেখা গেল। প্রবন্ধে এবং ভাষণে রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যি' করেছেন এবং উপনিষদের ভূমা দেখেছেন এমন কথা মূঢ়েই বলবে, আবার কাব্য-নাটকে নিছক আত্মগত কল্পনা ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিস্তার করেছেন এও ছেলেমানুষি কথা। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি বলেই তাঁর নিসর্গ-অনুভব এবং জীবন-অনুভব এক হয়ে পড়েছে, যার ফলে আমরাও অগ্রগতির পথে একজন দূরদর্শী এবং অনুক্ষণ পার্শ্ববর্তী পরম বান্ধবকে পেয়ে ধন্য হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলমান মিলন

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা দু'দিক থেকে লক্ষণীয়। প্রথমত, তিনি ছিলেন যুগন্ধর। যে যুগে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন, সেই কালের ভাবনা-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর চিন্তায় বিধৃত রয়েছে। তাঁর জীবনকালে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে সকল ধ্যান-ধারণা দেশবাসীর জীবন আন্দোলিত করেছে, তার সুসংস্কৃত প্রকাশ ও সমস্যাগুলির সমাধানের ইঙ্গিত কবির লেখনীমুখে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের সংহতি ও স্বাধীনতা, বৃটিশ শাসনের স্বরূপ, অহিংসা নীতি, বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদ, অসহযোগ, ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পল্লী সংগঠন, জাতির আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক-কবি যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা করেছেন। আর একটি সমস্যা ও তার সমাধান বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। সেটি হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও বিরোধের বিরাট সমস্যা। এই বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ ও সফলতার সদুপায় নির্দেশ মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী। দ্বিতীয়ত, সমগ্র বিশ্ব ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের জন্যও তিনি তাঁর বিচিত্র চিন্তাধারার মধ্যে পাথেয় সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছেন। বিশ্বমানবতা, সভ্যতার গতি ও সংকট, জাতীয়তাবাদ, বর্ণবৈষম্য, উপনিবেশিকতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মানুষের অধিকার ও ধর্ম, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কত্ব প্রভৃতি বিশ্ব-সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তাধারা বিভ্রান্ত পৃথিবীকে পথ নির্দেশ করেছে। সত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা দেশের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করে বিশ্বসমাজে তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশব্রতী, অন্যদিকে তিনি দার্শনিক বিশ্বপ্রেমিক।

নানা ভাষা, নানা গোষ্ঠী, নানা ঐতিহ্য, নানা ভাবধারার দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু তথাপি ভারতের একটি মূলগত ঐক্য আছে। দেশের বিভিন্ন অংশের ও জাতীয় জীবনের সুর এবং সত্যকার স্বার্থ অভিন্ন। সকলেই সুখ-দুঃখের সমভাগী। বৈচিত্র্যের মধ্যে মহামিলনের সাধনাই ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনা। ভারতপথিক রামমোহন এই মহামিলনের প্রথম সত্যদ্রষ্টা। বিবেকানন্দও এই পথেরই পথিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির

এই রূপটি অপূর্ব মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা— নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।"

ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে যে ভারতবর্ষ গড়ে উঠছে, সেই ভারতবর্ষ সমস্ত ভারতীয়দের ভারতবর্ষ—তা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিশেষ কোন ধর্মীয় ভারতবর্ষ নয়। নানা ভাবধারার সংমিশ্রণ ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সৃষ্টি হয়েছে। ভারত-ইতিহাসের এই মূল সত্যটি রবীন্দ্রনাথের কাছে যেরূপ প্রতিভাত হয়েছে, তেমন আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর মতে ভারতের সাধনা সমন্বয়-ধর্মী। তাই ভারত-তীর্থ কবিতায় তিনি লিখলেন, নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা ভাবসমষ্টি ভারতবর্ষের সমাজদেহে মিলিত হয়ে একটি বিরাট নূতন জীবনধারা গড়ে তুলেছে। ভারতবর্ষ মানুষের মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র। এই নূতন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান করলেন। এই আহ্বান সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভেদবুদ্ধিপ্রণোদিত আহ্বান নয়। বিশ্বভ্রাতৃত্বের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তিনি ভারতবাসীকে জাগরিত হতে উপদেশ দিলেন। যে জাতীয়তা পরস্বাপহারী, যে জাত্যভিমান ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা পঙ্কিল, অথবা যে মতবাদের বলদৃপ্ত অহঙ্কার অন্য জাতির স্বাধীনতাহরণে পরাঙ্মুখ নয়, সে সবেরই ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার ও মানবপ্রেমের সুপ্রসর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের মানুষকে আহ্বান করলেন।

এই বিরাট পটভূমিকায় মনুষ্যত্বের পশ্চাৎপটে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন সমস্যা আলোচনা করেছেন। অর্থহীন ভাবালুতা কবির দৃষ্টিকে আবিল করে নি। এই সমস্যাটির বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, প্রখর ও বস্তুনিষ্ঠ। ১৯২২ সালে মহাত্মাজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন কবির চিত্তে নানা দ্বিধা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেই যুগপরিবর্তনের কালে ডঃ কালিদাস নাগকে লিখিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিজ মত লিপিবদ্ধ করেন। উভয় সমাজেরধর্মপ্রচার ও সামাজিক ব্যবহারের ধারা লক্ষ্য করে

কবি বললেন : "পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খ্রীষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়। অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্য তাদের ধর্মগ্রহণ ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই।···· হিন্দু ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তাদের বেড়া আরও কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমান ভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেই-খানেই হিন্দু পদে পদে নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।· এখানে (ভারতবর্ষে) হিন্দু মুসলমান দুই জাত একত্র হয়েছে, ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল,—এক পক্ষের যে দিকের দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকের দ্বার রুদ্ধ। হিন্দু ধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মত করেই গড়ে তুলেছিল—এর প্রকৃতি হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান।" রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীনভাবে উভয় সমাজের দোষত্রুটি উদ্ঘাটন করেছেন। কুণ্ঠাহীন অপ্রিয় সত্য বলার নিষ্ঠা ও সৎসাহসে উজ্জ্বল তাঁর এই মত।

বৃহৎ হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তিনি হিন্দু-মুস্‌লিম বিরোধের ভারতীয় সমস্যার জন্য হিন্দু সমাজকেই প্রধানত দায়ী করেছেন। এই ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের সমর্থন ও প্রশংসার অপেক্ষা রাখেন নি। ব্যক্তিগত দৈনন্দিন সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হিন্দু-সাধারণের পক্ষ থেকে মুসলমান দেশবাসীদের প্রতি যে অপমান বর্ষিত হয়েছে তার পরিমাণ কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণতা-কলুষিত এই হীন ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুর এই অশ্রদ্ধা এককালে হিন্দু-মুসলমান মিলনের একটি দুস্তর বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী কালে যেসব ঘটনাচক্রে রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান একযোগে কাজ করতে পারে নি তার একটা প্রধান কারণ হলো এই যে, হিন্দু সামাজিক ব্যবহারে মুসলমানদের কোনদিন শ্রদ্ধা ও সাম্যের আসনে স্থান দেয় নি। রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশে অল্পবয়সে ঠাকুর-পরিবারের জমিদারি পরিদর্শনের কাজে শিলাইদহ, সাহাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কালাতিপাত করেছেন। তখন তিনি হিন্দুদের

সামাজিক ব্যবহারে মুসলমানদের প্রতি মানবতা-বিরোধী বৈষম্যমূলক আচরণ মর্মবেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তরে' লিখছেন "অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তাপোষে গদিতে বসে দরবার করেন, সেখানে একধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে, আর জাজিমের উপরে বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল।" এই ধিক্কার রবীন্দ্রনাথ চিরদিন মনে রেখেছিলেন। ঘটনাটি ঘটবার ৩০ বৎসর পরে উপরোক্ত রচনা। আর তারও ত্রিশ বৎসর পরে তিনি প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে যে কথা বলেছিলেন তা' মৈত্রেয়ী দেবী সুনিপুণভাবে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নামক তাঁর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন: "আমাদের ওখানে তো মুসলমান প্রজা কম ছিল না। কিন্তু একথা বলতেই হবে তাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকে তা' পাই নি। আজকাল ঘোর কমিউন্যাল বিদ্বেষের দিনে সে সব কথা মনে পড়ে।... ফরাস পাতা রয়েছে উচ্চ জাতের হিন্দু আর ব্রাহ্মণের জন্য, আর মুসলমানরা ভদ্রলোক হলেও দাঁড়িয়ে থাকবে—নয় তো ফরাস তুলে বসবে। আমি বললুম সে কখনো হবে না, সবাই ফরাসে বসবে। ঘোর আপত্তি উঠলো, ব্রাহ্মণেরা তা'হলে বসবে না। আমি বল্লুম বেশ তা'হলে বসবে না। কিন্তু এ ব্যবস্থা চলবে না... আমাদের (হিন্দুদের) অপরাধও কম নয় তা' মনে রেখো। অক্ষম অপমান সহ্য করে যায় বাধ্য হয়ে। কিন্তু সে বেদনার ক্ষত মূল প্রসার করতে থাকে ভিতরে ভিতরে, তার পর হঠাৎ একদিন ধ্বস্ নামে, তখন হায় হায় করে লাভ নেই।" রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তরে' আর একটি বেদনাময় ও লজ্জা-জনক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১১) চলেছে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলনে তখন ফাটল ধরতে আরম্ভ করেছে, অথচ ঐক্যের প্রয়োজন সর্বাধিক। তখনকার একটি ঘটনা রবীন্দ্রনাথের মনে নিদারুণ ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। তিনি লিখছেন, "হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বে-আব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।... আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি, সেটা সম্পূর্ণ

প্রীতিকর নয় তা মানি, তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না—কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না·····হৃদয়ে লাগে।" রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, মুসলমানদের প্রতি হিন্দুরা যে সামাজিক অপমান বরাদ্দ করে দিয়েছিল, তার ফলেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের উদ্ভব। এই অন্যায়, অবিচার দুষ্ট ব্রণের ন্যায় সমাজদেহের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটি বিচারটা থাক—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি, তবে সেজন্য যেন লজ্জা স্বীকার করি।" ভারতবর্ষ প্রায় বারশত বছর পূর্বে মুসলমান ধর্মাবলম্বী বিদেশী জাতির সংস্পর্শে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে বিদেশাগত মুষ্টিমেয় আরব, আফগান, মোগল প্রভৃতি জাতির মানুষ, ভারতবর্ষের সমাজদেহে লীন হয়েছে। আজ তাঁদের বিশিষ্ট সত্তার চিহ্ন মাত্র নাই কিন্তু মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়েছে। যাঁরা ইসলামের ধর্মীয় পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন তাঁরা সকলেই বা তাঁদের পূর্বপুরুষগণ এক কালে হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ধর্মীয় বিভিন্নতা ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ-রেখা টানা যায় না। নৃতত্ত্ব, ভাষা ও ইতিহাস সংস্কৃতির দিক থেকে আমরা হিন্দু-মুসলমান এক। ১৯৪৮ সালে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর ডঃ শহিদুল্লাহ্ ঢাকার পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন: "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিম্বা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো'টি নেই।" নজরুল তাই লিখলেন, "'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন, কাণ্ডারী। বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।" তথাপি ধর্মের কুসংস্কার বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং অমানবিক হানাহানি জাতীয় জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ বার বার মানবতাবিধ্বংসী দাঙ্গার রূপ নিয়েছে।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই দারুণ অসাফল্য রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছে। এই মর্মন্তুদ বিফলতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমস্ত দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের

সূত্রপাত হইল।" তাঁর মতে সর্বাগ্রে হৃদয়ের ঐক্য প্রয়োজন; যেখানে এই ঐক্যের অভাব আছে সেখানে কেবলমাত্র স্বার্থের সংঘাত হওয়াই স্বাভাবিক। স্বদেশীযুগে একবার একটা সভায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের রাজনৈতিক সুবিধাগুলি জনৈক বক্তা মুসলমান শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলছিলেন। তার মর্মটা হলো এই যে হিন্দু-মুসলমান এক যোগে, একই রাজনৈতিক প্রস্তাব করলে ইংরেজকে বেকায়দায় ফেলে দাবি আদায় করার সুযোগ হয়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বললেন যে, কেবলমাত্র বাহ্য একতার মূল্য খুব বেশি নয়। "দুই ভাই একত্রে থাকিলে বিষয়-কর্ম ভালো চলে, কিন্তু সেইটাই দুই ভাই এক হইবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। আসল কথা আমরা এক দেশে এক সুখ-দুঃখের মধ্যে বাস করি। আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম। আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান, আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশতঃ যদি শুধু সুবিধা নহে, অসুবিধাও একত্র ভোগ করিতে প্রস্তুত না হই, তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক।" [কালান্তর]

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ১৯০৫ সাল থেকেই ধীরে ধীরে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। স্বদেশী যুগে (১৯০৫-১৯১১) বার বার হিন্দু-মুসলমানের একতা স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবার তা' বিফল হয়েছে। তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: "...আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না।" মুসলমানের মনে এই সন্দেহটি সদা-জাগ্রত ছিল, তাই সে হিন্দুর ডাকে হৃদয় দিয়ে সাড়া দিতে পারে নাই। দু'পক্ষই ভেবেছে কি করে নিজ পক্ষের লাভের অঙ্ক বেশি হবে। বলা বাহুল্য বিদেশী সরকার পূর্ণমাত্রায় এই অবস্থার সুযোগ নিয়েছে। আমরা এজন্য ইংরেজকে দোষী সাব্যস্ত করেছি কিন্তু পাপ যে আমাদের মনে বাসা বেঁধেছে সে কথা স্বীকার করতে রাজি হই নি।

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য সক্রিয়ভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই সময়ে কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও নাটকের ভিতর দিয়ে তিনি দেশকে নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। স্বদেশী যুগে যে সকল প্রধান সমস্যা কবিকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল, তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনের প্রথম স্তরেই হিন্দু

ও মুসলমানের বিরোধ তার দুই কণা উত্তপ্ত করেছিল। একদিকে হিন্দুনেতৃবর্গ বঙ্গ-ভঙ্গকে জাতীয়তা বিরোধী ও বাঙালী স্বার্থের প্রতিকূল বলে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল রসুল প্রমুখ ব্যক্তি নেতৃত্বগ্রহণ করলেন। অন্যদিকে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্‌, আবদুল করিম গজনভি প্রমুখ মুসলমান নেতৃবর্গ বঙ্গচ্ছেদ মুসলিম সমাজের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থানুগ বলে তাকে স্বাগত জানালেন। অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের বিষবাষ্প বাংলার ও বাঙালীর জীবন বিষাক্ত করে তুললো। সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি দেশকে মাতারূপে কল্পনা করে মাতৃপূজার প্রবর্তন করলেন। অনেকস্থলে দেশমাতৃকার পূজা আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। নরমপন্থী ও গরমপন্থী উভয় দলই আন্দোলনের এই পন্থার সক্রিয় সমর্থক হলেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের এক বৃহৎ অংশ ও তার নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় কারণে এই পৌত্তলিকতাগন্ধী স্বদেশীয়ানা থেকে বিরত থাকলেন। হিন্দু মুসলমানের পরস্পর অবিশ্বাস ও দূরত্ব বর্ধিত হলো। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলো। মুসলমানের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষার দাবি স্পষ্ট ও সোচ্চার হয়ে উঠলো। কুমিল্লা, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে বিলাতি পণ্য বর্জন নীতি ও হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থের সংঘাত মারাত্মক সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে প্রকাশ পেল।

তৎকালীন বাংলায় তিন শ্রেণীর রাজনীতির উদ্ভব হয়েছিল। প্রথমত, নরমপন্থী যাদের 'মুকুটহীন রাজা' ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয়ত, গরমপন্থীদের নেতা ছিলেন অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র, তৃতীয়ত সন্ত্রাসবাদী দল যাঁরা 'অনুশীলন' অথবা 'যুগান্তরের' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই তিন শ্রেণীর কারুরই সঙ্গে কবির মনের মিল হয় নি। এই তিন দলের কোন দলেরই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে কোন গভীর চিন্তা বা পরিকল্পনা ছিল না। বিলাতি পণ্য বর্জন নীতি যেভাবে জোর-জবরদস্তি করে প্রচলিত করার চেষ্টা চলছিল, তা রবীন্দ্রনাথের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে নি। তাই তিনি বিলাতি পণ্য বর্জন নীতি ঘোষণার তিন সপ্তাহের মধ্যে, ১৯০৫ সালে ৬ই অগাস্ট কলকাতা টাউন হলে আপন গঠনমূলক পরিকল্পনা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় জীবনের সমান অংশীদার। তাই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা, সহধর্মিতা ও সহমর্মিতা গড়ে তোলাই হিন্দু-মুসলমান মিলনের একমাত্র পথ। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করলেন যে, হিন্দু-

মুসলমান অধ্যুষিত বাংলায় স্বদেশী সমাজ গঠন করতে হবে। "দেশে কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার (Council of Action) মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্ততঃ একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব—তাঁহাদিগকে কর দান করিব, তাঁহাদের আদেশ পালন করিব, নির্বিচারে তাঁহাদের আদেশ মানিয়া চলিব—তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব"। দেশের সমস্যা হিন্দুরও সমস্যা মুসলমানেরও সমস্যা। উভয় সম্প্রদায় সমস্যা সমাধানের অনুকূল কর্মপন্থার ভিতর দিয়া এক হইবে। নান্যঃ পন্থা। কবি ঠাকুর-পরিবারের জমিদারিভুক্ত বিরাহিম পরগণায় গ্রামোদ্যোগের একটি পরীক্ষা করেছিলেন। ঐ পরগণাটি পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে, প্রত্যেক মণ্ডলে একজন করে অধ্যক্ষ বসিয়ে দেন। এই অধ্যক্ষেরা পল্লী সংগঠনে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুদিন পর, ১৯১৫ সালে এই পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে কবি 'স্মৃতি' পুস্তকে লিখছেন: "আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে—হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম হিন্দু সমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে যাতে ক'রে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealise ক'রে কোন আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছা হয় না।"

১৯১১ সালে মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি সরব হয়ে উঠেছে, তার দুই বৎসর পূর্বে মুসলমানদের জন্য বিধানসভা প্রভৃতিতে পৃথক আসন থেকে, পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ১৯০৯ সালের পরিষদ আইনে বিধিবদ্ধ হয়েছে। চাকুরি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে মুসলমান আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়। স্বতন্ত্র মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন ক্রমে শক্তিসঞ্চার করছে। জাতীয়তার তর্ক তুলে অনেকে বললেন যে, স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের জাতীয়তাবিরোধী, এর দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের মিলন সুদূরপরাহত হবে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ভিন্ন মত গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন হিন্দুদের সঙ্গে নানা মিল সত্ত্বেও মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটিয়ে তুললেই ভারতবর্ষের জাতীয়তা সমৃদ্ধ হবে। বহুর মধ্যে একের এবং একের মধ্যে বহুর সাধনাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। তিনি 'সঞ্চয়' (১৯১৬) নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে লিখলেন: "সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য... বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান",

"মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা"। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী এই পথেই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের সন্ধান করেছিলেন। এই বিষয়ে প্রভাত মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তা' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "মহাত্মাজী জানিতেন ইহারাও (মুসলমান জনসাধারণ) ভারতের বাসিন্দা—হউক না কেন অন্য ধর্মাবলম্বী—তাহাদের সর্ব্ববিষয়ে আত্মসচেতন করিতে পারিলে, ভারতই সমগ্রভাবে শক্তিশালী হইবে। মুসলমানের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া, ধার্ম্মিকতার সর্ব্ব অবয়ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহারা মহত্ব লাভ করুক—ইহাই ছিল মহাত্মাজীর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা" (রবীন্দ্রজীবনী—তৃতীয় খণ্ড)। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় তিনি যখন শান্তিনিকেতনে যান, তখন একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন: "We shall meet them at their best". গান্ধীজী মনে করতেন যে, ইসলাম ধর্ম মুসলমান সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই ধর্মকে বাদ দিয়ে মুসলমান কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না। এই জন্যই তিনি তদানীন্তন মুসলিম সমাজের খিলাফৎ সংক্রান্ত দাবিকে স্বাগত জানাতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি।

এই ঘটনার চার বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পরের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় এবং তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়।" মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কবি বললেন, "হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয়, তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।" অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুর তুলনায় মুসলমান ঐতিহাসিক কারণে অনগ্রসর। "এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের (হিন্দুদের) আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদমান শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর"। "গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোন বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্ন মনে কামনা করি।" রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্চয়ে' আরও লিখলেন. "নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না—জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা আকারে প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ।" মুসলমান সমাজের এই বিকাশের দাবি ও তদনুযায়ী রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

বর্ধিত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যে নীতি ও জাতীয়তার দিক থেকে অশেষ মূল্যবান, সেই সত্যটুকু অল্প সময়ের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংস্থাই বোধ করি কিছু পরিমাণে বুঝেছিলেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তিতে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পন্ন হয়। ঐ চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধান সভায় পৃথক সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমান সদস্যের নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমানের ঐই একতায় ব্রিটিশ সরকার বিশেষ বিব্রত বোধ করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এই চুক্তি ও স্বায়ত্ত শাসন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ৩

১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে 'সবুজপত্রে' বৈশাখ থেকে ফাল্গুনের সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়। তার কয়েক বছর পূর্বে কোরবানিকে উপলক্ষ করে কলকাতায় একটি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে যায়। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতের অন্যত্রও মুসলমান সমাজের ঐ ধর্মীয় অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেধেছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়টিকে অনবদ্য ভাবে তাঁর উপন্যাসের ধারার সঙ্গে গ্রথিত করেন। উপন্যাসের ঘটনাচক্রে কোরবানির প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বেধেছে। উপন্যাসের নায়ক জমিদার নিখিলেশ প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। উদারপন্থী নিখিলেশ অতি সহজ ভাষায়, সহজ ভাবে বললেন, "নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি। পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কি ? মুসলমানকে নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে"। ভারতীয় হিন্দু যদি এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতো, তা হলে দেশবাসী হিন্দু-মুসলমান অনেক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পেতো।

১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ যখন হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট (Bengal Pact) সম্পন্ন করলেন তখন দেশের সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ১৯১৬ সালে হিন্দু নেতৃবর্গ যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কংগ্রেস-লীগ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গি আর তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই বেঙ্গল প্যাক্ট সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ঐ চুক্তি ১৯২৩ সালের কোকনদ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনে গৃহীত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রবৃত্তি তখন আর কারও নেই।

১৯২৮ সালে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্বন্ধে মতিলাল নেহেরু কমিটির রিপোর্ট বিষয়ে ফয়সালা করার জন্য কলকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলনের অধিবেশন হলো। জনাব মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বর্তমান লেখক সম্মেলনের সদস্য হিসাবে লক্ষ্য করেন যে, প্রধানত হিন্দু অদূরদর্শিতা ও অনমনীয়তার ফলে হিন্দু-মুসলিম মিলন-ভিত্তিক কোন রাজনৈতিক রফা সেখানে সম্ভব হলো না। এর পর থেকে দুই সম্প্রদায় দুই পথে চললেন। মিলনের সম্ভাবনা দূরে অপসারিত হলো। এই সকল ঘটনাবলী রবীন্দ্রনাথকে অতিমাত্রায় ব্যথিত করে তোলে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ইংরেজ শাসকবর্গ প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করার জন্য একশ্রেণীর মুসলমানদের উত্তেজিত করে তোলে। দারুণ অত্যাচার চলে। এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথের মানসপ্রকৃতিকে অতিমাত্রায় উদ্বেলিত করে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন : "আমার বেদনাবহ নাড়ী এই রকম কোন সংবাদের নাড়া খেয়ে যখন ঝনঝন করে ওঠে, তখন সে যেন কিছুতেই থামতে চায় না।"

ত্রিশ দশকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দারুণ আকার ধারণ করে। পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণীর মুসলমানেরা এই সময়ে দাবি করতে থাকেন যে, তাঁরা বাঙ্গালী হিন্দু থেকে একটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। তাঁদের অভিযোগ এই ছিল যে, বাঙ্গালী হিন্দুদের ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা 'হিন্দু-গন্ধী' ও সংস্কৃত-ঘেঁষা। তাই ঐ শ্রেণীর মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত ও সাধারণ বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের বোধের পক্ষে প্রতিকূল আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ আমদানি করতে শুরু করলেন। বাংলা ভাষাকে এই সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ব্যথিত করে। তাই তিনি তাঁর মতামত পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আগ্রহী হলেন। তিনি প্রথমে জনাব এম. এ. আজাদকে ১৯৩৩ সালে এবং অধ্যাপক আলতাফ চৌধুরীকে তার পরবৎসর পর পর দুইখানি চিঠি লেখেন। প্রথম পত্রে তিনি লিখেছিলেন : "সর্বপ্রথমে বলে রাখি আমার স্বভাবে ও ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব বলে মনে করে থাকি· । বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার ফারসী আরবী শব্দ চলে গেছে, তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু যে সব ফারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত, অথবা হয়তো কোন এক শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে

জবরদস্তি বলতেই হবে।" জনাব চৌধুরীর নিকটে কবি লিখলেন : "আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করার যে চেষ্টা চলছে তার মত বর্বরতা আর হ'তে পারে না। এ যেন ভাই-এর উপর রাগ করে বাস্তুঘরে আগুন লাগানো।" বাংলা দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনের বিবর্তনের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রবাণীর পূর্ণ সমর্থন দেখতে পাই।

১৯৩৫ সালে জনাব আবদুল ওদুদ শান্তি নিকেতনে বক্তৃতা দিতে যান। তার কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িক বর্বরতার উন্মত্ত তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। ওদুদ সাহেবকে কবি দুই বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বর্ণসেতু বলে অভিনন্দিত করেন। এই সময়ে অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান "বক্তৃতা মঞ্চে নয় কাজের ভিতর দিয়ে" মিলিত হবে। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও তিনি এই পথই নির্দেশ করেছিলেন।

১৯৩৯ সালে ফজলুল হক বাংলার প্রধান মন্ত্রী। তিনি শিক্ষা দপ্তরেরও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান চাকুরিজীবী। ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের স্থান নেই। তাই চাকুরির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বেধে গেল। এই বিরোধ বরাবরই ছিল। তবে তা বেশ দানা বেঁধে উঠলো। এই ব্যাপার নিয়ে হিন্দু-নেতৃবর্গ ভারতশাসন দরবারে নালিশ করলেন। কবি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ নালিশী দরখাস্তে সই করলেন। এই বিষয়ে ১৯৩৯ সালের ২০শে জুন তারিখে অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখলেন : "হিন্দু-মুসলমানের চাকরির হার বাটোয়ারা নিয়ে অবিচার হয়েছে। এই নিয়ে হিন্দুরা ভারতশাসন দরবারে নালিশ জানিয়েছেন। সেই পত্রে নাম স্বাক্ষর করতে আমার দ্বিধা ছিল।·· অনিচ্ছাসত্ত্বেও নালিশের পত্রে আমি সই দিয়েছি"। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী', ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৮)। এই বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তা লক্ষণীয়, "বলা বাহুল্য এ শ্রেণীর কাজ কবিকে বহুবার করিতে হইয়াছে, বিশেষতঃ জীবনের শেষের দিকে পাঁচজনের অনুরোধ উপরোধ তিনি এড়াইতে পারিতেন না। অনেক সময় সুখের থেকে সোয়াস্তি ভাল মনে করিয়া পারিপার্শ্বিকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহু জিনিসে সহি দিতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে, বিশ্বভারতীর অপ্রিয় কার্যকলাপে, পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে এই ধরনের অনিচ্ছাসত্ত্বের সহি দিয়া আপাত, উৎপাত হইতে সোয়াস্তি পাইতেন"। এই

সময়ে কবির শরীর দুর্বল, মনও সাম্প্রদায়িক বাতাবরণে অবসন্ন। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে দরখাস্তকারিগণ রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ১৯১৬ সালে তিনি যে মত ব্যক্ত করেছিলেন সেটিই ছিল তাঁর অন্তরের কথা। পুনরুক্তি হলেও তা এখানে পুনরায় উল্লেখ করা আবশ্যক। 'সঞ্চয়ের' একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান দেশবাসিগণ হিন্দুর তুলনায় অনগ্রসর। "এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদমান শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর"।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান দেখে যেতে পারেন নি। বস্তুত ঐ সমস্যা দ্বারা আমাদের জীবন এখনও কন্টকিত। তাঁর মতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কখনও উভয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য লোপের মধ্য দিয়ে আসতে পারে না। পার্থক্য স্বীকার করে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ 'পরিচয়' (১৯১৬) লিখেছেন: "আসল কথা পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড়ো দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না। চাপা দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎপাতক পদার্থ, তাহা কোন না কোন সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। যাহারা বস্তুতই পৃথক তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলন রক্ষার সদুপায।" রবীন্দ্রনাথের মত অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সুবিচার এই সমস্যা সমাধানের পথ। কিন্তু সর্বোপরি প্রয়োজন মনের পরিবর্তন। অধ্যাপক কালিদাস নাগকে লিখিত একখানি পত্রে ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোন রকমের স্বাধীনতাই পাব না। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসবো, যদি না আসি তবে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" গান্ধীজী আপন জীবন বিসর্জন দিয়ে এই বাণীই প্রচার করেছেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের সংকট কালে যেন আমরা তা বিস্মৃত না হই।

মিউনিক প্যাক্টঃ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

গোপাল মজুমদার

১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ চেক-সুদেতেন সমস্যাকে উপলক্ষ করে ইউরোপ তথা সারা বিশ্বের রাজনৈতিক সঙ্কট অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে ওঠে। চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চলের (পুরাতন বোহেমিয়া) জার্মান জনগণ জার্মানীর সঙ্গে মিলনের জন্য বেশ কিছুকাল ধরেই দাবী করে চলেছিল (যদিও বোহেমিয়া কোনকালেই জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না)। আসলে হিটলার ও নাৎসীরাই তলে তলে এই দাবীর জন্য সুদেতেন জার্মানদের প্রবল উস্কানি ও প্ররোচনা দিচ্ছিল। "All those who are German blood, whether they live under Danish, Polish, Czech, Italian or French suzerainty are to be united in one German Reich." —বেশ কিছুকাল থেকেই হিটলার প্রকাশ্যেই এই ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানিয়ে চলেছিলেন।

স্মরণ রাখা দরকার, ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসেই নাৎসীরা অষ্ট্রিয়া দখল করে তা জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। স্বভাবতই এর ফলে চেক নেতারা খুবই আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। মধ্য ইউরোপে তখন সে-ই একমাত্র গণতন্ত্রী দেশ। অষ্ট্রিয়ার পতনের পর এখন তার তিন দিকে নাৎসী-জার্মানী ঘিরে রইল।

১৫ই সেপ্টেম্বর সুদেতেনের জার্মান ফ্যাসিস্ট নেতা হের হেনলাইন জার্মানীর সঙ্গে সুদেতেনের মিলনের দাবী ঘোষণা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুদেতেনে ব্যাপক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু হয়। চেক সরকার এই বিক্ষোভ-আন্দোলনকে দমন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। উপায়ান্তর না দেখে হিটলার প্রকাশ্যেই সুদেতেনের জার্মান অন্তর্ভুক্তির দাবী জানিয়ে চেক সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল রণহুঙ্কার দিতে শুরু করলেন। নুরেমবুর্গে হিটলারের দু'ঘণ্টা ব্যাপী প্রচণ্ড রণহুঙ্কার ও তীব্র আক্রমণাত্মক বক্তৃতায় চেম্বারলেন খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিটলারকে ঠাণ্ডা করবার জন্য তিনি জার্মানীতে ছুটলেন। হিটলারের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার শর্তাদি নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে তিনি লণ্ডনে ফিরে এলেন। লণ্ডনে ফেরার পরই তিনি

করাসীদের সঙ্গে গোপন সলাপরামর্শ করে জার্মানদের কয়েকটি শর্ত মেনে নেবার জন্য চেক সরকারের উপর প্রবল চাপ দিতে লাগলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মিলিত প্রস্তাবটির মর্মার্থ ছিল এই যে, যেসব অঞ্চলের জনগণের শতকরা ৭৫ জন সুদেতেন জার্মান সেইসব অঞ্চল জার্মানীকে দিতে হবে। আর যেসব অঞ্চলে সুদেতেন জার্মানদের সংখ্যা এর থেকে কম, সেসব অঞ্চলে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে হবে। তা ছাড়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে তার যে সামরিক মৈত্রী ও চুক্তি ছিল, তাওঁ বাতিল করে দিতে হবে।

ইংরেজ ও করাসীরা যে তাদের সঙ্গে এতখানি নির্লজ্জ ও জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে, চেক সরকার তা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই জঘন্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানালেন বটে, তবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ-করাসীদের প্রবল চাপে বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করে প্রস্তাব মেনে নিলেন (২১শে সেপ্টেম্বর)।

সঙ্গে সঙ্গে তারে-বেতারে পত্র-পত্রিকায় পৃথিবীর সর্বত্র এই সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়ে গেল। এই সংবাদে ভারতবর্ষেও প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ দেশের জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাগুলি ইঙ্গ-করাসীদের এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা শুরু করেন। পরদিন—২২শে সেপ্টেম্বর 'হিটলারের জয়' এই শিরোনামায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তার প্রধান সম্পাদকীয়তে লিখলেন,

"উভয় গবর্নমেন্টই (ইঙ্গ-করাসী) একমত হইয়া স্থির করিলেন, বর্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ অনুমোদনই বুদ্ধিমানের কাজ। চেক গণতন্ত্রকে নাৎসী জার্মানীর কবলে ঠেলিয়া দিবার এই অপ্রত্যাশিত দৌর্বল্য প্রদর্শন করিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটিশ গণতন্ত্র তথাকথিত গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। মধ্য ইউরোপে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের সম্ভাবনা লুপ্ত হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকতায় বিস্মিত ও ভয়ার্ত ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি অতি শীঘ্রই হিটলারের পদানত হইয়া পড়িবে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইউরোপের নেতৃত্ব হইতে নিজেদের বঞ্চিত করা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। ফ্রান্স যে তাহার প্রতিশ্রুতি ও সন্ধিপত্র ভঙ্গ করিয়া এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে ইহা চেক গবর্নমেন্ট কল্পনাও করিতে পারেন নাই।···· আশাভঙ্গজনিত হতাশায় আজ চেক গবর্নমেন্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও করাসী ও বৃটেনের 'কালনেমির লঙ্কাভাগের'

প্রভাবে সমর্থ হইয়াছেন। জার্মানী যদি বাহুবলে সুদেতেন অঞ্চল দখল করিতে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া যাইত—এই ধারণা যাহারা পোষণ করিতেন তাঁহাদের মোহভঙ্গ হইয়াছে। আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের প্রতি গণতান্ত্রিক বিশ্বাসঘাতকতার নজীর সম্মুখে থাকিতে হিটলার কেনই বা অনর্থক বাহুবল প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইবেন? তিনি জানিতেন সঙ্কটের দিনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চেকোস্লোভাকিয়াকে পরিত্যাগ করিবে এবং আন্তর্জাতিক সঙ্কটমোচনের জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেন্টই জার্মানীকে তুষ্ট করিবার জন্য ফ্রান্সের উপর চাপ দিয়া সুদেতেন ছেদন কার্যে সহায়তা করিবেন। কার্যত তাহাই ঘটিল।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে তিনি সংবাদপত্র যোগে চেক-সুদেতেন সমস্যা ও বিশ্ব-সংকটের গতিপ্রকৃতিটি অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলেন। এণ্ড্রুজও বাঙ্গালোর থেকে ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের এই যুদ্ধোন্মাদনা ও আগ্রাসনের কাছে ইঙ্গ-ফরাসীদের ক্রমাগত নতিস্বীকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে কবিকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন (১৭ই সেপ্টেম্বর '৩৮)। এণ্ড্রুজের এই পত্রের মর্মার্থ ছিল:

প্রিয়তম গুরুদেব,

আজকের খবরটা এতই আশঙ্কাজনক যে, মুহূর্তকাল মধ্যে আমার সমগ্র চিন্তাধারা আপনার পানে ছুটল। এই সংকটকালে সমস্যার চেহারাটা যেন চরম বিধ্বংসী বলে মনে হল।

জানি, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বৃটিশ শাসনের পাশাপাশি অনেক কলুষ সঞ্চিত হয়েছে। এমন কি বর্তমানের হিংস্র কর্মকাণ্ডকেও কোন হৃদয়বান মানবপ্রেমিক যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিতে পারবেন না। নিছক শান্তিরক্ষার কারণেই মিঃ চেম্বারলেন পরিবর্তন মেনে নিলেন, যখন তিনি মিঃ ইডেনকে বর্জন করলেন,—আমার তা মনে হয়েছে নিতান্তই আত্মসমর্পণ ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। পরন্তু সেই আত্মসমর্পণের ঢেউ আবিসিনিয়া, চীন, স্পেন সম্পর্কেও প্রবাহমান, সম্ভবত অন্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা দেখতে পাব। বৃটিশ সাম্রাজ্য তার কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার অনধিকৃত বিপুল এলাকা নিয়ে আছে, তার দক্ষিণ আফ্রিকায় ও কেনিয়াতে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ক্ষীণতর প্রতিরোধ প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে,—এ সবটা মিলে সে (সাম্রাজ্যবাদ) এমন একটা ধারার প্রবর্তন করেছে যাতে সত্য

ও সুবিচারের চেয়ে অর্থাহরণকেই সে প্রকৃষ্টতম লক্ষ্য হিসাবে প্রাধান্য দিয়েছে। ভারতে বৃটিশ শাসন সম্পর্কেও বহুলাংশেই ঐ একই কথা সত্য, অবিশ্যি যদি আমরা মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সততা আছে বলে কিছু মানি। আমরা একই সঙ্গে ঈশ্বর ও কুবেরকে ভজনা করছি। গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের জনসাধারণের নিজেদের পক্ষে কোনটা উচিত ও যুক্তিযুক্ত হবে সে প্রশ্ন বিবেচিত হওয়ার চাইতে গোটা আলোচনাটাই ব্যবসায়িক ও আর্থিক প্রশ্নেই বারবার ঘুরে ফিরে এল। আমাদের এই রাষ্ট্রীবস্থার এই সব মন্দ দিকগুলোর জন্যে আমি যত গভীরভাবে বিচলিত হই, এমন আর কেউ না, এ তো আপনি ভালো করেই জানেন। এবং আজ সেটা যত গভীবভাবে আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে ইতিপূর্বে কখনো তা করে নি,—কেননা খোদ ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মধ্যেই আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি। অবস্থার আর এক দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভাড়াটে মনোবৃত্তি নিয়ে ফরাসীর চেহারাটাও বৃটিশের থেকে আলাদা কিছু না। আর এই দিকটার উপরই আমি গুরুত্ব আরোপ করছি। আমার মনে হয়, ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে এই সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের সংযোগের দিকটা জওহরলাল নেহরু খুব কঠোরভাবে নিন্দা করেন নি।

এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় বলতে হবে যে, খাটি সামরিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সুদেতেন জার্মানদের চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, উদ্দেশ্য, যাতে করে একটা প্রতিরোধযোগ্য সীমান্ত গড়ে তোলা যায়। সামরিক উপদেষ্টা লয়েড জর্জ ও ক্লিমেন্সোর পরামর্শ সত্ত্বেও খাটি ক্রিশ্চিয়ান এবং প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট মাসারিক সীমান্তকে দক্ষিণের থেকে আরও দূরে গড়ে তোলবার জন্যে চাপ দিয়েছিলেন, —অনিচ্ছুক জার্মানদের অন্তর্ভুক্তি হলে ভবিষ্যতে বিপদ ঘনিয়ে আসবে বলে তিনি তাঁর দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যকে আমল দেওয়া হয় নি, এটা একটা ঘটনা, এবং এই ঘটনাই চেকদের পরিস্থিতিটা দুর্বল করে তুলেছে।

তথাপি অন্য পক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে পাশব শক্তির উপর চরম নির্ভরতা জার্মানী, ইতালী ও জাপানের উদগ্র শক্তিমত্ততা—এ এমন একটা কিছু ক্ষতিকারক যে, একে একের পর এক শূন্যগর্ভ বিজয় ঘটতে দেওয়া গণতন্ত্রী শক্তির পক্ষে কাপুরুষোচিত দৌর্বল্যের প্রকাশ বলেই মনে হয়। মনে হয়, নিজেদের অধিকৃত উপনিবেশসমূহ রক্ষা করার ইচ্ছার জন্যই এটা ঘটতে দেওয়া হচ্ছে। যে সাম্রাজ্যবাদ অর্থগৃধ্নুতাকে সৃষ্টি করে এ তারই এক জঘন্যতম

দিক। আর এ এক আকাঙ্খাও বটে—যদি পারা যায় ঘাঁটি গেড়ে টাকার থলির উপর চেপে বসে থাকতে, যদি কোনক্রমে তা রক্ষা করা যায়। আমি জানি অন্যান্য মহৎ উদ্দেশ্য এর আছে কিন্তু ধনতন্ত্রের এই স্থূল স্বার্থপরতার ধারাটা আমাকে অন্য সব কিছু থেকে সব চেয়ে বেশী আঘাত করে। চেকোশ্লোভাকিয়ার থেকেও আবিসিনিয়ার ঘটনায় পক্ষে ঢের বেশী ন্যায়পরতা ছিল;—যার এক পক্ষে ছিল ন্যায়দণ্ড আর এক পক্ষে শুধু দুর্বলতা। তথাপি একের পর এক ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া সত্বেও রফানিষ্পত্তি করে তা হারাতে হল। তাই অবাক বিস্ময়ে ভাবছি, এই যে হিটলার-মুসোলিনী একজোটে বিশ্বের কাছে দুশমনী করে যাচ্ছে এখনও কি এসব থামিয়ে দেবার—এমন কি তুচ্ছ কারণকে অবলম্বন করে থামিয়ে দেবার সময় আসে নি? কেননা আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, ইহুদী-নিপীড়ন এই ধারাতেই সংগঠিত হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন কিছুতেই হয় নি।—দুশমনকে সেখানে তার ভয়ঙ্কর বেশে দেখা যাচ্ছে।

যখন সমগ্র ছবিটাই অন্ধকারময় বলে বোধ হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি আপনার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অংশভাগী হতে চাই। ব্যাপারটা একেবারে চরমতম দুর্গতির দিকে যাবে যদি অবিরত আপোস-রফা করেও গণভোটের (প্লেবিসাইট্) দাবী মেনে নেওয়া হয়। কেননা জার্মানীর এই দাবীকে অবলীলাক্রমে হিটলারের পক্ষে শতকরা ৯৯টি ভোটে পরিণত করবে। অবস্থা দেখে অনুমান করছি যে, প্যারী সেই চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার চেয়ে বরং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

অগৌণে যদি এসব সমস্যার সম্মুখীন না-হওয়া যায়, আর যদি এইসব সমর্পণের ফলে যুদ্ধ এসেই পড়ে তবে কি একটা আরো ভয়াবহ পরিণাম দেখা দেবে না? সমগ্র ইউরোপ যখন বারুদের আগারে পরিণত হয়ে আছে,—সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গসংযোগে উড়িয়ে দেবার অপেক্ষায়, তখন নুরেমবুর্গে হিটলারের দু'ঘন্টাব্যাপী ঐ আক্রমণাত্মক বক্তৃতা দুষ্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছাড়া নিশ্চয়ই আর কিছুই বলা যায় না।

টেলিগ্রাম স্রোতের মত আপনার কাছে পৌঁছচ্ছে,—আমি জানি, কী পরিমাণ উদ্বেগ-যন্ত্রণা নিয়ে আপনি তা প্রতিদিন অনুসরণ করে যাচ্ছেন। *আপনার কাছে মানুষ-মানুষে কোন প্রভেদ নেই, প্রভেদ যা কিছু তা ন্যায়ে-অন্যায়ে, সুবিচারে-অবিচারে, নিষ্ঠুরতা ও মহানুভবতায়।*

এখন স্মরণ হচ্ছে, সেই রামগড়ের দিনগুলির কথা—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, যুদ্ধ বাধবার পূর্ব মুহূর্তে,—কত উদ্বিগ্নতার মধ্যে দিয়ে আপনি কাটাচ্ছিলেন। সেই আগস্টের দিনগুলিতে যুদ্ধ ঘোষণার ভয়ঙ্কর মুহূর্তে কত ব্যাপক বিভীষিকার ঘোর কৃষ্ণচ্ছায়া আপনার মনে উদয় হয়েছিল। আপনি অনুভব করেছিলেন, মানবতা বুঝি গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেল।

আর একটি আসন্ন ব্যাপক আকারের ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কায় আপনার মনকে আবার পীড়িত করে তুলেছে। এবং আমি আশা করি আপনি আপনার নিজস্ব কর্মজগতের মধ্যে প্রবেশ করে এর থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছেন, যে কর্মজগতে শুধু বর্তমানের বিভীষিকা থেকে বহুদূরে অন্য জগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে, বস্তুত সেই জগতে কেবলমাত্র কবি ও শিল্পীরাই বিচরণ করতে পারে।

গভীরতম ভালোবাসা জানিয়ে

বাঙ্গালোর — আপনার

১৭ই সেপ্টেম্বর — চার্লি*

১৯৩৮

জীবনের শেষ মুহূর্তে ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের এই দানবিক উন্মত্ততায় কবি যে কী ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ ও মর্মান্তিক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, বলার নয়। চোখের সামনে আবিসিনিয়া, স্পেন, চীন, অষ্ট্রিয়া—একের পর একটা দেশ ফ্যাসিস্ত ও নাৎসীরা গ্রাস করে চলেছে, ইঙ্গ-ফরাসী প্রমুখ 'লীগ্-অব-নেশনস্'-এর পাণ্ডারা তাকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকরী কোন ব্যবস্থাই নিলে না, এ-চিন্তা ক্রমেই তাঁকে অশান্ত ও অস্থির করে তোলে। মানবিকতা ও উনিশ শতকে যে বিবেক, মনীষা ও বিশ্বাসের ভিত্তিভূমির উপর মানব সভ্যতা দাঁড়িয়েছিল, আস্তে আস্তে তা যেন নীচের গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, কবি মানুষের এই বিবেকবুদ্ধি ও সভ্যতার এই তলিয়ে-যাওয়ার নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন নি।

ভারতবর্ষে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনে তিনি পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্তদের পররাজ্যলালসা ও প্রতিটি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ ও ভর্ৎসনা করেছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্র্যাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত-

* দ্রঃ *Visva-Bharati News*, October, 1938, pp. 28-29.

অভ্যুত্থানের অনতিকাল পরেই ভারতবর্ষে যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘ-এর (League Against Fascism and War) শাখা কমিটি গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেদিন কবি আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের আসুরিক বর্বরতা ও আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য সমস্ত বিবেকী মানুষকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন,

"The devastating tide of International Fascism must be checked. In Spain, this inhuman recrudescence of obscurantism, of racial prejudice, of rapine and glorification of war must be given the final rebuff. Civilisation must be saved from its being swamped by barbarism." At this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscience of humanity."

এর অনতিকাল পরেই জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হলে কবি তাঁর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জাপ-ফ্যাসিবাদের অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বিনিপাত করলেন। এই সময়েই জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেস থেকে যে 'চীন সাহায্য তহবিল' এবং চীনে 'মেডিক্যাল মিশন' পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কবি তাতে মুক্ত হস্তে সাহায্য করবার আবেদন জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে আহ্বান জানান।* এই নিয়ে জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক পত্র বা মসীযুদ্ধ হয়। নোগুচি তাঁর ঐ পত্রে (২৩শে জুলাই, ১৯৩৮) 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' এই সেন্টিমেন্ট তুলে চীনে জাপ-আক্রমণের সাফাই গেয়েছিলেন। নোগুচির এই সীমাহীন ধৃষ্টতায় কবি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। চীনে জাপানের এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও পৈশাচিক তাণ্ডবলীলার পক্ষে নোগুচির এই নির্লজ্জ ওকালতির তীব্র সমালোচনা করে কবি তার জবাবে যে দীর্ঘ খোলা-চিঠি লেখেন (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮) তার অংশ-বিশেষ ছিল এই :

"মানবতার বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সমাজের নৈতিক কাঠামোয় বিশ্বাস করিয়াছি। সুতরাং আপনি যখন 'এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একটি নূতন জগৎ প্রতিষ্ঠার জন্য ভীষণ হইলেও অনিবার্য উপায়ের' কথা, যাহার অর্থ আমার মনে হয় যে, এশিয়ার জন্য চীনকে রক্ষা করার উপায় স্বরূপে চীনা নারী ও শিশুদের উপর বোমাবর্ষণ এবং প্রাচীন মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ধ্বংসের কথা বলেন, তখন আপনি মানবতার উপর এমন একটি জীবনধারা আরোপ করেন, যাহা

* কবি স্বয়ং এই তহবিলে ৫০০ টাকা দান করেন।

প্রাণীদের মধ্যেও অনিবার্য নহে এবং মধ্যে মধ্যে নীতি হইতে স্খলিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্যে তাহা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য হইবে না। আপনি এমন একটি এশিয়ার কল্পনা করিতেছেন, যাহা নরকপালের স্তম্ভের উপর রচিত হইবে। আমি এশিয়ার বাণীতে বিশ্বাসবান, ইহা আপনি ঠিকই বলিয়াছেন; কিন্তু যে বীভৎস নরহত্যার কার্যে তৈমুরলঙ্গের হৃদয়ে আনন্দ জন্মিত, সেই কার্যের সহিত এই বাণী এক শ্রেণীভুক্ত করিবার চিন্তা আমি কখনও করি নাই।.... 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য', এই নীতি আপনি আপনার পত্রে যে-ভাবে বিকৃত করিয়াছেন, তাহাতে উহা রাজনৈতিক লুণ্ঠনের অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে।...."

"....যে গবর্নমেন্ট তাহার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে জীবনের মূল ভিত্তি পর্যন্ত ধ্বংসসাধনে ব্রতী, সেই গবর্নমেন্টের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ হইয়া তাহার বিশেষ অনুগ্রহলাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকিবাজিকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এড়ানকে আমি আধুনিক বুদ্ধিজীবিগণ কর্তৃক মানবতার কৃতঘ্নতার আর একটি দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করি। দুঃখের বিষয় ন্যায্য মতামত প্রকাশ করিতে গেলে ভবিষ্যতে নিজেদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে আশঙ্কা করিয়া অন্যান্য দেশগুলি কাপুরুষভাবে নীরবতা অবলম্বন করে। কাজেই দুষ্কৃতকারীরা নির্বিবাদে তাহাদের ইতিহাস কলঙ্কিত করে এবং চিরদিনের জন্য তাহাদের সুনাম মসীলিপ্ত করে।....

"আপনার স্বদেশবাসীদের জন্য আমি যারপরনাই দুঃখিত,—আপনার পত্র পাইয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। আমি জানি একদিন আপনার দেশবাসীর মোহ ঘুচিবে এবং রণোন্মত্ত সমরনায়কগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত আপনাদের সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ তাহাদের শত শত বৎসর ধরিয়া দূর করিতে হইবে।...."

[আনন্দবাজার পত্রিকা-১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৫ ॥ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮]

এর প্রায় এক পক্ষ কালের মধ্যেই চেক-সুদেতেন সমস্যাকে উপলক্ষ করে ইউরোপের রাজনীতিক সংকট অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে উঠল,—পূর্বেই তার উল্লেখ করেছি। চেকদের এই সংকটকালে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের এই গোপন ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন। ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি শান্তিনিকেতন থেকে চেক প্রেসিডেন্ট ডঃ বেনেসের কাছে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠান:

"I can only offer profound sorrow and indignation on behalf of India and myself at a conspiracy of betrayal that

has suddenly flung your country into a tragic depth of isolation and I hope that this shock will kindle a new life into the heart of your nation, leading her to moral victory and unobstructed opportunity of perfect self-attainment."—U. P.

মর্মার্থ এই :

"বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে আপনার দেশ নিঃসঙ্গ ও একক হয়ে পড়েছে। এই শোচনীয় ঘটনায় ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে এবং নিজের পক্ষ থেকে গভীর দুঃখ ও বিক্ষোভ জানাচ্ছি। আমি আশা করি এই আঘাত আপনার জাতির অন্তরে নবজীবনের সঞ্চার করবে এবং এর ফলে সে নৈতিক জয় ও পূর্ণ, আত্মোপলব্ধির অবাধ সুযোগ অর্জন করবে।"

উল্লেখযোগ্য, এই দুর্যোগ মুহূর্তে বিখ্যাত চেক সাহিত্যিক কার্ল কাপেক (Karl Capek) ও অন্যান্য ২৮ জন চেক সাহিত্যিক বিশ্বের বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে এক মর্মস্পর্শী ইস্তাহার প্রচার করেন। ভারতবর্ষেও পি. ই. এন. (P. E. N.) সঙ্ঘের কাছে তাঁরা এই ইস্তাহারের কপি পাঠিয়ে দেন। তার মর্মার্থ ছিল এই :

"আমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের জার্মান দেশবাসীর সহিত সফল সহযোগিতায় বাস করিয়াছি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছি। যখন ফ্রান্স, রাশিয়া, সার্বিয়া ও ইতালির যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাই তখন আমরা এই কামনা করি যে, আমাদের একই মাতৃভূমিকে নূতন, শ্রেষ্ঠতর ও সুন্দরতর ইউরোপের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করিব, এ জন্য আমরা আত্মনিয়োগ করি।

"আজ মধ্য ইউরোপে গণতন্ত্রের শেষ ভিটায় দাঁড়াইয়া আমরা ইতিহাসের সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত হইয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আজ যে সর্বনাশ আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে তাহার জন্য আমাদের জাতি দায়ী নয়, সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমরা শান্তিরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু প্রয়োজন হইলে আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও আমরা যথাসাধ্য যুঝিব।

"অতএব আমরা আপনাদের নিকট আবেদন করিতেছি, এ পর্যন্ত ইউরোপ এবং সমগ্র সভ্যজগতের যাহা মহার্ঘ্য সম্পদ ছিল—সত্যনিষ্ঠা, মনের

এ সম্পর্কে লেখকের "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে বিস্তারিত তথ্যসবলিত আলোচনা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা ও বিশুদ্ধ বিবেক—তাহার রক্ষণাবেক্ষণ আপনাদের প্রধান কাজ। শান্তি ও ন্যায়বিচারের জন্য আগ্রহ কোথায় রহিয়াছে, আর কোথায় রহিয়াছে হিংসা ও অসত্যপন্থী স্বৈরাচারীর আক্রমণোন্মুখ মনোভাব, সে কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাইতেছি।

"আমরা আপনাদের নিজ নিজ দেশের জনসাধারণকে এই কথা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে আবেদন জানাইতেছি যে, আমাদের অর্থাৎ ইউরোপের সবাপেক্ষা বিপদাপন্ন স্থানের ক্ষুদ্র শান্তিকামী জাতির উপর যদি আজ মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইব, শুধু আমাদের জন্য নয়—আপনাদের জন্য, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন ও শান্তিকামী জাতির নৈতিক ও মানসিক উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য। এ কথা কেহ যেন ভুলিয়া না যায় যে, আমাদের পরে অন্যান্য জাতি ও দেশের ভাগ্যেও এই সর্বনাশ ঘনাইয়া আসিবে।

"আমরা সমস্ত লেখক ও সংস্কৃতির স্রষ্টাগণকে এই আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন সবপ্রকারে জগতের জাতিসমূহের নিকট এই ইস্তাহারটি প্রচার করেন।"—এ পি

[আনন্দবাজার পত্রিকা-১১ই আশ্বিন, ১৩৪৫ ॥ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮]

এই আবেদনে সাড়া দিয়ে পি ই. এন সঙ্ঘের ভারতীয় শাখা কমিটি কি জবাব দিয়েছিলেন তা জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কমিটির সভাপতি। কিন্তু এই ইস্তাহার বা আবেদন প্রচারিত হবার পূর্বেই কবি প্রেসিডেন্ট বেনেসের কাছে পূর্বোক্ত তারবার্তাটি পাঠিয়েছিলেন। জবাবে প্রেসিডেন্ট বেনেস্ ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কবির কাছে যে তারবার্তাটি পাঠান তা কবির নির্দেশে প্রচারের জন্য এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-কে দেওয়া হয় (২৬শে সেপ্টেম্বর)। তার মর্মার্থ এই :

"আপনি আমার নিকট শুভেচ্ছাজ্ঞাপক যে বাণী প্রেরণ করেছেন তার জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে আপনি যে সহানুভূতি জানিয়েছেন তার জন্য আমার দেশ কৃতজ্ঞ থাকবে।"

কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা এই যে তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চেক-সুদেতেন সমস্যা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রস্তাব কিংবা বিবৃতি দেওয়া হয় নি। দিল্লীতে তখন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলছে (২২—২৪শে সেপ্টেঃ '৩৮)। ওয়ার্কিং কমিটি চেক-সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তো দূরের কথা—এমন কি চেকদের উদ্দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে মামুলী কোন সহানুভূতিসূচক বাণীও

পাঠাতে পারলেন না। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা আন্তর্জাতিক সমস্যা বুঝতেনও না—তা নিয়ে মাথাও ঘামাতে চাইতেন না। জওহরলাল ইউরোপে, সুভাষচন্দ্রও অসুস্থতার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করতে পারেন নি। ২৫শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশন শুরু হয়। পরদিন সুভাষচন্দ্র দিল্লী গিয়ে অধিবেশনের আলোচনায় যোগ দেন। উল্লেখযোগ্য, ইতিমধ্যেই বিলেতের কিছু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী চেম্বারলেন ও বৃটিশের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিবাদ জানাবার আবেদন জানিয়ে কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে তার করেছিলেন (২১শে সেপ্টেঃ, '৩৮)। তারটি ছিল এই :

"We beg you to cable immediate to Dr. Benes, Mr. Chamberlain, Mr. Atlee, and Sir Walter Citrine, expressing India's strongest disapproval of Mr. Chamberlain's policy which hastens imminence of War. We beg you also to reaffirm public by the Congress determination to resist the British war designs."

[*The Amrita Bazar Patrika*, Sept. 23, '38]

কিন্তু এ. আই. সি. সি -র অধিবেশনেও চেকোস্লোভাকিয়া সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হল না,—এমন কি চেকদের প্রতি কোন সহানুভূতিসূচক বাণীও তখনও পর্যন্ত পাঠান হল না। ২৬শে সেপ্টেম্বর সভাপতি সুভাষচন্দ্র যুদ্ধের সম্ভাবনা ও ইতিকর্তব্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সেটি ছিল এই :

"ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে হরিপুরা কংগ্রেসে পররাষ্ট্রনীতি এবং যুদ্ধাশঙ্কা সম্পর্কে যে-সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার সহিত সঙ্গতিরক্ষিত হইবার শর্তে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি অবস্থানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিজ ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটির উপর ন্যস্ত করিতেছে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা-১০ই আশ্বিন, ১৩৪৫ ॥ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮]

ওদিকে ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব চেকরা মেনে নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুদেতেন এলাকায় নাৎসী-শাসনের সূত্রপাত হয়। হতাশ ও ম্রিয়মাণ চেক সৈন্যরা সুদেতেন এলাকা পরিত্যাগ করে চলে আসতে থাকে। এরই প্রতিক্রিয়ায় চেক মন্ত্রীসভা প্রেসিডেন্ট বেনেসের কাছে পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন। অনতি-কাল পরেই জেনারেল সিরোভির নেতৃত্বে চেকোস্লোভাকিয়ার কিছু সমরনায়ক ও বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

জেনারেল সিরোভি শক্ত মানুষ। তাঁর নির্দেশে চেক সেনাবাহিনী বিপুল বিক্রমে সুদেতেন অভিযান করে পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ও জায়গাগুলি দখল করতে থাকে। হিটলার চেক নেতাদের উদ্দেশে প্রবল রণহুঙ্কার ছাড়তে থাকেন। ইতিমধ্যে চেম্বারলেন গোডেস্‌বার্গে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আপোস-আলোচনা শুরু করেন (২২শে সেপ্টেম্বর)। সুযোগ বুঝে হিটলার তাঁর দাবীর মাত্রা ক্রমশই বাড়াতে থাকেন। হিটলারের দাবী, অবিলম্বে চেক সীমান্তে তাঁর চিহ্নিত সমস্ত জায়গাগুলি—শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সামরিক ঘাঁটি সমেত—জার্মানীর হাতে ১লা অক্টোবরের মধ্যে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে। তা ছাড়া সীমান্তের অন্যান্য এলাকার জন্যও তিনি পরে গণভোটের দাবী জানান।

চেম্বারলেন লণ্ডনে ফিরে গিয়েই মন্ত্রিসভার সঙ্গে হিটলারের এই নূতন দাবীগুলি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তাঁর আমন্ত্রণে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ও সমর সচিবও লণ্ডনে গিয়ে ঐ গোপন সলা-পরামর্শে যোগ দেন। কিন্তু জেনারেল সিরোভির নেতৃত্বে চেক-সরকার কঠোর ও অনমনীয় ভাব অবলম্বন করে রইলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে চেক-দূত মিঃ মাসরিক বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের হাতে চেক-সরকারের এক নোট দিয়ে কঠোর ভাষায় জানিয়ে দিলেন, চেক-সরকার হিটলারের অন্যায় ও জঘন্য দাবী কিছুতেই মেনে নেবে না,—রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বস্ব পণ করে প্রতিটি চেক তার শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে লড়াই করবে।

ফলে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর ও ঘোরাল হয়ে ওঠে। সারা ইউরোপের আকাশে যুদ্ধের কালো মেঘে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। চারদিকে 'সাজ-সাজ' রব পড়ে গেল—'যুদ্ধ বুঝি শুরু হয়ে গেল'। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের হিটলারকে শান্ত করবার জন্য পুনরায় মিউনিকে ছুটলেন। মুসোলিনীও এসে যোগ দিলেন। তারপর চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য (চেকদের অনুপস্থিতিতেই) মিউনিকে হিটলারের গোপন কক্ষে ঐতিহাসিক চতুঃশক্তি সম্মেলন শুরু হয়।

এই গুরুতর সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে কংগ্রেস নেতারাও গম্ভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা প্রায় সকলেই তখন দিল্লীতে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য দিনের পর দিন দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলতে থাকে। ২৮শে সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল আলোচনার পর নিম্নলিখিত মর্মে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়:

"ইউরোপে অবস্থা যে-ভাবে পরিণতি লাভ করিতেছে ওয়ার্কিং কমিটি অতিশয় মনোযোগের সহিত তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা হরণ অথবা ইহাকে পঙ্গু করিবার জন্ত জার্মানীর নির্লজ্জ চেষ্টায় কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন।

"স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে নির্ভীক চেকজাতির সংগ্রামে ওয়ার্কিং কমিটি গভীর সহানুভূতি জানাইতেছেন। ভারত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী জাতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত আছে, তাহা অহিংস হইলেও কোন অংশে উহার বীভৎসতা ও মর্মান্তিকতা কম নহে, তথাপি ভারত চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষায় বিশেষ আগ্রহশীল না-হইয়া পারে না। কমিটি আশা করেন যে, এখনও মানুষের সদ্বুদ্ধি উদিত হইয়া আসন্ন সংকট হইতে মানবিকতাকে রক্ষা করিতে পারে।"—এ. পি

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা জানিয়ে ঐদিনই কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্ট ডঃ বেনেসের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে এক তারবার্তায় চেক-জাতির এই নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তার মর্মার্থ ছিল এই:

"আপনাদের সাহসী জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত সংগ্রামে গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া কংগ্রেস এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করি মানুষের শুভবুদ্ধিরই শেষ পর্যন্ত জয় হইবে এবং জনগণ আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। আপনি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা-১২ই আশ্বিন, ১৩৪৫ ॥ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮]

বিলম্বে হলেও কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত এবং সুভাষচন্দ্রের সহানুভূতিসূচক তারবার্তাটি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের কিছুটা মর্যাদা রক্ষা করে। কিন্তু তবুও এখানে যেটি লক্ষণীয় বিষয় তা হল এই যে, কংগ্রেসের ঐ সিদ্ধান্তে ইঙ্গ-ফরাসীদের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের নিন্দা করে কোন কথা বলা হল না। যে-কথা রবীন্দ্রনাথের মত কবিও তীব্র ঘৃণার সঙ্গে বলতে দ্বিধা করেন নি, সেখানে কংগ্রেস নেতাদের এই অহেতুক সংযম ও অতি-সতর্কতা কেন, তার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় এ যেন একটা 'দায় সারা' কর্তব্য পালনি থেকেই এমন একটা নিস্তেজ ও উত্তাপহীন মামুলী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জওহরলাল অবশ্য এই সময় *Hindusthan Times* পত্রিকার লণ্ডনস্থিত সংবাদ-দাতার কাছে চেক-সমস্যা সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন,

"যদি যুদ্ধ বাধে তবে আমাদের সমস্ত সহানুভূতি চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষেই থাকিবে। এই দেশের অধিবাসীরা সাহসিকতার সহিত আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।॰ সমগ্র জগৎ আজ সপ্রশংস দৃষ্টিতে এই জাতির প্রতি চাহিয়া আছে। আমরা সানন্দে তাঁহাদিগকে যতটুকু পারি সাহায্য করিব। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের চালে পড়িতে চাহি না। আর কখনও যদি কোন গভর্নমেণ্টের পক্ষে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে আমরা সে ক্ষেত্রে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে রাজি থাকিব না।"—এ. পি.

তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, "আমরা নিজেরাই আমাদের কর্মপন্থা স্থির করিব, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নহে ; কোন প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না। যাহা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার পক্ষে সহায়ক, এমন কোন সুনির্দিষ্ট কর্মনীতির উপরই আমরা নির্ভর করিব।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা-১১ই আশ্বিন, ১৩৪৫ ॥ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮]

গান্ধীজী অবশ্য চাইছিলেন, বিশ্বের এই সঙ্কট মুহূর্তে ভারত তার "অহিংসার মহান আদর্শে" অবিচল থাকবে—যুদ্ধের প্রশ্নে নীতিগত দিক থেকে কোন রকম আপোস চলবে না। এই সময় এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন,—

"You may rest assured that whatever happens there will be no surrender to the Government. For me, even if I have to stand alone, there is no participation in the war, even if the Government should surrender the whole control to the Congress."

[*Mahatma*, Vol. IV. p. 278]

বস্তুত ওয়ার্কিং কমিটি চেক সমস্যা-সঙ্কট ও ইউরোপের ঘটনাবলীর ক্রম-পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করছিলেন। এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে গিয়ে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি লিখছেন (নয়া দিল্লী, ২৭শে সেপ্টেম্বর),

"আজ অপরাহ্নে মহাত্মার ভবনে পুনরায় এক অধিবেশন হয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিন ঘণ্টা কাল আলোচনা চলে। কমিটি এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া ২/৩ দিন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা দরকার। মহাত্মা গান্ধী কোন বিষয়ে

পূর্ব হইতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন; কাজেই কমিটি পরিস্থিতি কিরূপ দাঁড়ায় তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য আপাততঃ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিবারই সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সাধারণ অভিমত পূর্বেই জ্ঞাপিত হইয়াছে যে, ভারত যতদিন পরাধীন থাকিবে, ততদিন সে সর্বপ্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরোধিতাই করিবে। এক্ষণে একমাত্র প্রশ্ন হইতেছে যে, যে-যুদ্ধের আশঙ্কা করা যাইতেছে বস্তুত যদি সেইরূপ কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধে এবং ভারতকে স্বাধীনতা দান সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি যদি প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে ভারত সেই যুদ্ধে সাহায্য করিবে কিনা কমিটি এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারেন নাই। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কমিটি প্রত্যহই দিল্লীতে অধিবেশন চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা-১১ই আশ্বিন, ১৩৪৫ ॥ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮]

সারা বিশ্বের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তখন মিউনিকের দিকে। মিউনিকে হিটলারের কক্ষে তখন চতুঃশক্তির গোপন সলা-পরামর্শ চলছে। সকলেরই 'কি হয় কি হয়' ভাবনা। অবশেষে ২৯শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে কুখ্যাত ঐতিহাসিক 'মিউনিক চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এতে চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে হিটলারের প্রায় সমস্ত দাবীই মেনে নেওয়া হয়। এই চুক্তির ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ার নামটুকু ছাড়া বিশেষ আর কিছু রইল না। বিখ্যাত 'ম্যাজিনো লাইন' (Maginot Line) এবং সীমান্তের দুর্গাবলী সমর-সম্ভার সমেত জার্মানীর হাতে ছেড়ে দিতে হল। এমন কি হিটলার তাঁর চরমপত্রে সুদেতেন দখলের যে তারিখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সেই তারিখেই দখল দেওয়া হয়। আর যে-সব এলাকা গণভোটের পর জার্মানীর হাতে যাওয়ার কথা ছিল তাও চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানী দখল নিতে আরম্ভ করে। সুদেতেন নাৎসী-হাঙ্গরের পেটে কোথায় তলিয়ে গেল। ইতিহাসে এতখানি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার নজির খুবই বিরল।

• 'মিউনিক চুক্তি'র ফলে সারা ইউরোপ সাময়িকভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল বটে তবে হিটলারের এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ও দানবিক ঔদ্ধত্যের সম্মুখে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির এই কাপুরুষোচিত নতিস্বীকার ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে সারা বিশ্বে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠল। এমন কি চার্চিল সাহেবও এই কাপুরুষোচিত নতিস্বীকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ ও নিন্দাবাদ করলেন। বৃটিশ নৌ-সচিব মিঃ ডাফ কুপার পদত্যাগ করলেন। কমন্স

সভায়ও তুমুল বিক্ষোভপ্রকাশ চলতে থাকে। 'ইজভেস্তিয়ার' জেনিভাস্থিত সংবাদদাতা মন্তব্য করলেন (২রা অক্টোবর),

"বর্তমান অবস্থায় চার ব্যক্তির এই সম্মেলন হচ্ছে ফ্যাসিস্ত আক্রমণ সংহতিবদ্ধ করবার একটি কমিটি। নিজেদের দেশের জনসাধারণকে অস্ত্রে সজ্জিত করতে ফরাসী ও বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভয় পাচ্ছে, তাই তারা জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে মনস্থ করেছে। এই সম্মেলন যুদ্ধের বিপদ দূর করে নি, অল্প কিছুকালের জন্য স্থগিত রেখেছে মাত্র। শুধু মূর্খ ও সরল বুদ্ধির লোকেরাই মনে করবে যে, এই সম্মেলন স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনা করেছে।... এই সম্মেলনের ফলে আক্রমণকারীর ক্ষুধা আরও বাড়বে এবং বহুগুণে দুর্বলীকৃত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষে অসহ্য অবস্থার সৃষ্টি হবে।..."

বলা বাহুল্য, ইউরোপের এই রাজনীতিক সঙ্কটের অবসানে দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ৪ঠা অক্টোবর গান্ধীজী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পরিদর্শনে গেলেন। অন্যান্য নেতারাও একে একে দিল্লী ত্যাগ করলেন।

গান্ধীজী এই সঙ্কটকালে তাঁর অহিংসা-নীতিকেই আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন। দিল্লী ত্যাগের প্রাক্‌কালে তিনি ইউরোপের রাজনীতিক সঙ্কট ও মিউনিক্ চুক্তির তাৎপর্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে এইসব প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করেই 'হরিজন'-এ (*Harijan*, 8th October, 1938) এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। তার মর্মার্থ ছিল এই :

"বর্তমানের মত যুদ্ধের বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল, এটা একটা আশ্বস্তিকর কথা বটে, কিন্তু এই আশ্বস্তির জন্য যে মূল্য দেওয়া হলো তা কি অত্যধিক নয়? কেউ আত্মসম্মান বিক্রি করে দিতে পারে কি? এটা কি সংহত হিংসার জয়? হিটলার কি এমন শক্তি প্রয়োগের নূতন কৌশল আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে তিনি রক্তপাত না করেই তাঁর অভীষ্ট লাভ করতে পারেন? আমি নিজেকে ইউরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে তেমন অভিজ্ঞ মনে করি না। তবুও আমার মনে হয়, আজ ইউরোপে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পক্ষে উন্নতশিরে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রবলতর প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাদেরকে নিশ্চয়ই গ্রাস করে ফেলবে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে দাস রাজ্যে পরিণত হতে হবে।

"সাতদিনের পার্থিব অস্তিত্বের জন্য ইউরোপ তার বিবেক বিক্রি করে দিয়েছে। মিউনিকে ইউরোপ যে শান্তিলাভ করেছে তা হিংসার জয়। একে

পরাজয় বলা যায়। যদি ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স নিজেদের জয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থাকতেন, তবে তাঁরা চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করার কর্তব্য অবশ্য পালন করতেন বা সেই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতেন। কিন্তু তাঁরা জার্মানী এবং ইতালীর সম্মিলিত শক্তির সমক্ষে কম্পিত হলেন। কিন্তু জার্মানী এবং ইতালী কি লাভ করলেন ? মানব জাতির নৈতিক সম্পদের ভাণ্ডার তাঁরা বৃদ্ধি করলেন কি ?

"... চেকোশ্লোভাকিয়ার দুর্দশা দেখে আমি এবং ভারতবাসীরা একটা শিক্ষালাভ করতে পারি। চেকরা যখন দেখল তাদের দুই শক্তিমান বন্ধু আপৎকালে তাদেরকে ত্যাগ করল তখন তাদের আর উপায় ছিল না। তথাপি আমি বলি, তারা যদি জানত কিভাবে জাতির আত্মসম্মান রক্ষার্থে অহিংস নীতি প্রয়োগ করা যায়, তা হলে তারা জার্মানী এবং ইতালীর সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত আর তা হলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে এই তথাকথিত শান্তির জন্য লাঞ্ছিত হবার হীনতা স্বীকার করতে হত না। চেকরা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য দস্যুর রক্তপাত না করেই সকলে প্রাণ দিতে পারত। চেকরা যা করেছে তাকে আমি বীরত্ব বা সংযম বলতে পারি না।"

এরপর তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির চেক-সমস্যা সংক্রান্ত প্রস্তাবের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখলেন,

"আমি বাজে কথা লিখছি না। চেকদের ভাগ্য যখন নির্ধারিত হতে যাচ্ছিল তখন ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখ প্রকাশ করেছিল। এক দিক দিয়ে এই দুঃখপ্রকাশ নিজেদের স্বার্থের দিক থেকেই করা হয়েছিল। সেই দিক থেকে এটা খুব সত্য। কারণ জনসংখ্যার দিক দিয়ে আমরা একটা বিরাট জাতি, কিন্তু ইউরোপের হিসেবে অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ বৈজ্ঞানিক হিংসার দিক থেকে আমরা চেকোশ্লোভাকিয়ার থেকেও অনেক ছোট। আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে এবং তা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম করছি। চেকদের যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র আছে, আর আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। চেকদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কি এবং যদি যুদ্ধ বাধে তাহলেই বা কংগ্রেস কি পন্থা অবলম্বন করবে, সে সম্বন্ধে কমিটি আলোচনা করেন। আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমরা কি ইংলণ্ডের সঙ্গে দর-কষাকষি করব এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হব অথবা অহিংসার আদর্শকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকব এবং আমাদের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিপন্ন চেক জাতির দুর্যোগের সময় বলব যে, আমরা যুদ্ধের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখব না,—যদিও এই যুদ্ধে যোগদান করলে

চেকোশ্লোভাকিয়াকেই সাহায্য করা হবে। এই চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন এবং তাও তার নিজের দোষে নয়। একা সে নিজেকে রক্ষা করবার পক্ষে অত্যন্ত ছোট্ট হওয়াই তার একমাত্র অপরাধ। ওয়ার্কিং কমিটি প্রায় এই সিদ্ধান্তেই এসেছিল যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে দর-কষাকষির সুযোগ উপস্থিত হলেও দর-কষাকষি করা হবে না ; কিন্তু জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে। চেকোশ্লোভাকিয়ার রক্ষা এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য বলা হবে যে, উভয় পক্ষের নিরপরাধ ব্যক্তির হননের মধ্যে সম্মানজনক শান্তি নির্ভর করে না, পরন্তু মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধভাবে অহিংসা পালনের মধ্যেই জগতের সত্যকার শান্তি নির্ভর করছে।

"ওয়ার্কিং কমিটিকে তার নীতি মেনে চলতে হলে এইটাই ছিল যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক করণীয় কাজ। প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীরই এই আস্থা রাখতে হবে যে, অহিংসার পথে ভারতের স্বাধীনতা আসবে। অহিংসার পথে যদি ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয় তবে সেই নীতিতেই ভারত তার স্বাধীনতাকে রক্ষাও করতে পারবে। চেকোশ্লোভাকিয়ার বেলাও তা নিশ্চয়ই সত্য হবে।

"যুদ্ধ যদি সত্যিই বাধত তবে ওয়ার্কিং কমিটি কি পন্থা অবলম্বন করতেন জানি না। তবে এটা সত্য যে, যুদ্ধ স্থগিত আছে মাত্র। নিঃশ্বাস ফেলবার যে অবসরটুকু এখন মিলেছে, সেই সময়ে আমি চেকদেরকে অহিংসার পথ গ্রহণ করার পরামর্শ দিতে পারি। তাদের ভবিষ্যৎ কি আছে তা তারা জানে না। তবে অহিংসার পথে চললে তাদের কোনই ক্ষতি হবে না।"

উপসংহারে তিনি লিখলেন,

স্পেনীয় সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, চীনের অবস্থাও সেই রকম। এরা সকলেই যদি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়, তবে তাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত নয় বলে তা হবে না,—ধ্বংসকার্য সম্পাদনে তারা তত পটু নয় এবং তাদের জনবল পর্যাপ্ত নয় বলেই তাদের পরাজয় হবে। কিন্তু স্পেনীয় সাধারণতন্ত্রের যদি ফ্র্যাঙ্কোর মত শক্তি-সামর্থ্য থাকত, কিম্বা চীনারা যদি জাপানের মত সমরনিপুণ হতো অথবা চেকরা যদি হিটলারী-পন্থায় কাজ করতে পারত তা হলে তাদের কি সুবিধা হত ? আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণ যদি বীরত্ব হয়,—বস্তুত তা বীরত্বেরই পরিচায়ক হবে—তবে আমার মনে হয়, যুদ্ধে বিরত থাকা অথচ শোষকের কাছে আত্মসমর্পণ না করা অধিকতর বীরত্বের পরিচায়ক। মৃত্যুই যখন উভয় পন্থার নিশ্চিত পরিণতি, তখন হৃদয়ে কোন হিংসার ভাব না রেখে, শত্রুর সম্মুখে বুক পেতে মৃত্যুবরণ কি অধিকতর মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয় ?"

বলা বাহুল্য, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা গান্ধীজীর এই অহিংস প্রতিরোধ নীতিকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁরা কিন্তু ফ্যাসিস্টদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম নীতিরই সমর্থন করছিলেন। 'মিউনিক প্যাক্ট' ও ইউরোপের এই রাজনৈতিক সঙ্কটের বিশ্লেষণ করে এই সময় সুভাষচন্দ্র *The Congress Socialist* পত্রিকায় (October, 1938) একটি প্রবন্ধ লেখেন। চেকদের প্রতি ইঙ্গ-ফরাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র সমালোচনা করে তিনি যা লিখলেন তার মর্মার্থ ছিল এই :

"চেম্বারলেন যখন বিমানযোগে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ছুটলেন তখন মনে হচ্ছিল, হিটলার বুঝিবা চেক-অভিযানে উদ্যত হয়েছেন। এই পরিকল্পিত আক্রমণের পশ্চাতে বাস্তব সত্য কিছু ছিল, নাকি এই রকমটা বোঝান হয়েছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব, জার্মানী কিছুতেই যুদ্ধ শুরু করবার সাহস পেত না যদি সে জানত বৃটেন তার বিরুদ্ধে যাবে। সুতরাং আমার মতে বৃটিশ রাজনীতিকরা হয় জার্মানদের হাতে বোকা বনেছেন, নয়ত সজ্ঞানে ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাঁরা সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে জার্মান প্রভুত্ব বিস্তারের মদৎ যোগাচ্ছেন। হিটলারের কাছে বৃটিশের এই আত্মসমর্পণের অর্থ, ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীর জায়গায় ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। ...

"কিন্তু ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করতে এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধও বন্ধ রাখতে পারত। ফরাসীরা যদি বৃটিশ ও জার্মানদের দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিত যে, সে চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষেই দাঁড়াবে তা হলে সে-ক্ষেত্রে রাশিয়াও রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হত। আর রাইন যখন এখনও পর্যন্ত গ্রেট বৃটেনের সীমান্ত সে-ক্ষেত্রে সেও ফরাসীদের ত্যাগ করতে পারত না।

"বৃটেন যদি জার্মানীকে জানিয়ে দিত যে, সে চেকোশ্লোভাকিয়ার ও ফ্রান্সের পাশেই দাঁড়াবে তা হলে সেইটাই হিটলারের চেক-আক্রমণ পরিকল্পনা পরিত্যাগের পক্ষে যথেষ্ট হত,—এই হচ্ছে আমার সুচিন্তিত অভিমত।

"ইঙ্গ-ফরাসীদের এই বিশ্বাসঘাতকতার মুখে চেকোশ্লোভাকিয়া কি করতে পারত? আমার ধারণা, যদি সে জার্মান আক্রমণ মোকাবিলার জন্য রুখে দাঁড়াত, তা হলে ফ্রান্স ও রাশিয়াকে সে রণক্ষেত্রে নামাতে পারত এবং শেষ পর্যন্ত বৃটেনকেও।... "*

* *Crossroads*, pp. 76-78

লক্ষ্য করবার বিষয়, হিটলার ও ফ্যাসিস্তদের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানকে প্রতিহত করার জন্যই যে সুভাষচন্দ্র গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, এই প্রবন্ধই তার সাক্ষ্য বহন করছে। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও জার্মান আক্রমণের মোকাবিলার জন্য চেকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে দেখবার আশা ও কামনা করেছিলেন তিনি। জওহরলালও অনুরূপভাবে চিন্তা করছিলেন। ফ্যাসিস্ত আগ্রাসন ও যুদ্ধ-বিরোধী প্রতিরোধ-সংগ্রাম সম্পর্কে গান্ধীজীর সঙ্গে এঁদের নীতিগত ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কতখানি তা আর বিশেষ ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। 'মিউনিক প্যাক্ট' ও নাৎসী-জার্মানীর বিজয়োল্লাসের সংবাদে কবি যে কি পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়ে ওঠেন তা সহজেই অনুমেয়। তারই প্রচণ্ড অভিঘাতে কবি এই সময়ই তাঁর ঐতিহাসিক 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটি রচনা (বিজয়া দশমী, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৪৫ ॥ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৮) করেন :

"উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন
দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কাল নাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।

"প্রতাপের তোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী, ২৪ খণ্ড ॥ পৃঃ ৯-১০]

ভারতবর্ষের সমকালীন আর কোন প্রগতিশীল ও সমাজসচেতন কবি চেকোস্লোভাকিয়া ও মিউনিক চুক্তিকে উপলক্ষ করে কোন কবিতা লিখেছেন বলে জানা নেই।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে কবি স্থির থাকতে পারলেন না। ইতিমধ্যেই খবর আসে, হিটলারের চাপে পড়েই নাকি প্রেসিডেন্ট বেনেস্ ও চেক-মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেছেন। অসহায় ও বিপন্ন চেকদের এই নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনার কথা কবি যতই চিন্তা করতে থাকেন ততই নিদারুণ ক্ষোভে ও যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। কয়েকদিন পর ইঙ্গ-ফরাসীদের এই জঘন্য বিশ্বাস-ঘাতকতায় ক্ষোভ প্রকাশ এবং বিপন্ন চেকদের প্রতি তাঁর মর্মবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করে কবি অধ্যাপক লেস্নিকে এক পত্র (১৫ই অক্টোবর, '৩৮) দেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটির ইংরেজি তর্জমাটিও পাঠিয়ে দেন। কবির পত্রটির মর্মার্থ ছিল এই :

উত্তরায়ণ

শান্তিনিকেতন, বাঙলা

১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৮

প্রিয় বন্ধু,

আপনার দেশবাসীর লাঞ্ছনাভোগ আমি ঠিক তাঁদেরই মত করে তীব্রভাবে অনুভব করছি। আপনাদের দেশে যা ঘটেছে তা শুধু একটা স্থানীয় দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার নয় যা নিছক আমাদের সহানুভূতি দাবী করতে পারে। যে সমস্ত মানবিক নীতির জন্য পাশ্চাত্যবাসীরা বিগত তিন শ বছর ধরে আত্মদান করে আসছেন সেই সব নীতির ভাগ্য আজ কতকগুলি কাপুরুষ অভিভাবকদের করায়ত্ত হয়েছে ;—এঁরা তাঁদের নিজেদের গা-বাঁচাবার জন্য আজ তা বিকিয়ে দিচ্ছেন, এটা একটা মর্মান্তিক উপলব্ধিও বটে। এমন কি যখন গুণ্ডা ও হামলা-কারীরাও পরস্পরের সমর্থনে দাঁড়াচ্ছে তখন গণতন্ত্রী মানুষের তার সমশ্রেণীয়দের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতাটা দেখে হতাশ না-হয়ে পারা যায় না।

এই সমস্ত কথা চিন্তা করে আমি নিজেকে খুবই লাঞ্ছিত ও অসহায় বোধ করছি। অবমানিত বোধ করছি তখনই, যখন দেখি বর্তমান সভ্যতা যা-কিছু মূল্যবোধ আমাদের দিয়েছে, একের পর এক তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে,—তার প্রতিরোধ করবার শক্তিহীনতা অনুভব করে নিজেকে অসহায় বোধ করছি। আমার নিজের দেশও এই সব অন্যায়ের ভুক্তভোগী। এই সব উন্মাদের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলাকে প্রতিরোধ করতে পারে আমার বাণীর সে ক্ষমতা নেই। যারা মানবতার উদ্ধারকর্তা বা ত্রাতারূপে এতকাল ভান করে এসেছে তাদের পলায়নপরতাকে রোধ করতে পারে, এমন ক্ষমতাও আমার নেই। যাঁরা এখনও সম্পূর্ণরূপে বিকৃতবুদ্ধি হন নি, কেবল তাঁদেরকেই আমি স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, মানুষ যখন পশুতে পরিণত হয় তখন আগেই হোক পরেই হোক, পারস্পরিক ছেঁড়াছেঁড়িতে তারা লিপ্ত হবে।

আপনার নিজের দেশের কথা বললে আমি কেবল মাত্র এই আশাই করি যে, যদিও সে পরিত্যক্ত ও লুণ্ঠিত হয়েছে তথাপি সে তার দেশীয় সংহতি এবং তার নিজস্ব সম্পদ বলে আশ্রয় গ্রহণ করে এক অভূতপূর্ব ও সমৃদ্ধ জাতীয় জীবন সৃষ্টি করবে।

আমার এই বিক্ষুব্ধ ভাবাবেগ অভিব্যক্তি পেয়েছে আমার সম্প্রতিকালে রচিত ও অপ্রকাশিত একটি কবিতায়। তার ইংরেজী তর্জমার একটি কপি আপনাকে

পাঠালাম। আপনি যেমন খুশি তেমনি ভাবে এটিকে ব্যবহার করতে পারেন, অবশ্য যদিও এটা *'Visva-Bharati Quarterly'*-র নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। যদি চান তা হলে এর মূল বাংলাটাও আপনাকে পাঠাতে পারি। শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা নিবেদনান্তে। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[দ্র: *Visva-Bharati News*, November 1938]

ইতিমধ্যে 'হরিজন'-এ গান্ধীজীর ঐ প্রবন্ধের বক্তব্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা চলতে থাকে। আদর্শের দিক থেকে এই অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রাম সমর্থনযোগ্য হলেও বাস্তবে এই নীতি কার্যকরী হওয়া যে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার, মোটামুটিভাবে গান্ধীজীর সমালোচকদের এই ছিল বক্তব্য। ২৪শে আশ্বিন (১৩৪৫ ॥ ১১ই অক্টোবর, ১৯৩৮) 'দেশরক্ষায় অহিংস নীতি' এই শিরোনামায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন,

"মহাত্মা গান্ধী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কার্যকলাপের যে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার অবলম্বিত নীতি সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট রহস্যময় বলিয়া মনে হইতেছে। ··

"মহাত্মা গান্ধীর মতে চেকদের পক্ষে কি করা উচিত, আমরা তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। চেকরা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং রণবলে হীন বলিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের চাপে পড়িয়া বিনাযুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে সত্য। কিন্তু যদি তাহারা এইভাবে আত্মসমর্পণ না করিত, গান্ধীজীর ভাষায়, 'অহিংস নীতি প্রয়োগ করিয়া জার্মানী ও ইতালীর সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত' তাহা হইলেই বা কি ফল হইত? ইতালী যোগ না-দিলেও একা জার্মানীরই কামান ও ট্যাঙ্কের আক্রমণে, বিমান নিক্ষিপ্ত বোমার মুখে, সমস্ত চেকোশ্লোভাকিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতে পারিত, চেক ও শ্লোভাক জাতিরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত—তাহাদের বংশে বাতি দিবারও কেহ থাকিত না। যে কয়জন আততায়ীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাহারাই কেবল দাস জাতি রূপে বাঁচিয়া থাকিত। মহাত্মা গান্ধী হয়ত মনে করিয়া থাকিবেন যে, চেকদের অহিংস আত্মত্যাগ ও মৃত্যুবরণের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়া শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টান জার্মানীর

চিত্তে অনুতাপ জাগিত এবং তাহারা ধ্বংসলীলা সম্বরণ করিত, কিন্তু নাজী জার্মানীর শিক্ষায় এই খ্রীষ্টীয় অনুতাপ ও দৈবীভাবের কোন স্থান নাই। বরং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক পরিত্যক্ত চেকোস্লোভাকিয়া ক্ষুদ্র ও অসহায় হইলেও যদি স্বদেশ রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিত এবং শেষ পর্যন্ত লড়িত, তাহা হইলে কিছু ফল হইতে পারিত।

"মহাত্মা গান্ধী কেবল চেকোস্লোভাকিয়াকে এই পরামর্শ দেন নাই, ইতালী কর্তৃক আক্রান্ত আবিসিনিয়াকেও তিনি এই পরামর্শ দিয়াছেন। প্রবল জাতি কর্তৃক আক্রান্ত বর্তমান পৃথিবীর আরও একটি দুর্বল জাতিকে তিনি ঐ একই পরামর্শ দিয়াছেন* ...

"অর্থাৎ গান্ধীজীর মতে স্বদেশরক্ষার জন্যও আততায়ীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত নহে, আত্মসমর্পণ না করিয়া অহিংসভাবে মৃত্যুবরণ করা উচিত। নীতির দিক হইতে ইহা খুবই উচ্চ আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব সমাজের বর্তমান অবস্থায় গান্ধীজীর এই মহৎ আদর্শ যে কোন জাতি অনুসরণ করিবে এবং অনুসরণ করিলেও তাহাতে যে কোন ফল হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। ইহার দ্বারা জগতের অহিংসার আদর্শের জয় ত হইবেই না, উপরন্তু পশুবলের প্রাধান্য স্থাপনের পথে বাধা দিবার কেহ থাকিবে না। যাহারা পশুবলে দর্পিত, বিপুল মারণাস্ত্র-সহায়, তাহারাই জগতের অন্যান্য জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবে, যাহারা অহিংসাবাদী, নৈতিক আদর্শে বলীয়ান তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। উহার ফলে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কি জয় হইবে?—মানব সভ্যতা কি উন্নততর হইবে?"

এ ধরনের সমালোচনা বিভিন্ন মহল থেকেই উঠল। এ সবই গান্ধীজীর নজরে আসে। তিনি তখন খান আব্দুল গফ্ফর খানের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সফর করছিলেন। সেখান থেকেই তিনি তাঁর সমালোচকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তাঁর বক্তব্যকে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে 'হরিজন'-এ দীর্ঘ প্রবন্ধ (*Harijan*, 15th October, 1938) লেখেন।* তার মর্মার্থ ছিল এই:

"হের হিটলারের জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছে তাকে আমি 'অসম্মানজনক শান্তি' আখ্যা দিয়ে থাকি, তাতে বৃটিশ অথবা ফরাসী রাজনৈতিকদের উপর কোন কটাক্ষপাত করার উদ্দেশ্য নেই। মিঃ চেম্বারলেন এর থেকে উৎকৃষ্টতর কোন

* এই সম্পর্কে লেখকের "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করা হয়েছে।

উপায় উদ্ভাবন করতে পারতেন না, এ আমি নিঃসন্দেহে জানি। তিনি তাঁর জাতির দুর্বলতা ভাল করেই জানেন। যতদূর সম্ভব তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেই চেয়েছিলেন। যুদ্ধ ভিন্ন চেক জাতির জন্ম তিনি অন্যভাবে তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে সম্মান রক্ষা হল না বলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। যতবার হের হিটলার কিংবা সিনর মুসোলিনীর সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ হবে, ততবারই এইরকম অবস্থা দাঁড়াবে।

"এর অন্য ব্যবস্থা হতে পারে না। গণতন্ত্র রক্তপাত করতে শঙ্কিত। উক্ত দুই ডিক্টেটরেরই মতবাদ এই যে, নরহত্যায় ভীত হওয়া কাপুরুষতা। সঙ্ঘবদ্ধ নরহত্যাকে গৌরবমণ্ডিত করবার জন্য তাঁরা কাব্যের সমস্ত কলা-কৌশলই ব্যবহার করেছেন।··যুদ্ধের জন্য তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত। ইটালী কিংবা জার্মানীতে তাঁদিগকে বাধা দেওয়ার মত কেউ নেই। তাঁদের কথাই আইন।

"মিঃ চেম্বারলেন কিংবা মসিঁয়ে দালাদিয়ারের সম্বন্ধে অন্য কথা। তাঁদেরকে তাঁদের পার্লামেন্ট এবং চেম্বারের মন রক্ষা করতে হয়। তাঁদের নিজ নিজ দলের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। সর্বদা তাঁরা 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে কথা বলতে পারেন না। তাঁদের ভাষায় অন্তত গণতন্ত্রের আভাসও থাকা প্রয়োজন।····

"চেক জাতির কাছে এবং তাদের মারফৎ তথাকথিত সমস্ত 'ক্ষুদ্র' অথবা 'দুর্বল' জাতির কাছে আমি যা বলতে চাই, তার পূর্বে এই ভূমিকা করার প্রয়োজন ছিল। আমি চেক জাতির কাছে আমার কথা বলতে চাই। কারণ তাদের অবস্থা দেখে আমার মর্মপীড়া চরমে উঠেছে।

"আমার মনে যে ভাবের উদয় হচ্ছে তাতে আমি যদি তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করি, তা হলে আমার পক্ষে ভীরুতা প্রকাশ করা হবে। এটা সুস্পষ্টরূপেই বোঝা যাচ্ছে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি হয় ডিক্টেটরদের রক্ষণাধীনে আসবে অথবা আসবার জন্য প্রস্তুত থাকবে, কিংবা ইউরোপের শান্তির নিরবচ্ছিন্ন অন্তরায়স্বরূপ হবে। জগতের সমস্ত জাতির শুভেচ্ছা সত্ত্বেও ইংরেজ ও ফরাসীরা তাঁদিগকে রক্ষা করতে পারতেন না। তাঁরা যদি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন, তা হলে অদৃষ্টপূর্ব রক্তস্রোত বইত এবং ধ্বংসলীলা চলত। সুতরাং আমি যদি চেক হতাম, তা হলে আমার দেশরক্ষার দায়িত্ব থেকে ঐ দুই জাতিকে মুক্ত করে দিতাম। সে অবস্থায়ও আমাকে বাঁচতে হবে। আমি কোন জাতির বা সঙ্ঘের দাস হব না। হয় আমি নিরঙ্কুশভাবেই স্বাধীন থাকব, নচেৎ ধ্বংস হব। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার মধ্যে বিজয়লাভের আশা করা নিছক স্পর্ধার কথা, সন্দেহ নেই।

যে আমার স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত, আমি যদি তার শক্তি সম্পর্কে উপেক্ষা করে তার বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হই এবং সেই উদ্যমে যদি নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে ধ্বংসমুখে পতিত হতে হয়, তাকে স্পর্ধা বলা চলে না। সেরূপ ক্ষেত্রে আমার রক্তমাংসের দেহ ধ্বংস হল বটে, কিন্তু আমার আত্মা অর্থাৎ আমার সম্মান রক্ষা পেল। আমি এই মর্যাদাহানিকর শান্তির সুযোগ গ্রহণ করে বলব যাতে অসম্মান সহ্য করতে না হয়, সেই ভাবে চলে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করব।

"কিন্তু জনৈক শান্তিকামী বলেন, 'হিটলারের দয়ামায়া নাই, হিটলারের কাছে আপনার এই আধ্যাত্মিকতার কোনই মূল্য নাই।'

"এ বিষয়ে আমার উত্তর এই যে,—হয়ত আপনার কথা ঠিক। কোনও জাতি অহিংস প্রতিরোধ পন্থা গ্রহণ করেছে বলে ইতিহাসে কোনও নিদর্শন নেই। হিটলার যদি আমার দুর্গতি দেখে বিচলিত না হন, তাতে কিছুই আসে যায় না। কারণ আমার তাতে কিছুই ক্ষতি হবে না। আমার কাছে আমার আত্মমর্যাদাই অধিকতর মূল্যবান। আমার আত্মসম্মান হিটলারের দয়ার অতীত। আমি অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। এর সম্ভাব্যতার সীমা নির্দেশ করা কঠিন। এ পর্যন্ত হিটলার এবং তাঁর মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে, মানুষ শক্তির দাস। সুতরাং নিরস্ত্র ও অহিংস নরনারী ও বালক-বালিকা কর্তৃক অহিংস প্রতিরোধ তাঁদের কাছে নূতন জিনিস। কে সাহস করে বলতে পারে যে, তাঁদের অন্তরে কমনীয় ও উচ্চ মনোবৃত্তির স্থান নেই? আমার মধ্যে যে আত্মা, তাঁদের মধ্যেও সেই আত্মাই রয়েছে।

"আর একজন সান্ত্বনাদাতা বলেন,—'আপনি যা বলছেন, আপনার পক্ষে তা ঠিক হতে পারে। কিন্তু আপনার এই অভিনব আহ্বানে আপনার জাতির সকলে সাড়া দেবেন, এটা আপনি কি করে আশা করতে পারেন? তারা যুদ্ধে অভ্যস্ত। ব্যক্তিগত বীরত্বক্ষেত্রে তারা জগতে কারুর থেকে কম নয়। সুতরাং এখন তাদের অস্ত্র ত্যাগ করে অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রামে অভ্যস্ত বা প্রস্তুত হতে বলা আমার কাছে নিষ্ফল প্রয়াস বলেই মনে হয়।'

"আপনার উক্তি সত্য হতে পারে, কিন্তু আমারও একটা কর্তব্য আছে, আমার জাতির প্রতি আমার যে বাণী তা আমাকে বলে যেতেই হবে। আমি এত গভীর অপমান বোধ করছি যে, আমাকে অন্ততঃ আমার প্রেরণানুযায়ী কাজ করতেই হবে।

"আমার বিশ্বাস, আমি যদি চেক হতাম তা হলে আমিও এই ভাবেই কাজ করতাম। যখন আমি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করি আমার কোনো সহকর্মী ছিল না। আমাদের ধ্বংস করবার পক্ষে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি জাতির বিরুদ্ধে আমরা তের হাজার নারী-পুরুষ-শিশু দাঁড়িয়েছিলাম, কেউ আমার কথা শুনবে কিনা তা আমার জানা ছিল না। এটা প্রত্যাশিতভাবেই এসেছিল। তের হাজারের সকলেই অবশ্য সংগ্রাম করে নি, অনেকেই পিছনে পড়ে রয়েছিল। কিন্তু জাতির সম্মান রক্ষিত হয়েছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার সত্যাগ্রহের দ্বারা নূতন ইতিহাস লিখিত হয়েছে।

"এর থেকেও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত আছে—খান আবদুল গফ্ফর খাঁ। তিনি নিজেকে খোদাই-খিদমদগার (The Servant of God) বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং পাঠানরা তাঁকে আদর করে 'ফকির-ই-আফগান' বলে থাকেন। এই প্রবন্ধ লিখবার সময় তিনি আমার সম্মুখেই বসে আছেন। তাঁর প্রেরণায় সহস্র সহস্র পাঠান অস্ত্র ত্যাগ করেছে। তিনি অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন বলে মনে করেন। তবে তিনি তাঁর জাতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন নি। তাঁর শান্তি সেনাবাহিনী যে প্রতিজ্ঞা করে, তা আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি। তাঁর এই খোদাই-খিদমদরা কি করছেন তা স্বচক্ষে দেখবার জন্যই আমি সীমান্ত প্রদেশে এসেছি, অথবা তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।"

তিনি আরও লিখলেন,

... "অস্ত্র না রেখে এরা নিজেদেরকে যে রকম সাহসী মনে করত, অহিংসা নীতি গ্রহণ করে তারা যদি নিজেদেরকে তার চেয়ে বেশী সাহসী মনে না করে থাকে এবং যদি অহিংস নীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা না থাকে, তবে তাদের অহিংসা নীতি ত্যাগ করে পুনরায় অস্ত্র গ্রহণ করা উচিত। এই অস্ত্র গ্রহণ করতে তাদের অন্তর যদি বাধা না দেয় তবে অন্য কেউ বাধা দেবে না। যথাযথভাবে অহিংস নীতি গ্রহণ না করা হলে কাপুরুষতারই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। যদি এদের অন্তরে অহিংস নীতি পৌঁছে দিতে পারি তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হল বলে আমি মনে করব।"

উপসংহারে তিনি প্রেসিডেন্ট বেনেসের উদ্দেশে বলেন,

"আমি ডাঃ বেনেস্‌কে একটা অস্ত্র উপহার দিচ্ছি, সেটা দুর্বলের অস্ত্র নয়—বীরের অস্ত্র। বিদ্বেষভাব বর্জিত হয়ে এবং আত্মা ছাড়া অন্য সব কিছুই নশ্বর,

এই বিশ্বাস রেখে যত বড় শক্তিই হোক না কেন তার কাছে মস্তক অবনত না করবার দৃঢ় সঙ্কল্পের মত শ্রেষ্ঠ বীরত্ব আর কিছুই নেই।"

বলা বাহুল্য, এ-সব কথা গান্ধীজী এই-ই প্রথম বললেন না। তবে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর যৌবনকাল থেকেই যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ এবং পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদের স্বরূপটি বুঝতে পেরে তাকে তীব্র ভাষায় ভৎ'সনা ও বিনিপাত করে চলেছিলেন গান্ধীজীর পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। বস্তুত 'রাউলাট্ অ্যাক্ট' ও জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার আগে পর্যন্তও 'বৃটিশ এম্পায়ারে'র সম্পর্কে তাঁর খুব কম মোহ ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী ভারতীয়দের মানবিক অধিকারের জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সত্যাগ্রহ সংগ্রাম করেছিলেন বটে তবে সামগ্রিকভাবে 'বৃটিশ এম্পায়ারে'র স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোন কাজ বা আন্দোলন সজ্ঞানে তিনি করেন নি। তাঁর 'বিবেক ও কর্তব্যবুদ্ধির তাড়না' থেকে তাঁর মনে হয়েছিল, যেহেতু ভারতীয়রা বৃটিশ এম্পায়ারের প্রজা সেই হেতু বৃটিশের বিপন্ন মুহূর্তে তাকে ভারতীয়দের সব রকম দিক থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা উচিত। এই কর্তব্যবুদ্ধি থেকেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় 'বুয়র যুদ্ধ' ও 'জুলু-বিদ্রোহের' সময় বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে এ্যাম্বলেন্স বাহিনী গঠন করেছিলেন। এই 'কর্তব্যবুদ্ধির তাড়না' থেকেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে—এমন কি নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি গুজরাটের খেদা অঞ্চলে দিনের পর দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ইংরেজদের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। গান্ধীজীর জীবনীকার টেণ্ডুলকর এই অধ্যায়টির শিরোনাম দিয়েছেন,—'Recruiting Sergeant'। টেণ্ডুলকর এইকালে গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের যেসব বিস্তারিত তথ্যাদি সংকলন করে দিয়েছেন কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য এখানে তার দু'একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে যুদ্ধ সম্মেলনে (২৭শে এপ্রিল, ১৯১৮) যোগদানের কয়েক দিন পরেই গান্ধীজী বড়লাটকে এক পত্রে যুদ্ধে পূর্ণ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে লিখলেন,

"I recognize that in the hour of its danger we must give as we have decided to give, ungrudging and unequivocal support to the empire of which we aspire in the near future to be partners in the same sense as the dominions overseas. ......If I could make my countrymen retrace their steps, I would make them withdraw all the Congress resolutions and

not whisper 'Home Rule' or 'Responsible Government' during the pendency of the war. I would make India offer all her able-bodied sons as a sacrifice to the empire at its critical moment and I know that India, by this very act would become the most favoured partner in the empire and racial distinctions would become a thing of the past."

[*Mahatma*, Vol. I. pp. 277-78]

এর মাস দুই পরে, গুজরাটের খেদা অঞ্চলের জনসাধারণকে সৈন্যদলে যোগদানের আবেদন জানিয়ে গান্ধীজী এক বিবৃতিতে বলেন (২৩শে জুন),

"If we want to learn the use of arms with the greatest possible despatch, it is our duty to enlist ourselves in the army. ...If we want to become free from the reproach, we should learn the use of arms. The easiest and straightest way, therefore, to win swaraj is to participate in the defence of the empire. If the empire perishes, with it perish our cherished aspirations." [*Ibid*, p. 280]

তবে যুদ্ধের পর 'রাউলাট এ্যাক্ট' ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরই বৃটিশ এম্পায়ার সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ শুরু হয়। এর পরই তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের প্রকৃত স্বরূপটি আরও দীর্ঘকাল পরে তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়। কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের প্রশ্নটির উপরেও তিনি দীর্ঘকাল তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ১৯২৭ সালে জওহরলাল ইউরোপ থেকে ফিরেই মাদ্রাজ কংগ্রেসে এবং তার পরবর্তীকালে কংগ্রেসের অন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের প্রশ্নটিতে যেমন গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, তিনি তার তেমন প্রয়োজন বোধ করেন নি। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের সঙ্কট এবং ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও তার বিপজ্জনক তাৎপর্যটি সম্পর্কেও তিনি তত গুরুত্ব দেন নি কিংবা তার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

বস্তুত ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণের পর থেকেই তিনি তাঁর এই অহিংস আন্তর্জাতিক নীতিকে সুস্পষ্ট রূপদানে অগ্রণী হলেন। ১৯৩৫ সালের ২রা অক্টোবর ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। এই ঘটনাটি তাঁর মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি আবিসিনিয়ার জনগণকে অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রামের পরামর্শ দিয়ে 'The Greatest Force' এই শিরোনামায় হরিজন-এ এক প্রবন্ধ (*Harijan*, October 12, 1935) লিখলেন। তিনি বললেন,

"আমার অবিচল বিশ্বাস এই যে, বিশ্বমানবের কাছে ভারতবর্ষ অহিংসার বাণী নিবেদন করবে, এইটাই বিধৃত হয়ে আছে। এটা ফলবতী হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কিন্তু আমি যতদূর বুঝতে পারছি তাতে এই ব্রত পরিপূরণের ক্ষেত্রে অন্য কোন দেশ তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

"আবিসিনিয়া যদি অহিংসা নীতি অবলম্বন করত তা হলে তার অস্ত্রের কিংবা অন্য কারুরই সাহায্য প্রয়োজন হত না। 'লীগ' অথবা অপর কোন শক্তির সশস্ত্র হস্তক্ষেপেরই তার প্রয়োজন হত না। আবিসিনিয়া যদি সশস্ত্র-প্রতিরোধ না করত, যদি সে বলপ্রয়োগজনিত কিংবা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে সহযোগিতা না করত, তা হলে ইতালীর পক্ষে জয় করবার কিছুই থাকত না। সে-ক্ষেত্রে সে ইতালীর অধিকৃত হলেও তা যেন এক জনমানবহীন দেশ হত। সেটা অবশ্য ইতালীর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। সে চায় সে দেশের জনগণ তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করুক।"

এখন প্রশ্ন এই, গান্ধীজীর এই আন্তর্জাতিক নীতি ও আদর্শ কি কংগ্রেস পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল? আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীন আক্রমণের ক্ষেত্রে কংগ্রেস কি তাঁদেরকে অহিংস প্রতিরোধ নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, না-কি তাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন?

বলা বাহুল্য, লক্ষ্ণৌ (এপ্রিল, ১৯৩৬), ফৈজপুর (ডিসেম্বর, ১৯৩৬), ও হরিপুরা কংগ্রেসে (ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮) আবিসিনিয়া স্পেন ও চীনের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে তাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেই কংগ্রেস থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। তা ছাড়া ফ্যাসিস্তদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ ও আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবার জন্য কংগ্রেস থেকে প্রবল গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানান হয়। আসন্ন যুদ্ধে যে ভারতবর্ষ বৃটিশকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে না তাও পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে আবিসিনিয়া সম্পর্কে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তার মর্মার্থ এই:

"সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গ্রাস হইতে ইথিওপিয়ানগণ যেরূপ বীরোচিতভাবে দেশরক্ষা করিতেছে, তাহাতে কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের পক্ষ হইতে ইথিওপিয়ানগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। কংগ্রেস মনে করে যে, ইতালীয় শক্তির বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার এই সংগ্রাম জগতের নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতিসমূহের পক্ষে মুক্তিসংগ্রামেরই অংশ-বিশেষ।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা-২রা বৈশাখ, ১৩৪৩ ॥ ১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৬]

পরবর্তীকালে স্পেন ও চীনের ক্ষেত্রেও কংগ্রেস থেকে অনুরূপ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণই নয়, আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে প্রবল গণ-বিক্ষোভ চলতে থাকে এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্পেন ও চীনে 'মেডিক্যাল মিশন' পাঠান হয়। এসব কথা আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি (দ্রঃ 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ'—৩য়, ৪র্থ খণ্ড)।

যা-ই হোক, এখানে যেটা লক্ষণীয় বিষয়, সেটা হচ্ছে কংগ্রেস নেতারা গান্ধীর এই আন্তর্জাতিক নীতিকে সঠিক অর্থে গ্রহণ করতে পারেন নি, বিশেষ করে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থী নেতারা। বস্তুত এঁরাই কংগ্রেসের তৎকালীন বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আসছিলেন। তাঁরা দুর্বল ও আক্রান্ত দেশগুলির সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামকে শুধু নৈতিক সমর্থন ও প্রশংসাই করেন নি, এমন কি ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি ফ্যাসিস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করতে গিয়ে যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে তা হলে সে-ক্ষেত্রে বৃটিশকে শর্তসাপেক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা করারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন; আর সে শর্ত হচ্ছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাদান সম্পর্কে বৃটিশের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চাই। পক্ষান্তরে গান্ধীজী চাইছিলেন, যুদ্ধের প্রশ্নে নীতিগত দিক থেকে কোন রকম আপোস চলবে না,—এমন কি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা ও পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হলেও না, ভারত তার অহিংসার নীতিতে অবিচল থাকবে। মিউনিক সঙ্কটের সময় দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক চলেছিল তাতে এইসব প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় কিন্তু কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। ইতিমধ্যে মিউনিক প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটিও এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে সাময়িকভাবেও মুক্তি পেলেন।

মিউনিক সঙ্কটের পর সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থী নেতারা খুবই সতর্ক ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আসন্ন মহাযুদ্ধ ও বৃটিশের অভিসন্ধি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র ১১ই নভেম্বর সারা ভারতে 'যুদ্ধ-বিরোধী দিবস' উদ্‌যাপনের আবেদন জানালেন (৮ই নভেম্বর)। তার মর্মার্থ ছিল এই:

"এদেশে এমন কেহ থাকিতে পারেন না, যাঁহারা মনে করেন যে, মিউনিক চুক্তির ফলে শুধু যুদ্ধের আশঙ্কাই তিরোহিত হয় নাই, শান্তির যুগও প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। চেকোস্লোভাকিয়াকে বলি

দিয়া এবং বৃহত্তর শক্তিবর্গ নাৎসী জার্মানীর নকট নতি স্বীকার করিয়া যুদ্ধ এড়াইয়াছেন, এ-কথা সত্য; কিন্তু যুদ্ধের মেঘ কাটে নাই। বাহ্যিক শান্তির আড়ালে অবিরত যুদ্ধায়োজন চলিতেছে; ভাবী সমরের ভয়াবহ কলরব শুনিতে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় ভারতের কর্তব্য কি? ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছে যে, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতের ধন ও জনশক্তির শোষণ কংগ্রেস কোনমতেই বরদাস্ত করিবে না। গত ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুরা কংগ্রেসে কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে, ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টায় বাধা দেওয়া হইবে। এতদবস্থায় দেশের জনমতকে সমরাশঙ্কার সম্পর্কে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে এবং যে-কোন মুহূর্তেই যে যুদ্ধ বাধিতে পারে এই সঙ্কটের কথা সকলকে বুঝাইয়া জনসাধারণকে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন অবিরত চালান আবশ্যক। কাজেই আমাদের পূর্ববর্তী কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ মান্য করিয়া ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ-বিরোধী দিবস পালন করা সর্বতোভাবে সঙ্গত হইবে। ঐ দিন দেশের সবত্র সভা-সমিতি ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া হরিপুরা কংগ্রেসের গৃহীত বৈদেশিক নীতি এবং সমরাশঙ্কা সম্পর্কিত প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে।...."

[আনন্দবাজার পত্রিকা-২৩শে কার্তিক, ১৩৪৫ ॥ ৯ই নভেম্বর, ১৯৩৮]

তা ছাড়া 'নিখিল ভারত যুদ্ধ-বিরোধী সম্মেলনের' আহ্বায়ক ও নিঃ ভাঃ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক, সাজ্জাদ জাহিরও ঐ দিন দেশের সর্বত্র যুদ্ধ-বিরোধী দিবস পালনের আবেদন জানালেন। যা-ই হোক, ১১ই নভেম্বর কলকাতায় ও দেশের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ-বিরোধী দিবস পালন করে হরিপুরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তটি পাঠ করা হয়।

গান্ধীজীও এই উপলক্ষে 'হরিজন'-এ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। বলা বাহুল্য, মিউনিক চুক্তি ও চেকদের সম্পর্কে গান্ধীজী যে-সব প্রবন্ধ লেখেন তাই নিয়ে তখনও বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা করা হচ্ছিল। সমালোচকদের প্রধান বক্তব্য, গান্ধীজী ইংলণ্ড ফ্রান্স আমেরিকার মত বড় বড় রাষ্ট্রগুলিকে অহিংসা নীতি গ্রহণ করতে না বলে তার চেয়ে দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে কেন বললেন। এই সব সমালোচনার জবাবে গান্ধীজী তাঁর প্রবন্ধে (*Harijan*, **November 12, '38**) যা বললেন তার মর্মার্থ ছিল এই :

"যদি এইসব সমালোচক পুনরায় আমার প্রবন্ধ পাঠ করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, ভীরুতার জন্যই আমি বড় বড় শক্তিগুলিকে এটা গ্রহণ করতে বলি নি। তা-ছাড়া আরও একটা কারণ আছে, যে জন্যে এঁদের সম্পর্কে বলা হয় নি। তাঁরা দুরবস্থায় পড়েন নি, তার জন্য তাঁদের কোন দাওয়াইয়েরও আবশ্যক হয় নি। তাঁরা চেকোস্লোভাকিয়ার মত অসহায়ও নন। চেকোস্লোভাকিয়ার মত তাঁদের অস্তিত্বও বিলোপ হতে বসে নি। সুতরাং বড় বড় শক্তিগুলির কাছে আবেদন করা চলে তা নিষ্ফলই হত এবং সে আবেদনের কোন প্রয়োজনও ছিল না। অভিজ্ঞতার থেকেই আমি এটা উপলব্ধি করেছিলাম যে, সাধারণত মানুষ প্রয়োজনে খুব কমই সভতা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে প্রয়োজনের চাপে মানুষ সভতা অবলম্বন করলে তাতে অন্যায় কিছু হয় না। যদি আপন প্রয়োজনে সে ভাল হয়, তবে তা তো ভালোই।

"চেকদিকে শান্তিপূর্ণভাবে জার্মানীর বিক্রমের কাছে আত্মসমর্পণ কিম্বা একা সংগ্রাম করবার ঝুঁকি নেওয়া—দুটোর মধ্যে যে-কোন একটাকে বেছে নিতে হবে। যদি চেক জাতিকে একা যুদ্ধ করতে হত তবে তার ধ্বংস অনিবার্য ছিল। এই সংকটজনক মুহূর্তে আমার পক্ষ থেকে আর একটা দিক জানিয়ে দেওয়া আমি প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। ঠিক এই রকম অবস্থায় এই নীতির কার্যকারিতাও প্রমাণিত হত। আমার মতে, চেকদের কাছে আমি যে আবেদন জানিয়েছিলাম, তা ঠিকই হয়েছে। বড় বড় শক্তিগুলির কাছে আবেদন করা হলে তা ঠিক হত না। যখন ভারতে অহিংসা নীতি সাফল্যমণ্ডিত হয় নি, বিশেষত যখন আমি কংগ্রেস-সেবীদেরই অহিংসা নীতি গ্রহণ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছি, ঠিক সেই সময় নিজের নির্দিষ্ট সীমা বা এক্তিয়ার ছাড়িয়ে পাশ্চাত্য জাতিগুলি সম্পর্কে বলবার অধিকার আমার আছে কিনা, তা আমার সমালোচকরা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। বস্তুত কংগ্রেস সম্পর্কে বর্তমানে আমি চিন্তা করছি এবং আমার একটা সীমাও আছে। কিন্তু যখন আমি ঐ প্রবন্ধ লিখি, তখন অহিংসা নীতির সাফল্য সম্পর্কে আমার দৃঢ় আস্থা ছিল এবং আমি মনে করেছিলাম, চেক জাতির ভীষণ দুর্যোগের দিনে যদি আমি অহিংসা নীতি গ্রহণের জন্য না বলি, তবে আমার পক্ষে তা কাপুরুষোচিত হবে। যা একটা উচ্ছৃঙ্খল ও সমবেতভাবে নির্যাতন ভোগ করবার পক্ষে অনভ্যস্ত কোটি কোটি মানুষের পক্ষে অসম্ভব হতে পারে, তা সুশৃঙ্খল ও একযোগে নির্যাতন ভোগের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জাতির পক্ষে সম্ভব হবে। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন জাতি যে অহিংসা নীতি গ্রহণ করতে পারে

না, তা আমি মনে করি না। তবে আমি বলি যে, অহিংসার দ্বারা স্বাধীনতা পুনরর্জনের পক্ষে ভারতবাসীই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জাতি বলে আমার বিশ্বাস ছিল এবং এখনও এই বিশ্বাসই আছে। যদিও লক্ষণ প্রতিকূল দেখা যাচ্ছে, তবুও যে জনগণকে আমি কংগ্রেসের থেকেও বড় বলে মনে করি, তারা অহিংসা নীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে বলে আমার আশা আছে। এই নীতি গ্রহণের জন্য জগতের সকল জাতি থেকে তারাই বেশী উৎসুক। কিন্তু যখন অবিলম্বে প্রয়োগের প্রশ্ন দেখা দিল, তখন তা চেক্‌দের কাছে উপস্থিত না করে আমি থাকতে পারিনি।

"বড় বড় রাষ্ট্রগুলি এটা গ্রহণ করতে পারেন ও তা গ্রহণ করে গৌরবান্বিত এবং ভবিষ্যত বংশধরদেরও কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। যদি তাঁরা ধ্বংসের ভয় ত্যাগ করতে পারেন, যদি তাঁরা নিরস্ত্র হতে পারেন তবে তাঁরা অন্যান্যদের মানসিক সুস্থতাও আনতে পারেন। কিন্তু এইসব বড় বড় শক্তিগুলিকে সাম্রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ এবং বিশ্বের এই তথাকথিত অসভ্য বা অর্ধ-সভ্য জাতিগুলিকে শোষণ করা বন্ধ করতে হবে, আর তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীও পরিবর্তন করতে হবে। এর অর্থ পূর্ণ বিপ্লব। বড় বড় রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে যে পথে চলছে, বললেই তা থেকে অন্য পথে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতীতেও বহু বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছে, বর্তমান যুগেও তা ঘটতে পারে। অন্যায় দূরীকরণে ভগবানের ক্ষমতাসীমা নির্দেশ করা কার সাধ্য? একটা কথা ঠিকই, যদি অস্ত্রসজ্জার জন্য এইরকম উন্মত্ততা চলতে থাকে, তবে তার ফল হবে, ইতিহাসে অভূতপূর্ব নরমেধ যজ্ঞ। এর পরও যদি কেউ জয়ী থাকে, তবে সে জয়ের পর তার বাঁচা-মরা সমানই। সর্বতোভাবে অহিংসা নীতি গ্রহণ ছাড়া আসন্ন ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি পাবার অন্য কোন উপায় নেই। গণতন্ত্র এবং হিংসানীতি এক সঙ্গে চলতে পারে না। বর্তমানে যেসব রাষ্ট্রে নামে মাত্র গণতন্ত্র আছে তাদিগকে হয় খোলাখুলিভাবেই ফ্যাসিস্ত হতে হবে, নতুবা যদি তাদিগকে সত্যিকারের গণতন্ত্রী হতে হয়, তবে সাহসের সঙ্গে অহিংসানীতি গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবেই শুধু অহিংসা নীতি গ্রহণ করা যায়, কিন্তু ব্যক্তির সমষ্টি যে জাতি, তা কখনও অহিংসা নীতি গ্রহণ করতে পারে না, এটা বলা নেহাৎ অন্যায়।"

বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর এই আদর্শ ও নীতিকে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থী নেতারা গ্রহণ করতে পারেননি। গান্ধীজীর এই অহিংস আন্তর্জাতিক নীতিকে এক মহান ভাবুকের অবাস্তব স্বপ্ন-কল্পনা বলেই তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন। ফ্যাসিস্ত

এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তরের বা স্বভাবের কিংবা চরিত্রের কোন পরিবর্তনই হবে না, এটা তাঁরা স্থির বিশ্বাস করতেন। মিউনিক প্যাক্টের পরই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বামপন্থীরা ইংরেজের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। যুদ্ধ যে অনিবার্য এবং ইংরেজরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন প্রতিশ্রুতিই দেবে না এটাও তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন। এবং সেটা ধরে নিয়েই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য তাঁরা অধীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু গান্ধীজী ও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা তা চাইছিলেন না। তা ছাড়া অন্যান্য আদর্শ ও নীতিগত প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ-সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। তার ফল কি হল, যথাস্থানে তা বিস্তারিত আলোচিত হবে।*

বলা বাহুল্য, 'মিউনিক প্যাক্ট' ও ইঙ্গ-ফরাসী প্রমুখ 'লীগ অব নেশনস্'-এর পাণ্ডাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্যন্তও ভুলতে পারেন নি। বারে বারে তিনি তাদের এই ঘৃণ্য ফ্যাসিস্ত তোষণ নীতির এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি তাদের এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন। এটা হলো একটা দিক, অপর দিকে আবিসিনিয়া, স্পেন, চীন, অষ্ট্রিয়া, চেক, ও পোলদের ফ্যাসি-বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বারবার অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে তিনি তাদের জয়কামনা করেছেন। এখানে 'হিংসা-অহিংসার' প্রশ্ন এসে কোনোদিন তাঁর পথ আটকায় নি,—যা গান্ধীজীর বেলায় ঘটেছিল।

জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের পর মহাযুদ্ধ যখন সত্যিই বাধলো (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯), —যখন ইংরেজ ও ফরাসীরা বাধ্য হয়ে জার্মান আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করল, তখন কবি 'মিত্রশক্তি'র এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। তার কারণ ফ্যাসিস্ত ও নাৎসীদের পৈশাচিক বর্বরতা তাঁর কাছে ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বহুকাল আগেই বৃটেন ও ফ্রান্সকে তিনি এই ভূমিকাতেই দেখতে চেয়েছিলেন—অর্থাৎ যুদ্ধ যাতে সত্যিকারের এবং ফলপ্রসূভাবে ফ্যাসি-বিরোধী রূপ নেয়, এইটিই ছিল কবির আন্তরিক ইচ্ছা। শুধু তাইই নয়, ফ্যাসিস্ত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য

* বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রসদন' থেকে চিঠিপত্র ও তথ্যাবলি নেওয়া হয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কর্তৃপক্ষ পুরানো পত্রিকার ফাইলগুলি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন।—লেখক

নেপাল মজুমদার

দেশে জনগণের ব্যাপক অস্ত্রচালনা ও সামরিক শিক্ষার জন্ত, বিশেষ করে বাংলা দেশের জন্ত তার নিজস্ব একটি পৌরসেনা বিভাগ (Militia) গঠনের দাবী জানিয়ে (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ ॥ *Hindusthan Standard*, Sept 9, 1939) কবি গ্রেট ব্রিটেনের উদ্দেশে বাংলার বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে এক যুক্ত আবেদন-বিবৃতি প্রকাশ করলেন (দ্রঃ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৬ ॥ পৃঃ ৮৬৩-৬৪)। মহাযুদ্ধ শুরু হলে কবির মানসিক যন্ত্রণা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত যে কী অসহ্য ও নিদারুণ হয়েছিল, তা তাঁর এই কালের রচনা, চিঠিপত্র, বিবৃতি, বক্তৃতা-ভাষণ ইত্যাদি পাঠ করলে জানা যায়।

অবশ্য যুদ্ধে সক্রিয় সাহায্যদান ও সহযোগিতার প্রশ্নে কবির মনে অনেক প্রশ্ন অনেক চিন্তা, সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মন ক্লিষ্ট ও ভাবাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যুদ্ধ শুরু হবার কয়েক দিন পর কবি তাঁর মানসিক যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা ব্যক্ত করে এক খোলা চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন (মংপু, ২০শে সেপ্টেম্বর, '৩৯) :

"এ যেন বিশ্বজুড়ে একটা দুঃস্বপ্ন। চোখের সামনে মানুষের ভদ্রনীতির মূল কাঠামোটা দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রকম তেড়েবেঁকে যাচ্ছে।.... মারের ঘূর্ণিপাক চলেছে, অস্ত্রের পিছনে অস্ত্র, চলেছে অন্তহীন গণিতের পথে, এ থামবে কোথায়? · ·

"আমাকে তোমরা বলছ কিছু লিখতে, কোন পক্ষের মনের মত কথা বলি ভেবে পাই নে। ··· ভাগ্য অনুকূল হ'লে ইতিহাসের চতুরঙ্গে আমরা হতে পারতুম খেলোয়াড়, কিন্তু হয়েছি বড়ে। স্বাতন্ত্র্য খুইয়েছি শনৈঃ শনৈঃ, আজ ধর্মের নামেই হোক অধর্মের নামেই হোক, বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে যাব এ কোন পঙ্গুতা নিয়ে? অঘাসুরকে ঠেকাবার ভঙ্গী করতে পারি যেমন ভঙ্গী করেছিল বকাসুরকে মারবার জন্যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের শিশুপুত্রটি কাঠি হাতে নিয়ে, তার চেয়ে তোমরা যাকে বলো এস্কেপিজম্, আমার সেই কবিত্বই ভালো। দেখলুম দূরে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহাসাম্রাজ্য শক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বার বার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সিংহাসন ছায়ায় কখনো ঘটেনি। দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকার চিত্তে এবিসিনিয়াকে ইটালির হাঁ-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখলে, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জার্মানির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোস্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন্-ইন্টারভেনশানের কুটিল প্রণালীতে

স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে, দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ ক'রে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তো কিছুই হোলো না—পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ ক'রে তুলে আজ নামতে হোলো দারুণ যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্কপ্রলেপ আর সহ্য হয় না। কিন্তু সব চেয়ে বেদনা পাই চীনের জন্যে, কেননা সাম্রাজ্যিকদের অফুরন্ত অর্থ আছে, সামর্থ আছে, আর সহায়শূন্য চীন লড়ছে প্রায় শূন্য হাতে, কেবল তার নির্ভীক বীর্যে ভর করে।"

[প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪৬ ॥ পৃ: ৮৭-৮৮]

মহাযুদ্ধে কেন তিনি 'মিত্রপক্ষে'র জয়কামনা করছিলেন, এর থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'মিত্রপক্ষ' এবং তার প্রতিরোধ-যুদ্ধ সম্পর্কে কবির এতটুকুও মোহ ছিল না। তাছাড়া কবি সাম্রাজ্যবাদীদের—বিশেষ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিশ্রুতিতে আদৌ বিশ্বাস করতেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা তাঁর বার বার মনে আসে। কয়েক দিন পর কবি তাঁর মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত করে মংপু থেকে আর একখানি খোলাচিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন (৫ই নভেম্বর, '৩৯):

"এবার যুদ্ধের বান ডেকে এসেছে, প্রলয়ের ঝোড়ো হাওয়া লেগেছে হিংস্র-শক্তির হাজার হাজার পালের উপর। যে পক্ষই হোক উপস্থিতমতো একটা ফল পাবে যাকে সে বলে জিত। তার পরে চলবে সেই কাঁটাগাছের চাষ যা মনুষ্যত্বকে বিকৃত করবার জন্যে। সেই জন্যেই বলি, এ-পক্ষেরই হোক আর ও-পক্ষেরই হোক, জয়কামনা করব কার। জয় যে হিংস্রশক্তির।

"আমি পোলিটিশান নই। যাঁরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতা তাঁরা কল্পনা করছেন যুদ্ধে যদি রাজশক্তির সহায়তা করি তা হলে বরলাভ করব। এই যে সহায়তার সম্বন্ধ এটা দরকষাকষির হাটে। এটা আন্তরিক মৈত্রীর নয়, দীর্ঘকাল হয়ে গেল সেই সম্বন্ধ সাধনার অবকাশ এ দেশে আজ পর্যন্ত ঘটেনি। আমাদের পক্ষে শাসনকর্তাদের বিশ্বাসপরতা অনুভব করিনি, অনুভব করেছি সন্দিগ্ধ শক্তির কটাক্ষপাত। যুদ্ধের যখন অবসান হবে তখন শক্তির জয় হবে মৈত্রীর নয়। শক্তির পক্ষে কৃতজ্ঞতা একটা বোঝা, তাকে স্বীকার করার দ্বারা যে নম্রতা এবং

দায়িত্ববোধ আনে সেটা তার স্বভাবের পক্ষে পীড়াজনক। গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার পরিচয় পেয়েছে। ঠিক যে সময়টাতে হিসাব-নিকাশের অবকাশ এসেছিল ঠিক সেই সময়টাতেই প্রভূত পরিমাণে ঘনিয়ে এল বেত চাবুক জেল জরিমানা গোরাগুর্খা ও প্যুনিটিভ পুলিস।"

[প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ ॥ পৃ: ১৬৪-৬৭]

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে মিস্ র‍্যাথবোনকে লেখা খোলা চিঠিতে এবং 'সভ্যতার সংকট'-এ কবির এই মানসিক যন্ত্রণা ও ক্ষোভ আরও তীব্র আকারে প্রকাশ পায়। এ সব কথা আমরা অন্যত্র বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করেছি।*

সবশেষে আর একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। বাংলাদেশের মানুষ তাঁদের এই মহান জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণেই রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে স্মরণ করেছেন,—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত—এককথায় সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা সম্পূর্ণ নূতন করেই আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত তাঁদের আজ জাতীয় মুক্তিসংগীত—একথা আজ সারা পৃথিবী জেনেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক ভূমিকার কথা স্মরণ করলে তাঁরা আরো উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করবেন একথা উল্লেখ করাই বাহুল্য বোধ করি। কেননা কবি সারাজীবনই উৎপীড়িত ও নির্যাতিত দেশের পক্ষে সংগ্রাম করেছেন। 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য'—এই সেন্টিমেন্ট তুলে নাগুচিও যেমন রবীন্দ্রনাথকে ভোলাতে পারেনি তেমনি জেনারেল ফ্রাঙ্কোও কোনো অজুহাতেই কবিকে ভোলাতে পারেন নি। 'জাতীয় আত্মস্বাতন্ত্র্য' ও দেশের জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে কবি সব সময়ই সমর্থন করে এসেছেন। সেদিন স্পেন ও চীনের ক্ষেত্রে কবির এই ভূমিকার কথা স্মরণ করলেই স্পষ্ট হবে, কবি জীবিত থাকলে বাংলাদেশের সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি কি ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মানবিক দিক থেকে—সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে, এমন কি রাজনীতির দিক থেকেও তিনি যে একে সম্পূর্ণ সমর্থন করতেন, একথা আজ সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

* এ সম্পর্কে লেখকের অচিরে প্রকাশিতব্য "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করা হয়েছে।

সংগ্রামী বাংলাদেশে রবীন্দ্রমূল্যবোধ

রণেশ দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যময় উপস্থিতিকে দ্বন্দ্বাত্মক বস্তু-গতিবাদী দর্শনের চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা না করলে তাকে আর যাই হোক প্রাণবন্ত করে বোঝা যাবে না। বাংলাদেশ তার সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিকে রক্ষা করার জন্যেও প্রাণান্তকর লড়াই করেছে। সে উপস্থিতি যদি এমন কতকগুলি সামগ্রিক মূল্যবোধে সঞ্চারিত হয়ে না থাকে যেগুলি কায়িক মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে স্বাধীনতা কিংবা সমাজ-বিপ্লবের এসপার ওসপার হেস্তনেস্তর সংগ্রামে তাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে চলাও মুশকিল হবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের ওঠানামার টালমাটালে কোন কোন সময়ে আনুষ্ঠানিক উপস্থিতিকেও ধরে রাখা কঠিন হয়েছে। বিশেষ করে, উনিশ শ' একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের পোড়ামাটি থেকে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিকে উদ্ধার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে যদি মুক্তিসংগ্রামের সৈনিকদের নিজেদের হাতে জ্বালানো যে অগ্নিশিখাগুলিতে পোড় খেয়ে সোনার বাংলার আসল সোনা কোটি-কোটি মেহনতী মানুষ নতুন জীবনের ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথকেও পোড়খাওয়া রাসায়নিক উপাদান হিসেবে না দেখতে পাওয়া যায়।

'সংগ্রামী বাংলাদেশে রবীন্দ্রমূল্যবোধ' সম্পর্কিত বিষয়টির বিচারে অগ্রসর হতে গেলে দেখা দরকার, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নির্দিষ্টভাবে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতি এতে রসদ জুগিয়ে এসেছে। এ রসদগুলি কি ক্ষণিক? না, দূরপ্রসারী? বাংলাদেশের মানুষ পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনীয় রাসায়নিকতার তাগিদে আত্মিক ও বস্তুগত উভয় দিক দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে আপন করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে এবং গণজীবনের দৈনন্দিন বিন্যাসে সুর ও সঙ্গীতের বৈপ্লবিক দেশাত্মক ভূমিকাকে বড় করেই চোখের সামনে রাখতে হবে এবং সেদিক দিয়ে বিশেষ করে বাংলার নিজস্ব সুর ও সঙ্গীতের অক্লান্ত সাধক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যেন নদীমাতৃক বাংলাদেশের অদৃশ্য নদী একটি। তবু রবীন্দ্রনাথকে

নিয়ে সংগ্রামের দৃশ্যমান ঘটনা ও হেতুগুলিকে নিছক শ্রদ্ধাবোধ অথবা নির্গলিত মুগ্ধমোহ থেকে বার করে বাজিয়ে নিতে হবে, বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি বুঝতে হলে। এদের নিম্নোক্ত ছ'টি সূত্রে উপস্থিত করা যেতে পারে :

(১) বাংলাদেশের যে নৈসর্গিক জগতে এর বাসিন্দারা লালিত, যে ষড়ঋতুর আসাযাওয়া এর বাসিন্দাদের আঙুলের কড়ে ধরা এবং যে নিসর্গের বোধ এদের শিরায়-শিরায় প্রবাহিত, রবীন্দ্রনাথের লেখায় সেই প্রকৃতি আর তার বিভিন্ন রাগরঙ্গ যেন 'থিরবিজুরী' যাকে ছোঁয়া মাত্রই প্রাণ পেয়ে চোখের সামনে বাংলাদেশের মায়ারূপ সৃষ্টি করে।

(২) রবীন্দ্রনাথের লেখায় রয়েছে সেই অবনত বঞ্চিত মানবমানবীর ছবি যারা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক শোভায় চিত্রার্পিতের মতো শতশত বছর ধরে, ধান কেটেছে, হাল টেনেছে, কিন্তু সোনার তরীতে নিজেরা নিজেদের ধানের সঙ্গে উঠতে পারেনি।

৩) বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী মানুষ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে যে, সামাজিক রাজনৈতিক অচলায়তনগুলিকে না ভাঙলে কিছুই গড়তে পারা যাবে না। এ ভাঙার ইচ্ছের পিছনে কাজ করেছে জীবনকে নতুন ভাবে গড়ার তাগিদ। এই কারণেই ভাঙার জেদের সঙ্গে রয়েছে আনন্দবোধ সুষমাবোধ শুভবোধ, যেগুলি থাকায় ভাঙাটাও একটা মূল্যবোধের কার্যকরী রূপ হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এধরনের সৃষ্টির সঙ্গে যখন যেখানে যতটুকু পরিচয় হয়েছে, তখন সেখানে তার হাজারগুণ প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী মানুষের মনে। রবীন্দ্রনাথের এধরনের সৃষ্টিতে ভাঙাগড়ার যারা কারিগর, তারা আর এ একালের সেই মেহনতী মানুষেরা যারা বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে ইতিমধ্যে নিজেদের ভূমিকাকে সামনে এনেছে এবং যারা মুক্তিসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ও মেহনতী মানুষের মুক্তির ছাপ রাখবে।

(৪) লোকগীতির দেশ বাংলাদেশ। আর, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান আর নাটকে লোকগীতির ছাঁচে ঢালা অজস্র কথা। অনায়াসেই একটা থেকে আরেকটায় যাওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্তটি সহজ, দ্বিতীয়োক্তটি পরিশীলিত। কিন্তু প্রাণের যোগ রয়েছে উভয়ের। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান বাংলাদেশের মানুষের মনে হাজার বছরের লোকগীতির আস্বাদকে জাগিয়ে দেয় নিজস্ব মূল্যবোধের আস্বাদ হিসেবে।

(৫) বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী মানুষের আত্মসত্তায় জাগরণ যে বাংলাভাষা সম্পর্কিত স্বচেতনায়, তার সেই ভাণ্ডার হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লেখা গান কবিতা নাটক ছোটগল্প যা উপরোক্ত স্বচেতনার মতোই নব নব দিগন্তের অভিযাত্রী।

(৬) বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে পর্যায়ে পর্যায়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা ধরেছে যারা তাদের অধিকাংশই তরুণ যুবা। এই শহীদ তরুণ যুবারা কাতরতাহীন মৃত্যু-বরণের মধ্য দিয়ে জনগণকে অবিশ্রান্তভাবে প্রেরণা দিয়ে এসেছে পশ্চিম পাকিস্তানের গণবিরোধী শাসকচক্রের দানবীয় ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। বিদ্রোহী যৌবনের প্রতিনিধিত্ব করেছে সংগ্রামী তরুণীরাও। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহ ছিল বাংলার আদর্শবাদে উৎসর্গিত তরুণতরুণীদের প্রতি এবং সে কারণে অজস্র ছবি বেরিয়ে এসেছে বিশেষ করে নাটকে মৃত্যুভেদী যৌবনের দীপ্তশিখায় এরা যেন সেই সব ভবিষ্যৎবাদী ছবি, যেগুলি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পরে বর্তমান হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা ওদের হাতে নিয়েই দেখে আরশি।

॥ ২ ॥

উপরোক্ত ছ'টি সূত্রকে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎবাদী ছবি চোখের সামনে রাখতে গেলে রবীন্দ্ররচনাসমীক্ষা কাজে আসবে নিশ্চয়। কোন্ কবিতা, কোন্ গান, কোন্ নাটক, কোন্ লেখার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত সূত্রগুলি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী মানুষের বৈপ্লবিক মূল্য-বোধের অস্থিমজ্জায় পরিণত? এসব প্রশ্নের জবাব বিশদ উদ্ধৃতি দিয়ে দাখিল করলে ভাল। কিন্তু এখানে বিশদ প্রমাণগুলির কার্যকারিতা নিয়ে কথা উঠতে পারে। কারণ, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের সুর ও বাণীর কাজগুলি জুড়িয়ে ওঠার ব্যাপারে ইশারাকেই অনেক সময় যথেষ্ট মনে হয়েছে। প্রত্যেকটি সূত্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা উচিত যেসব গ্রন্থের অথবা গ্রন্থাংশের, সেগুলির সঙ্গে বিশদ পরিচয়ের কোন সুযোগই পাওয়া যায়নি নিষেধ ও নির্যাতনের বেড়াজালে আবদ্ধ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজড়িত বাংলাদেশের জীবনের উপরোক্ত ছ'টি সূত্রই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রথিত হয়েছে গেরিলা পদ্ধতিতে।

উপরোক্ত রবীন্দ্র-অবস্থিতির ছ'টি সূত্রের পুঁথিগত অথবা বাণীগত ঝলক-ঝলক উপাদান নিম্নোক্ত রূপ :

(১) বাংলাদেশের নিসর্গের যে ছবিগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখাকে বাংলাদেশের গণজীবনের স্থায়ী এবং চলমান উপাদান করে তুলেছ, সেগুলিকে পাওয়া যাবে ছিন্নপত্র, সোনার তরী, ছোটগল্প প্রভৃতি গ্রন্থে। এই লেখাগুলি, এমন কি গীতাঞ্জলির অনেকাংশও বাংলাদেশের গড়াই-পদ্মা অঞ্চলের লেখা। যে ঔপনিবেশিক চক্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম করে আসছে, তারা রবীন্দ্রনাথকে বিদেশী বা পশ্চিম বঙ্গের কবি বলে অভিহিত করেছে এবং কবিকে কলকাতাবাসী অথবা বীরভূমের শান্তিনিকেতনবাসী বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছে তারা। কিন্তু গড়াই-পদ্মার তীরে তীরে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত লেখাগুলিতে শুধু ছবি হয়ে জেগে থাকেনি, মর্মরূপেও আধৃষ্টিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'ছিন্নপত্র' কিংবা 'সোনার তরী' পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য। এরা প্রাকৃতিক-স্বাদেশিক।

(২) বাংলাদেশের অবনত মানবমানবীরা যারা 'মুহূর্তে' মাথা তুলে দাঁড়াতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বারংবার ব্যর্থ বিদ্রোহের পরে চূড়ান্তভাবে নিগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যেই কি রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে' লিখে রেখে যান নি?

(৩) রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটক লিখেছিলেন কাদের জন্যে? কাদের জন্যে লিখেছিলেন 'রক্তকরবী'? জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙতে যাদের আফশোস নেই, সেই মেহনতী মানুষদের নাটকীয় ছবি এঁকেছিলেন কাদের কথা আন্দাজ করে? ভেঙে যারা গড়তে চায় তারা এমন নাটকীয়ভাবে বাংলাদেশেই তো বেরিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের গণনাটকীয়তার পরীক্ষানিরীক্ষাগুলিতে এবং বিশেষ করে বেপরোয়া সংলাপে রয়েছে পূব বাংলার সেই গণ বাংলা ভাষা, যা বাংলা ভাষা আন্দোলনে বাধন-মুক্ত হয়েছে।

(৪) রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরের গানগুলি পূব বাংলার সেই লোকগীতি যা হয়তো একটা গণবৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে।

(৫) রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা পরিচয়' পূর্ব বাংলার ২১শে ফেব্রুয়ারীর গণ বাংলাভাষা এবং নির্মীয়মাণ বাঙ্গালী জাতিসত্তায় মর্যাদা সম্পর্কিত মুক্তি-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতের একটি আগাম রূপরেখা নয় কি?

(৬) রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' আর 'মুক্তধারা' হচ্ছে সেই শহীদী নাটক যা ৫২ সালের পর থেকে পূর্ব বাংলার যুবাযুবতীর বুকের রক্তঢালা বৈপ্লবিক সংগ্রামের সত্য কাহিনীর ভবিষ্যদ্বাণী।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রাণবন্ত থাকা তাঁর সুর ও ছন্দ এবং বাণী আর বক্তব্যের প্রাণবন্ত থাকা। পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথের গতিময় অবস্থিতি আগামী দিনে রবীন্দ্র-রচনার অবাধ ও বিশদ চর্চার মধ্য দিয়ে অগণিত কলকণ্ঠের মতো মুখরিত করবে দশদিককে। আজ এদিক দিয়ে অনেকখানি অসম্পূর্ণতাই যাচাই-এর নামলে ধরা পড়বে। তবে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের বৈশিষ্ট্যই এই যে, খালি হাতেই চালিয়েছে এখানকার জনগণের অনেক লড়াই। রবীন্দ্রনাথের যৎকিঞ্চিৎ লেখা তাদের কাছে পাওয়া গিয়েছে; কিন্তু তা অকিঞ্চিৎকরতার সমস্যার সৃষ্টি করেনি: বাংলাদেশের গণমনের চাহিদার মুখরতা পুঁথিগত বাণী-রূপের বিকল্প হিসেবে কাজ করেছে মুক্তিসংগ্রামের মূল্যবোধের রূপায়ণে।

আর, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিতর্ক বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে কথার ঝড় বইয়ে দিয়েছে বারংবার। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ নামক উপাদানকে রসায়িত করা হয়েছে বিতর্কের এসিডে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে। সুতরাং এই উপাদানে খাদ থাকার কথা নয়। যা কালের চক্রে বাতিল হয়ে গিয়েছে তাকে নিয়ে মায়া করার অথবা কাঁদবার অবকাশ নেই এখানে। ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকচক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে বাংলাদেশের জনগণ যে রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করার জন্যে, তার মধ্যে জরাজীর্ণ অতীত বাণীর পোটলাপুটলি নিয়ে চলবার অবকাশ থাকে নি।

বিতর্কের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছিল প্রগতিবাদীদের নিজেদের মধ্যেই। 'রবীন্দ্রনাথ বিত্তশালী বুর্জোয়া, অতএব পরিত্যাজ্য'—এইটেই ছিল নিজেদের মধ্যে বিতর্কের এক পক্ষের রূঢ় ও নির্মম প্রস্তাব। 'রবীন্দ্রনাথ যদি বা বুর্জোয়া হয়ে থাকেন, তবু নিজেকে নিজের মধ্য থেকে ছাড়িয়ে জনগণের একজন হবার জন্যে প্রয়াস করেছিলেন তিনি'—এইটে ছিল প্রতিপক্ষের প্রতিপাদ্য। পূর্ব বাংলার পটভূমিকে সরিয়ে রেখে একটা দেশাতীত মানদণ্ডে রবীন্দ্রবিচারের চেষ্টা হয়েছিল। তবে এই দেশাতীত বিতর্কের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হওয়ার দিনে রবীন্দ্র-চর্চার সূত্রপাত। ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৯৪৯ সালে—জেলখানায় রাজবন্দীদের আসরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে। জনসাধারণ এ-বিতর্কের সামান্য আঁচ পেয়েছিল মাত্র। তবে গভীর মধ্যে যা সঞ্চিত হয়েছিল সেদিনকার বিতর্কের মন্থনে, তা পরবর্তীকালে চুইয়ে চুইয়ে পড়েছিল রবীন্দ্রজয়ন্তীর সান্ধ্য অনুষ্ঠান-গুলিতে, সাময়িকীর সম্পাদকীয় শ্রদ্ধা নিবেদনে গতানুগতিকের ব্যতিক্রম হিসেবে।

বিতর্কের দ্বিতীয় পর্যায়ে দুই পক্ষ ছিল দুই বিপরীত শিবির। একদিকে প্রতিক্রিয়া, আরেক দিকে প্রগতি। পূর্ববাংলাকে খুব বেশি রকম জড়িয়েই এই বিতর্কের পত্তন হয়েছিল ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে। প্রতিক্রিয়ার দণ্ডধারীরা রবীন্দ্রনাথকে প্রথমত বিদেশী বা পশ্চিমবঙ্গীয় ভারতীয় এবং দ্বিতীয়ত মুসলিমবিরোধী বলে অভিহিত করে বাংলায় অপাংক্তেয় বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল। প্রগতিবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের একান্ত আপনজন হিসেবে এবং মুসলিমপক্ষীয় হিসেবে দাখিল করেছিল। প্রতিক্রিয়াপন্থী তাত্ত্বিকরাই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণাদি দাখিল করার জন্যে তাদের ঝুলি ঝেড়ে দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে না পেরে শরণাপন্ন হয়েছিল সামরিক শাসনকর্তাদের। সামরিক শাসনকর্তারা হয়তো ব্যাপারটাকে জলসা হিসেবেই দেখেছিল। তারা ভেবেছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর উদ্যোক্তাদের সামরিক দফতরে ডেকে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের তহবিল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই উদ্যোক্তাদের হাতপা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে। কিন্তু সজ্ঞানে সোৎসাহেই শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হয়। জয়ী হয় প্রগতিবাদীদের যুক্তিগুলি। এই সব যুক্তির সূত্র ধরেই পূর্ব বাংলায় সর্বসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে জানবার বুঝবার এবং পড়বার একটা রেওয়াজ বা তাগিদ তৈরী হয়ে যায়।

এর মধ্যে পোশাকী ভাব ছিল না বলা চলে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই প্রগতিবাদীদের যদি 'দরকার হলে রাস্তায় নামতে হবে' ধরনের মনোভাব না থাকতো, তাহলে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু সংখ্যক রবীন্দ্র-অনুরাগীর বইএর আলমারীতেই আটকা পড়তেন।

বিতর্কের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকচক্র পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-অবস্থিতির বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে দ্বিমুখী আক্রমণ চালানোর ফলে। প্রথমত, সামরিক শাসকচক্র ঢাকা বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেয় পাক-ভারত যুদ্ধকে অছিলা করে পাক-ভারত যুদ্ধ থেমে যাবার পরেও। দ্বিতীয়ত, সামরিক শাসকচক্রের ইঙ্গিতে বুদ্ধিজীবীদের একটি সংরক্ষিত দল রবীন্দ্রনাথকে দ্বিতীয়বারের মতো বিদেশী এবং মুসলিমবিরোধী বলে আক্রমণ করে। এটা ছিল রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক উদ্যোগ আয়োজন থেকে বিতাড়িত করার প্রয়াস। ঢাকা বেতারে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে আসছিল তা বিশুদ্ধ গীতিকবিতাই অধিকাংশ। তবু তা বাংলা এবং একান্তভাবেই বাংলা। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় বেতারে হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারকে নিরঙ্কুশ করার জন্যেই রবীন্দ্র-

সঙ্গীত বর্জিত হয়েছিল। কাজী নজরুল ইসলামের গানকেও খর্ব করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন থেকে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতিকে বিতাড়িত করার জন্যে সামরিক শাসনকর্তারা লোক লাগালো কেন? এর কারণ, বাঙ্গালী জাতিসত্তা একটা নতুন সাজে সাজতে শুরু করেছিল ১৯৬৬ সাল থেকে। এবার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিশেষ করে বাঙ্গালী জাতিসত্তাকে ভিত্তি করে ধূমায়িত বিদ্রোহের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বের সমস্ত রকমের প্রচারের জাল ছিঁড়ে ফেলে ১৯৬৬-৬৭ সালে। এ বিদ্রোহ মোটেই ভারতপক্ষীয় কিংবা এমন কি পশ্চিমবঙ্গপক্ষীয় ছিল না। বাংলাদেশের বাঙ্গালী জাতিসত্তার বিদ্রোহ এ সময়ে আন্তর্পাকিস্তানী হওয়ার ফলেই পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্রের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এতে সিন্ধী, পাখতুন এবং বেলুচরাও নিজ নিজ বিদ্রোহী জাতিসত্তায় বিপ্লবাত্মক বেগ অনুভব করে। সামরিক শাসকচক্রের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবার লক্ষণগুলি পূর্বের তুলনায় আরও বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সামরিক শাসকচক্র এই বিদ্রোহ-গুলিকে দমন করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে।

সামরিক শাসকেরা যারা সঙ্গীতকে গানের গতানুগতিক সামন্তবাদী বা বুর্জোয়া-অবক্ষয়ী-জলসা থেকে পৃথক করে দেখতে শেখেনি এবং এই কারণেই যারা ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর উদ্যোক্তাদের ধমক দিয়েই কাজ হবে বলে মনে করেছিল, তারা এবার দেখতে পায়, যে সব প্রাণোপকরণ বৈপ্লবিক বাঙ্গালী জাতি-সত্তার শক্তি স্বরূপ, তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। তারা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ঘেঁটে তার মধ্যে ধ্বংসাত্মক উপাদান আবিষ্কার করে বসেছে এবং এ-কারণেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বেসামালভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে—ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়। যে বৈপ্লবিক বাঙ্গালী জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বেই সম্ভব এবং যে জাতিসত্তা ১৯৫২ সালের পর থেকে পর্যায়ে পর্যায়ে গণ অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে মেহনতী মানুষের গণসত্তা অর্জন করেছে, তার প্রাণোপকরণগুলিকে নির্দিষ্ট করতে গিয়েই তারা অন্যতম উপকরণ হিসেবে পেয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। এই সময় থেকেই বাঙ্গালী গণজাতিসত্তার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র যে অঘোষিত যুদ্ধের আয়োজন করে, তারই অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্র-বিরোধিতা নিদারুণ তীব্রতা আর আকস্মিকতা নিয়ে ফেটে পড়ে।

স্বভাবতই তৃতীয় পর্যায়ের রবীন্দ্রবিতর্কে দ্বিতীয় বারের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণ আরও প্রসারিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের গণবিরোধী সামরিক শাসক-

চক্রের প্রচারণার বিরুদ্ধে নিজেদের মনকে তৈরী করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে এবং বাঙ্গালী জাতিসত্তার গণস্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যবোধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ পূর্বের তুলনায় আরও বেশি প্রয়োজনীয় উপকরণ হয়ে ওঠেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের যে বৈপ্লবিক দিনগুলিতে পূর্ব বাংলা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রূপে জন্ম নেয়, সে দিনগুলির বিভিন্ন সঙ্গীত-গণসমাবেশে রবীন্দ্রনাথের বহুদিন আগে লেখা কবিতা ও গান লক্ষ জনের মনের কথা হয়ে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসে যেন। এখানে প্রমাণিত হয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় একটা ভবিষ্যৎ-বাণী দিক আছে যা একাত্তর সালের বাংলাদেশের গণ-জীবনের বর্তমানী এবং আগামী দিনে গণ বাঙ্গালী জাতিসত্তার উন্মোচনে এবং বিকাশে বর্তমান হবে।

রবীন্দ্রনাথের লেখার যে সব উপাদান এই ঘটনার মূলে রয়েছে, সেগুলি হয়তো প্রদত্ত ছ'টি সূত্রে কুলোতে না-ও পারে। প্রয়োজন পড়বে ছ'টি সূত্রের মধ্যে আরও দৃষ্টান্ত যোগ করার এবং প্রয়োজন পড়বে সপ্তম সূত্রের।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি

সুনীল মুখোপাধ্যায়

মানব সমাজ-বিকাশের ধারা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই একই কালে নানাস্তরের সমাজ ও সংস্কৃতি পাশাপাশি অবস্থান করছে। এই বিভিন্ন স্তরের সামাজিক বিকাশের মধ্যে উচ্চতার অসমতা কত বেশি হতে পারে, তা আমরা বুঝতে পারি, যখন দেখি এর এক প্রান্তে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে আদি অকৃত্রিম জনসমাজ, অপর প্রান্তে হিমালয়ের উত্তুঙ্গতা নিয়ে আধুনিককালের কৃত্রিম যন্ত্র-সমাজ। সমাজ-বিজ্ঞানীর ভাষায় যাকে বলে folk-sophisticate polarity অর্থাৎ প্রাকৃত জনসমাজ ও যান্ত্রিক জনসমাজের মেরুর ব্যবধান, সেটাই তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ প্রাকৃত জনসমাজ ও আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সমাজ, এ দুইয়ের চারিত্র্য এতই পৃথক যে এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে বলেই মনে হয় না। একের বন্ধন জৈবিক, অপরের যান্ত্রিক, জনসংস্কৃতি এই জৈবিক জনগোষ্ঠীরই সংস্কৃতি। গোষ্ঠীভুক্ত সকলের প্রত্যক্ষ মানবিক সম্পর্ক, আত্মিক সংযোগ ও গভীর আন্তরিকতার মধ্যে নিহিত থাকে এর প্রাণরহস্য। পরিধি এর স্বভাবতই সংকীর্ণ; কিন্তু প্রাণশক্তি প্রাকৃতিক প্রস্রবণের মতন চিরপ্রবহমান। মানব বিজ্ঞানী ক্রোবার (A L Kroeber)-এর মতে :

> "The relatively small range of their culture-content, the close knitness of the participation in it, the very limitation of scope, all make for a sharpness of patterns in the culture, which are well-characterised, consistent and inter-related."[১]

অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক-উপকরণের অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়ত পরিধিতে সমষ্টিগত ভাবনাবৃত্তে বিচরণশীল বলে এবং এর প্রসারণ-ক্ষেত্র নিতান্ত সংকুচিত বলেই জনসংস্কৃতির রূপ সকল দেশেই অতি সুচিহ্নিত, সুসঙ্গত ও সুসংবদ্ধ হতে দেখা যায়। কথাটা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

১. A. L. Kroeber : Anthropology, London, 1948, p. 281, footnote 288.

বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম দেখি না। এখানে তার আদি অকৃত্রিম রূপ নানা কারণে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। যন্ত্রযুগের প্রবর্তনার পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনসংস্কৃতির চারিত্র্যও অক্ষুণ্ন ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যন্ত্র-লালিত নাগরিক-সভ্যতার তরঙ্গাভিঘাতে সে-সব দেশের গ্রামীণ-জীবন বিধ্বস্ত হতেই, গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারাটি আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল। বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি এ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি তার দীর্ঘকাল পরেও। কারণ এদেশে যন্ত্রযুগের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে, উনিশ শতকের প্রায় অন্তিম লগ্নে। তারপর যন্ত্রযুগের প্রবর্তনায় যে নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তাও বহুদিন নিছক নগর-কেন্দ্রিকই থেকে গিয়েছিল। তার তরঙ্গাভিঘাত এত মৃদু গতিতে গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছিল যে গ্রামীণ জনসংস্কৃতির ধারাটিকে সহসা কলুষিত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। অবশ্য ভিন্নতর কিছু কারণও এর পিছনে কাজ করেছিল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশের আনুকূল্যে সেখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'জাতি-বর্ণ ধর্ম চক্রগত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তবন্ধন' বহু শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, তা এতই দৃঢ়মূল ছিল যে বাইরের কোন আঘাত বা আকর্ষণ তাকে সহসা কেন্দ্রচ্যুত করতে পারে নি। বহির্বিশ্বের সাথে প্রত্যক্ষ যোগ-বিবর্জিত ছিল বলে এক ধরনের কূপমণ্ডুকতা তার স্বভাবগত হয়ে পড়েছিল। এই কূপমণ্ডুকতা, যা এক ধরনের প্রচণ্ড সংরক্ষণশীলতা, তাকে চিরকাল কেন্দ্রাভিমুখী করে রেখেছিল, কেন্দ্রাতিগ হতে দেয় নি। বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির দীর্ঘস্থায়িত্বের মূলে কাজ করেছে এমনি নানা সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ। তাই তো দেখি বিশ-শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকেও এতে কোন মারাত্মক ভাঙন দেখা দেয় নি। তবে প্রথম মহাযুদ্ধপরবর্তীকালে এক্ষেত্রে বহু অপেক্ষিত পরিবর্তন-সম্ভাবনাকে আর রোধ করা সম্ভব হয় নি। যুদ্ধের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূত্র ধরে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিক্ষোভ জাতীয় মনে সঞ্চারিত হয়েছিল তাই পরবর্তী দশকগুলোতে অস্থির পরিবর্তন-কামনায় রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়েছিল আমাদের সামাজিক অচলায়তনের উপর। ফলে অচল, অনড় গ্রাম্য-সমাজ-কাঠামোর ভিত নড়ে উঠেছিল। কালের ইঙ্গিতেই যেন যন্ত্রযুগের দোসর 'নবযুগের নগরের ভূত' ও 'কারখানার ব্রহ্মদৈত্য' গ্রাম বাংলার কাঁধে ভর করতে শুরু করল। ফলে বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির ধারাটি আর নিষ্কলুষ রইল না, তা ক্রম-বিশীর্ণ হয়ে আপন মহিমা হারাতে বসল। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এসে আমরা যখন দেখি এর উৎস শুষ্ক প্রায়, তখন তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না,

কারণ, বিলম্বিত হলেও, যন্ত্রযুগের ব্যাপক প্রসারের এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণাম।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন এমন এক কালে, যখন বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি ছিল অতিমাত্রায় প্রাণবন্ত ; সর্বগ্রাসী যান্ত্রিক নাগরিক সভ্যতা তখনও তেমন তৎপর হয়ে ওঠে নি, তার বৈভব কেড়ে নেওয়ার জন্য। গ্রামলক্ষ্মীর কাছ থেকে তার ঐশ্বর্য অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল ; আর সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হন নি তিনি। যৌবনে কার্যব্যপদেশে কলকাতার 'ইটকাকীর্ণ পরিবেশের বাইরে' বাংলাদেশের পাবনা, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী জেলার পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক সফরকালে তিনি দেশের জনসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ স্পর্শলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। বহুদিন পল্লীর সাদামাটা মানুষগুলোর মধ্যে বাস করে, তাদের জীবনগঙ্গায় নিভৃতে গাহন করে তিনি এর অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এ পরিচয় কবির শিল্পীজীবনের পক্ষে এক মহা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল পরবর্তীকালে। পল্লীর উদার মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ রুদ্ধশ্বাস শহুরে পরিবেশ থেকে বাইরে এনে তাঁকে দিয়েছিল মুক্তির এক নতুন স্বাদ ; পল্লীমানুষের ধ্যান, চিন্তা, অনুভব ও কর্মের জগতে তিনি পেলেন তাঁর শিল্পী-আত্মার জারক রস। মোটকথা গ্রামীণ জীবন তথা জনসংস্কৃতির সাথে এই অন্তরঙ্গ যোগ রবীন্দ্র-সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক জীবনমুক্তির পথকে নিশ্চিতরূপে প্রশস্ত করেছিল। রবীন্দ্র-প্রতিভা আজীবন পুষ্টি খুঁজে পেয়েছে এই জনসংস্কৃতির কাছ থেকে, শক্তিসঞ্চয় করেছে এর রসধারা থেকে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে বিচিত্র বর্ণালির সঞ্চারণে এর ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা রসিক-সমালোচকগণ নির্ভুলভাবেই নির্দেশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

বস্তুতঃ জনসংস্কৃতির পথ ধরেই বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমাজের মনের অন্দর মহলে প্রবেশ করার তাগিদ রবীন্দ্রনাথ বোধ করেছিলেন, তাঁর শিল্প-সাহিত্য-সাধনার প্রায় ঊষা লগ্নেই। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে : যেকালে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই ছিলেন ইংরেজী-অভিমানী, মাতৃভাষার প্রতি বিরূপ এবং কতক পরিমাণে স্বজাতিদ্রোহীও বটে, ইউরোপীয় স্বাদেশিকতার মৌখিক বুলি কপ্‌চানোর মধ্যেই পর্যবসিত ছিল যাদের দেশপ্রেম, সমাজ-পারিপার্শ্বিকের দিক থেকে প্রায় তাদের অন্তর্গত হয়েও রবীন্দ্রনাথ কেমন করে গণ্ডী কাটিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের মনের অন্দর মহলে প্রবেশের তাগিদ আদৌ বোধ করতে পারলেন? এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর : রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি-প্রেম,

যে প্রেমের জন্ম হয়েছিল বৃহত্তর জনসমাজের মনে প্রবেশ লাভ করার শিল্পীসুলভ এক মহৎ মানবিক আকাঙ্ক্ষা থেকে, সেই স্বজাতি-প্রেমই কবিকে দিয়েছিল এই আন্তর-প্রেরণা। বস্তুতঃ জনসংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের উৎস ঐ স্বজাতি-প্রীতি। রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রীতির উন্মেষে, যে ঠাকুর পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন, সে-পরিবারের দান ছিল অপরিসীম। এই সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতিতে' তিনি বলেছেন :

"তখন শিক্ষিত লোকেরা দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন।"[২]

এ উক্তি থেকে এ সত্যই স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে যে পারিবারিক প্রভাবে আশৈশব রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার প্রতি যে অনুরাগ বোধ করেছিলেন, তাই তাঁকে স্বদেশ ও স্বজাতির কথাও ভাবতে শিখিয়েছিল। ঐজন্যই তিনি 'ইংরেজী-বাগীশ' বাঙালীর রচিত সাহিত্যের 'সুয়োরাণী' অপেক্ষা প্রকৃত দেশজ ভাব ও ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্যের 'দুয়োরাণী'কেই বেশি আপনার করে চিনতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে 'হিন্দুমেলা' সংগঠনের মধ্য দিয়েও এক ধরনের স্বাদেশিক চেতনা দেখা দিয়েছিল। অনেকটা তারই প্রেরণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন বাংলাদেশের ক্রমবিলীয়মান জনসংস্কৃতির লুপ্তরত্নোদ্ধারের কাজে। তারপর, অষ্টাদশ শতকে সুইডেনে লোকসংস্কৃতি চর্চার যে নতুন উদ্যম দেখা দিয়েছিল, ক্রমঃ-পরিপুষ্টির ধারায় তার ঢেউ উনিশ শতকেই ইংলণ্ড হয়ে আমাদের দেশেও পৌঁছয়। রবীন্দ্রনাথের মনে তারও কথঞ্চিৎ প্রভাব কাজ করলে, বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবে তার পূর্ব থেকেই ঠাকুর পরিবারে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার যে একটা উদার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তাই যে রবীন্দ্রনাথের জনসংস্কৃতিচর্চার মূলে বড় রকমের প্রেরণা যুগিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

এখন দেখা যাক, বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির প্রতি কবির আগ্রহ, তাঁর অনুভব ও কর্মে কতটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একথা অবশ্যই বলা বাহুল্য যে 'প্রাকৃত জনের ভাব ও ভাষার, কীর্তি ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ স্পর্শলাভের ব্যাকুলতা'ই তাঁকে জন-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এ আকর্ষণ যে একটা সাময়িক আবেগমাত্র ছিল না, তা এক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক কর্মোদ্যোগ থেকেই বুঝা যায়। তিনি দীর্ঘকাল ধরে একদিকে পুরাতাত্ত্বিক ও মানব-বিজ্ঞানীর ন্যায় বাংলার জনসংস্কৃতির নানা নিদর্শন

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনস্মৃতি, বিঃ সং, ১৩৬৩।

সংগ্রহ করেছেন, তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের প্রয়াস পেয়েছেন ; অপর দিকে ছড়া, ব্রতকথা, গ্রাম্যগাথা ও গানের ভাব-ভাষায় অনায়াস ব্যঞ্জনা, মাধুর্য ও সারল্য, ছন্দ ও সুরের অপরূপ সঙ্গতি, তার দেশীয় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় সত্তাকে নতুন যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির পাথেয় রূপে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে—সাহিত্য-সঙ্গীতে জাত লোকশিল্পীর যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায় তার উৎস এইখানে। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, জনসংস্কৃতি চর্চার এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। বাড়ীতে দাদাদের সস্নেহ সহযোগিতা তো পেয়েছেনই, বাইরেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশচন্দ্র সেন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন, জসীমউদ্‌দীন প্রভৃতি লোকসংস্কৃতি অনুরাগীদের বিভিন্ন সময়ে সহযাত্রী ও সাথীরূপে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় যেমন অনেকে এই পথে এসে-ছিলেন, অনেকে আবার হৃদযের আগ্রহেই কাজে নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এঁদের কারো কারো সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মত দার্শনিককে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে আকৃষ্ট করেছিলেন। মনে হয়, লোকশিল্পের প্রতি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের ব্যাপক আগ্রহের মূলেও কাজ করেছিল রবীন্দ্রনাথেরই প্রেরণা।

এক হিসেবে কিন্তু জনসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে একক‌ব্রতী বলা চলে। অধিকাংশ জনসংস্কৃতি-অনুরাগীর কর্ম-প্রচেষ্টা যেখানে লোকসাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহ ও সম্পাদনায় সীমাবদ্ধ, সেখানে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ মানব বিজ্ঞানীর ন্যায় তার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির সত্যিকার ইতিহাস অনুসন্ধানে তৎপর, সাহিত্য-রসিকের মত তার রসমাধুর্য-বিশ্লেষণে উৎসাহী, তার ভাষা ও ছন্দের, ভাব ও রসের প্রয়োগে নবযুগের বাংলা-সাহিত্যকে আরও সমুন্নতি ও ব্যাপ্তি দানে প্রয়াসী। সত্যের অনুরোধেই তাই বলতে হয় জনসংস্কৃতির চর্চায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে তুলনাহীন।

ঠিক কবে থেকে রবীন্দ্রনাথ জনসংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন, তা বলা কঠিন। তবে যতদূর জানা যায়, ১২৯০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে 'সংগীত সংগ্রহ' নামে বাউল গানের একটি সংকলন গ্রন্থের সমালোচনার মধ্য দিয়েই এক্ষেত্রে তাঁকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। বাউল গানের এই সমালোচনা-প্রচেষ্টা থেকে, এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে পূর্বাহ্ণেই তাঁর কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি

ছিল। "বাউলের গানগুলি তার উপর সোনার ফসলের বীজ ছড়িয়ে দিল।"[৩] শ্রীবিনয় ঘোষ এই সংগ্রহের

আমি কে তাই আমি জান্‌লেম না,
আমি আমি করি, কিন্তু আমি আমার ঠিক হইল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কই গণি—

গানটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, "গানটি রবীন্দ্র-চিন্তার বিশ্বমুখী অভিযানে নিভৃত নাবিকের কাজ করেছে।" উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুতঃ এই বাউল গানগুলোর মধ্য দিয়ে এক রহস্যময় জগতের দ্বার খুলে গিয়েছিল তাঁর কাছে। তিনি পেয়েছিলেন অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশের স্বর্ণসিঁড়ির সন্ধান। তাই অচিরেই যখন,

আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে—

গানটির মধ্যে উপনিষদের 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' বাণীকে বাউলের মুখে 'মনের মানুষ' বলে শুনলেন, তখন সে অভিজ্ঞতা অপরূপ হয়ে বেজে উঠেছিল তাঁর প্রাণে। অনন্তের সাথে মিলন ব্যাকুল সমগ্র মানবভাব কান্নাই যেন ব্যাঞ্জিত হয়ে ফিরছিল গানটির সহজ সরল সুরে। কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

"অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাকে সকলের চেয়ে জানবার তাকেই সকলের চেয়ে না জান্‌বার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু—তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে।"[৪]

বস্তুতঃ বাউল গানের সরণি ধরে অগ্রসর হয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-ব্যাপী অধ্যাত্ম-উৎকণ্ঠার অনেক সন্তোষজনক সমাধান সূত্র আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শন, তথা ধর্মচিন্তায় বাউল প্রভাবের সূত্রপাত এখানেই হয়। এই

৩ পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত : রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড, বিনয় ঘোষ রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোক সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃঃ ৬৮ দ্রষ্টব্য।

৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা।

বাউল গানের মধ্য দিয়েই তিনি জন-জনপদে বিরাজমান গ্রামসাহিত্যের ঐশ্বর্য সম্পর্কেও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন।

মোটকথা বাউল-সঙ্গীতের সাথে প্রাথমিক পরিচয় ব্যপদেশেই,° বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার বাসনা কবিচিত্তে জাগে। এরপর থেকেই আমরা কবিকে লোকসাহিত্যের নানা নিদর্শন সংগ্রহ ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে দেখি। ১৩০১ সালে 'সাধনা' পত্রিকায় দুই পর্যায়ে 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' সম্পর্কে একটি অতি সরস নিবন্ধ প্রকাশ করেন, প্রবন্ধের শেষে তিনি ৮১টি ছড়ার একটি সংগ্রহ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ১৩০১-২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তাঁর 'মেয়েলি ছড়া'র সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ১৩০২ সালে সাধনাতে প্রকাশিত হয় শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনারূপে লিখিত কবিসঙ্গীত নামে আর একটি প্রবন্ধ, তারপর 'গ্রাম্য সাহিত্য' শীর্ষক আরও একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এসব ছাড়া ১৩২২ সালের 'প্রবাসী'তে হারামণি বিভাগে তাঁর সংগৃহীত কুড়িটি লালনের গান প্রকাশিত হয়েছিল। সংগ্রহ ও সমালোচনা ছাড়া এই সময়ে তিনি জাতীয় চিত্তে লোকসাহিত্যের বাসনা সঞ্চারিত করে জাতিকে আপন যথার্থ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। লোকসাহিত্য সংগ্রহ কাজে অপরকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব যেমন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি একজন মানববিজ্ঞানীর ন্যায় জনসংস্কৃতির সাথে একালের শিক্ষিত জনগণের নিবিড় পরিচয় সাধনের জন্য জাতিবিদ্যা ও নৃবিদ্যার চর্চার আবশ্যকতার কথা তিনিই প্রথম দেশবাসীকে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৩১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'মেয়েলি ব্রত' ও দীনেন্দ্রকুমার রায় অঙ্কিত বাংলার পাল-পার্বণের উজ্জ্বল চিত্রগুলো রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁদের উৎসাহ দিতে তিনি যেমন কার্পণ্য বোধ করেন নি, তেমনি দ্বিধা করেন নি লোক-সাহিত্য সংগ্রহ কাজে অঘোরনাথের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ একজন মহৎ সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির মত এক্ষেত্রে আপনার যাবতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

লোকসাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহ, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সমালোচনাতেই যে রবীন্দ্রনাথের জনসংস্কৃতি-চর্চা সীমায়িত থাকে নি, একথা বোধ হয় অনেকেই

জানেন না। রবীন্দ্রনাথ এটা ভাল করেই জানতেন যে সকল সুসমৃদ্ধ জনসংস্কৃতিরই যেমন একটি ভাবগত ভিত্তি আছে, যার পরিচয় পাওয়া যায় লোকসাহিত্যে, তেমনি আছে একটা বস্তুগত ভিত্তি—যার প্রকাশ লোকশিল্পীর নানাবিধ শিল্পকর্মে সদা-প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির এই দিকটি সম্পর্কেও যে সক্রিয় চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সংবাদ পাই আমরা কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার প্রদত্ত বিবরণ থেকে। সে ১৯১৫-১৬ সালের কথা। শিলাইদহের পদ্মাবক্ষে কবির সাথে কিছুদিন কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। প্রসঙ্গক্রমে একদিন কবি তাঁকে কিছু লোকশিল্পের সংগ্রহ দেখিয়ে নাকি বলেছিলেন :

"আমি কিছুদিন যাবত একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি, বাংলার নিজস্ব আর্ট আইডিয়া ক্রমেই বিদেশী প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"[৫]

মোহিতলাল তারপর লিখেছেন :

"চাহিয়া দেখিলাম এক জায়গায় কয়েকটি মাটির ঘরের মডেল, তাহাদের খড়ের চালের বিবিধ ষ্টাইল লক্ষণীয়, বুঝিলাম, কবি, এ ঘর ছাওয়ার মধ্যেই যে শিল্পচাতুর্য আছে তাহাই বাঙালীর নিজস্ব বলিয়া গৌরব বোধ করেন। পাশেই কতকগুলি কাঁথা রহিয়াছে, তাহাদের সেই সূচীকর্ম সত্যই মহার্ঘ্য বলিয়া মনে হয়। স্মরণ হইতেছে, কতকগুলি শিকাও বোধ হয় ছিল, রজ্জুশিল্পের নিদর্শন বলিয়া তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—মোটা ব্রাউন পেপারের একটি তবক, সেগুলিতে আলিপনার নানা নকসা অতি সরল স্থুল রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এগুলির প্রতি কবির মমতা যেন কিছু অধিক, ইহাই বাংলার প্রকৃতিরূপা গৃহলক্ষ্মীদের স্বহস্ত-রচিত কারুসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাহাদের পরিকল্পনায় ফুল, লতা, পাতা, পাখী ও নানা নিত্যপরিচিত রূপাবলীর যে সুষমা-বিন্যাস, তাহাই সত্যকার শিল্পীমনের পরিচায়ক। সবচেয়ে মুগ্ধকর তাহাদের সেই অতি সরল ও সাবলীল রেখাঙ্কন—যেন শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ একেবারে মন হইতে অঙ্গুলি-প্রান্তে পৌঁছিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আলিপনা শিল্পকে ধরিয়া

৫. মোহিতলাল মজুমদার: রবি প্রদক্ষিণ, ১৩৫৬, 'পদ্মাবক্ষে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়, পৃঃ ১৭৪ ৫ দ্রষ্টব্য।

রাখিবার এই কৌশলটিও অভিনব বলিয়া মনে হইল—কবিপ্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ যেন তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।"[৬]

মোহিতলাল প্রদত্ত এ বিবরণ থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, লোক-সাহিত্যের স্থায় লোকশিল্পকর্মের নিদর্শন বা নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারেও কবির উদ্যমের অভাব ঘটে নি। তিনি নিজে যেমন এ-সংগ্রহ কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন, অন্যকেও তেমনি একাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত কবির চিঠির বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনা রত ডঃ দাশগুপ্তকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন, চাটগাঁ অঞ্চলের মেয়েলি শিল্পের নিদর্শনগুলো সংগ্রহ করতে, বিশেষ করে আল্পনা, শিকে, কাঁথা, কুঁড়ে ঘরের ফটো বা মডেল, মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজের নিদর্শন সংগ্রহের জন্য। ২৩ বছর বয়স থেকে ৫৪-৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত এইভাবে তিনি জনসংস্কৃতির বিচিত্র সৃষ্টিক্রিয়ার নিদর্শন সংগ্রহ করে, এর প্রতি আপনার তীব্র আকর্ষণ ও মমত্ববোধেরই পরিচয় দিয়েছেন।

লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ এবং সে সবের যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির সাথে যে নিবিড় অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন, তা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি-চেতনাকে অনেকটাই পরিপুষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যে বাংলাদেশের প্রাণের সাথে যে নিগূঢ় যোগের অনুভব লক্ষ্য করা যায়, বস্তুতঃ তার মূলে কাজ করেছে বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির সাথে তার ব্যাপক ও গভীর পরিচয়ের সূত্রটি। লোকসাহিত্যে বিম্বিত অনায়াস, স্বচ্ছন্দ গতি লোকজীবনের ছবি কবিকে বস্তুভার-মুক্ত জীবনের স্বস্তি ও মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে, লোককবির সহজ, সরল ও অকপট অধ্যাত্ম-ভাবনা, অধ্যাত্ম-জীবনে শ্রদ্ধাশীল কবিকে শাস্ত্রাচারের গণ্ডীর বাইরে মানব-সত্যকে সহজভাবে উপলব্ধি করার পথ দেখিয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অসীম-সঞ্চারী অনুভবের গাঢ়তায় লোকসঙ্গীতের অন্তর্গূঢ় ভাবানুভূতির ছায়াপাত ঘটেছে। লোকসঙ্গীতের সুরধারার মূর্ছনাও তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শোনা যায়। লোককাব্যের ছন্দ, লোকসঙ্গীতের রাগরাগিণী রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও ছন্দে নতুন তরঙ্গদোলা সৃষ্টি করেছে। সম্ভবত লোকশিল্পীর রেখাঙ্কন নৈপুণ্য কবির চিত্রকলার আঙ্গিকের

৬. মোহিতলাল মজুমদার: রবি প্রদক্ষিণ, ১৩৫৩: 'পদ্মাবক্ষে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়, পৃ ১৭৪-৫ দ্রষ্টব্য।

প্রেরণা যুগিয়েছে। শুধু কি তাই লোকসাহিত্যের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত বাংলা ভাষার শব্দলোকে প্রবেশ করে 'খাঁটি বাংলাভাষার যাদুকর স্রষ্টা' হতে পেরেছেন। এছাড়া লোকায়ত সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার অনুশীলনের মধ্য দিয়েই তিনি স্বদেশের লোকসমাজের প্রকৃত ইতিহাস জানতে শিখেছিলেন, একজন মানব বিজ্ঞানীর ন্যায়। রবীন্দ্রসাহিত্য যে বাংলাদেশের প্রাণের জিনিস হয়ে উঠতে পেরেছে, তা লোকজীবনের সাথে কবির গভীর ও ব্যাপক সংযোগের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির অনেক প্রবাহই এসে রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারায় মিলেছে সন্দেহ নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছে বোধ হয় বাংলাদেশের বাউল কবিরা। সর্ববন্ধনহীন, সংস্কার-প্রথা ও আচারের দাসত্ব হতে মুক্ত বাউল সাধকদের অধ্যাত্ম-সাধনা, মানবতাবাদী অধ্যাত্ম রস-পিপাসু রবীন্দ্রনাথের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই দেখি, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে বাউলপ্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। 'লোকমানসের প্রতিমূর্তি' বাউলের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁর কাব্য-সঙ্গীত, গল্প-উপন্যাস ও দার্শনিক প্রবন্ধের 'বিচিত্র ভাবরসের তরঙ্গশীর্ষে' বার বার। বাউল কবি তাঁর ধর্ম-দর্শন চিন্তার দিগ্‌দর্শনীতে অনেকটাই যেন পথ নির্দেশকের কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, 'মানবধর্ম', যার মূলকথা 'infinite defined in bumanity' তার সহজ ব্যাখ্যা বাউল কবির 'মনের মানুষে'র অনুধ্যানে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। তাই তো বাউল তাঁর আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। আর এই জন্যই বোধ হয় তাঁর সাহিত্যকর্মের যত্রতত্র এই বাউলকে উপস্থিত দেখতে পাই। 'গোরা' উপন্যাসে দেখতে পাই 'কাজের শহর কঠিন হৃদয়' কলকাতার রাস্তার ধারে আলখাল্লা-পরা বাউল উপস্থিত ; তার কণ্ঠে অন্তর ব্যাকুলকরা গান :

খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং 'ফাল্গুনীর' অন্ধ বাউলও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগী ও অন্ধ বাউলের নৃত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের জীবনের আনন্দের স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন। এই বাউলের স্মৃতিই মন্থন করে তিনি অন্যত্র বলেছেন :

"আমার মনে আছে তখন আমার নবীন বয়স—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

'কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে…'

কথাটা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।"[৭]

আবার শিলাইদহের পদ্মার তীরে বাউল সাধকদের একতারা হাতে চলার দৃশ্য অমর হয়ে আছে কবির কবিতায়—

"কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে
যে নদীর নেই কোন দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।"

বাউল দর্শনের যে জিনিসটা কবির সবচেয়ে ভাল লেগেছিল তা হচ্ছে তাদের "সমস্ত সামাজিক সংস্কার, বিধিনিষেধ, প্রথা, রীতিনীতির বাইরে একান্ত সহজ ভাবে রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের জন্য ব্যাকুলতা।"[৮] রবীন্দ্র দর্শনের মূল কথাও তাই। রবীন্দ্রনাথ পুলকিত হয়েছিলেন বাউল-চিন্তার সঙ্গে নিজস্ব দর্শনের ঘনিষ্ঠ মিল দেখে। তিনি আরও পুলকিত বোধ করেছিলেন এই ভেবে যে, জ্ঞানের কঠোর তপস্যার 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতায়া' পথে চলে উপনিষদের ঋষি যে সত্যে পৌঁছেছেন, বাউল কবিরা হৃদয়ের পথে অনায়াসে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। বেদ-উপনিষদ না পড়েও তাই তারা ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পেরেছে। বাংলাদেশের লোকায়ত ধর্মদর্শন এই বাউল দর্শন, লোকজীবনসমুত্থিত বলেই রবীন্দ্রনাথ একে 'The philosophy of the people'[৯] বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই লোকায়ত দর্শনের কাছে তাঁর ঋণ তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Religion of Man' শিরোনামায় প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতা-মালায়।[১০] বাউলের 'মনের মানুষ'-ই যে পরবর্তী কালে কবির কাব্যে রূপান্তরিত

৭ মহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা।
৮ শ্রীবিনয় ঘোষ : 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধ, রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।
৯ Rabindranath's Address INDIAN PHILOSOPHICAL CONGRESS, 1925
১০ *'The Religion of Man', London, 1931, p. 110*

হয়ে জীবনদেবতারূপে দেখা দিয়েছিল, তার ইঙ্গিতও কবি ঐ বক্তৃতায় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মদর্শন ব্যাখ্যায় অন্যত্রও বাউল গানের কাছে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটি ছাড়া, 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলী ও অন্যত্র বাউল সঙ্গীতের পৌনঃপুনিক উদ্ধৃতি তার প্রমাণ। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বাংলাদেশের লোকায়ত সাহিত্যের মর্মমূল থেকে গৃহীত বললে অসঙ্গত হবে না।

বাংলার লোকসাহিত্যের সম্পদের মধ্যে এই বাউল গানই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার উপর যেমন বেশি প্রভাব ফেলেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কর্মেও বাউল গানের প্রভাবই বেশি কার্যকরী হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে তাঁর রচিত সঙ্গীতেই এ প্রভাবের বেশি স্ফূর্তি লক্ষ্য করি। এ সম্পর্কে কবি স্বয়ং বলেছেন :

> "আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রূপরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে।"[১১]

তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য পল্লীসঙ্গীতের সাথেও নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। 'গ্রাম্যসঙ্গীত' নামক প্রবন্ধ, ধর্ম-দর্শন-চিন্তামূলক কোন কোন নিবন্ধে সে-সবের পরিচয় মিলবে। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী রবীন্দ্র সঙ্গীতে লোকগীতির প্রভাব বিচার করতে গিয়ে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ পল্লী অঞ্চলের সর্বশ্রেণীর লোকসঙ্গীতের প্রভাব ও পরিচয় হয়তো পাওয়া যাবে না, তবে বাউলসঙ্গীত ছাড়া আরও কয়েকশ্রেণীর লোকগীতির প্রভাব তাতে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে বাউল গানের পরে সারিগানের প্রভাবই রবীন্দ্রসঙ্গীতে বেশি লক্ষ্য করা যায়। আর এ দু'ধরনের গান প্রায় একান্তভাবেই বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। অন্যান্য যে-সব লোকসঙ্গীতের প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে দেখা যায়, যেমন—রামপ্রসাদী, কীর্তন, ইত্যাদি এদের বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব সম্পদ বলা চলে না, যদিও এদের উপর তার দাবী উপেক্ষণীয় নয়। কারণ শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার ধারা বয়ে এসব গানও প্রায় সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের প্রাণের জিনিস হয়ে উঠেছে। তবে বাউল ও সারিগানের প্রভাব যেখানেই দেখা

১১ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা।

দিয়েছে, সেখানেই বাংলাদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধরা পড়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে বাউল সঙ্গীতের ভাব ও সুরের যেমন রেশ পাওয়া যায়, অনেক সঙ্গীতে আবার সুরটুকুই শুধু ফুটে উঠেছে, বক্তব্যে কবির সম্পূর্ণ নিজস্বতা দেখা দিয়েছে। কোথাও বাউল সুর ভিন্ন সুরের মিশ্রণে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। বাউল সুরে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সঙ্গীত হচ্ছে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'ও আমার দেশের মাটি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'আমার সোনার বাংলা', 'মেঘের কোলে কোলে', 'মালা হতে খসে পড়া', 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ', 'পাগ্‌লা হাওয়ার বাদল দিনে', 'ডাকব না ডাকব না', 'হে আকাশ-বিহারী নীরদ-বাহন জল', 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', 'আমি তখন ছিলেম মগন', 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে', 'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া' ইত্যাদি।

বাউল গানের পিঠেই আসে সারিগানের কথা। সারিগান শ্রমজীবী মানুষের সমবেত সঙ্গীত। এই পর্যায়ে পড়ে বিশেষ করে 'নৌকা বাইচের গান'। বাংলাদেশের জলপথে বোটে পরিক্রমারত থাকা কালে রবীন্দ্রনাথ এ গানের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। এ গানের প্রভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মাঝিদের সারিগান মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপ্‌সা করে দেয়, অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিদে সেইজন্য অত্যন্ত সহজে মনের আঙিনায় আঁচল পেতে বসে।"[১২] সারিগান রবীন্দ্রনাথকে যে অনেকটাই আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ পাই একাধিক গানের মধ্যে 'সারিগান' কথাটির উল্লেখ দেখে, যেমন—

'ঐ দেখো কতবার
হল খেয়া পারাপার
সারি গান উঠিল অম্বরে।'

অথবা, 'তারি সুদূর সারিগানে
বিদায় স্মৃতি জাগায় প্রাণে।'

অথবা, 'তাই তোমারি সারিগানে
সেই আঁখি তার মনে প্রাণে
আকাশ ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।'

১২. 'সঙ্গীত': রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪ খণ্ড।

এবার সারিগানের সুরে রচিত কয়েকটি অতি পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা উল্লেখ করা যাক—যেমন, 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব', 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা', 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ায়' ইত্যাদি।

আগেই বলেছি এই দুই প্রকারের গানের প্রভাব ছাড়াও অন্যান্য কয়েকপ্রকার লোকগীতির সুরের কিছু প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে দৃষ্ট হয়। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনায় তার পরিচয়-দান আবশ্যিক নয় বিবেচনায় আমরা এ-প্রসঙ্গের ইতি এখানে টানছি।

লোকসাহিত্যের অন্যান্য সম্পদের মধ্যে ছড়াগুলো রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষতঃ ছড়ার ছন্দ, যাকে রবীন্দ্রনাথ 'প্রাকৃত বাংলার ছন্দ' বলেও চিহ্নিত করেছেন, তার নৃত্যচপল ভঙ্গিমাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব আকাঙ্ক্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য সম্পর্কে 'ছন্দ' নামক গ্রন্থে তিনি বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। 'স্বরবৃত্ত' নামে আখ্যাত এই ছন্দে প্রায় গোটা একটা কাব্যরচনা করে তিনি আমাদের এর মাধুর্য-আস্বাদনে সাহায্য করেছেন। 'ক্ষণিকা' কাব্যে এর সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলবে। ছড়ার ভাষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতিদিনের ঘরোয়া বুলিকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, সাধ্যমত তিনি তাঁর রচনায় সে ভাষাকে মর্যাদা দানের চেষ্টাও করেছেন। মোটকথা লোকভাষা ও লোকছন্দ রবীন্দ্রকাব্যের বহিরঙ্গ-গঠনে অনেকটাই সুফলপ্রসূ হয়েছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়েই লোকসাহিত্যের রসলোকের বার্তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। 'লোক সাহিত্য'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের রসভাষ্য-স্রষ্টার সম্পূর্ণ গৌরব নিয়েই উপস্থিত রয়েছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় উদ্ঘাটনের পক্ষে এ সবই প্রয়োজনীয় তথ্য।

সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে এ সত্যই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে রবীন্দ্রপ্রতিভার লালন ও পরিপুষ্টিতে বেদ-উপনিষদ ও পুরাণ-লালিত ভারতীয় ঐতিহ্যের অবদান যতটাই থাক না কেন, বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির অবদানও বড় কম নয়। এ সংস্কৃতির সাথে নিবিড় পরিচয় তাঁকে লোকমানসের গভীরে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী করেছিল। এর বলেই তিনি স্বদেশের জনচিত্তের অন্তঃস্থলে ডুব দিয়ে সংস্কৃতির যে মণিমাণিক্য কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তাকে আপন প্রতিভার যাদুস্পর্শে রূপান্তরিত করে স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে আদরণীয় করে তুলতে পেরেছেন। বাংলাদেশের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের অনড় প্রতিষ্ঠার রহস্য নিহিত রয়েছে এইখানটিতে।

রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ

চিন্মোহন সেহানবীশ

জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত, সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

—অবতরণিকা (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ খণ্ড)

'সঞ্জীবনী সভা'র 'উত্তেজনা'র আগুন পোহানো'র সেই কৈশোর থেকে মৃত্যুর আড়াই মাস আগে 'পলাতক বিপ্লবী'র কাহিনী—'বদনাম' লেখার সময় অবধি সাড়ে ছ'দশক কাল রবীন্দ্রনাথের নাম নানাসূত্রে জড়িয়ে গেছে বিপ্লবীদের সঙ্গে। 'বিপ্লবী' শব্দটি অবশ্য এখানে গভীর, তাত্ত্বিক কোন অর্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে না, ব্যবহৃত হচ্ছে নেহাতই মামুলী, আটপৌরেভাবে অর্থাৎ তাঁদেরই বোঝাতে একদিন যাঁরা গোপন ও সীমাবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামের পথে প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন দেশের স্বাধীনতা আনতে। তবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ প্রসঙ্গে এত লেখা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যে এখানে সে বিষয়টি আর তোলা হল না নতুন করে।

এক

বিপ্লবীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের দু'টি দিক বরাবরই লক্ষণীয়। একদিকে, তিনি তাঁদের অনুসৃত পন্থার কঠোর সমালোচক। অন্যদিকে আবার তাঁর লেখায় ও কাজকর্মে স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট ঐ দুঃসাহসী তরুণদের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর টান। তাঁর ভাষায় তাই: ' দেশভক্তির আলোকে কেবল যে চোরডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি' ('ছোটো ও বড়ো', ৪ র, ২৪ খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ)।

বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঐ দ্বৈত ভাবনা এই শতকের গোড়ার থেকেই প্রকাশ পেয়েছে গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায় যেমন, তেমনি আবার প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, বক্তৃতায়, বিবৃতি ও ঘোষণায়, বিপ্লবীদের সঙ্গে বা ঘনিষ্ঠমহলে আলাপ-আলোচনায় আর ব্যক্তিগতভাবে বহু বিপ্লবীকে নানাভাবে সাহায্য ও আশ্রয়দানের মধ্যেও।

একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার : আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের উন্মেষ ইতিহাসের যে পর্বে সেই 'অগ্নিযুগ' আবার মোটের উপর 'স্বদেশী যুগ'ও বটে আর তারপর থেকে ত্রিশের কোঠার মাঝামাঝি অবধি বিপ্লবী আন্দোলন চলেছে ব্যাপকতর, জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি, অনেক সময়ে—অন্তত এই বাংলা দেশে - তার সঙ্গে কমবেশি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগেই। আবার এ-সবের প্রতিঘাতে সরকারী পীড়নের খড়্গ যখন নেমেছে তখন তার আঘাত থেকে রেহাই পায়নি কোন পক্ষই। তাই স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হলেও সাধারণভাবে লোকচক্ষে দুই আন্দোলনের কর্মীরাই ছিলেন 'স্বদেশী'।

বাংলা দেশে, এ-ব্যাপারটি আরো বিশেষ করে ঘটেছে এই জন্য যে এখানে 'চরমপন্থী রাজনীতি' বিশেষ প্রবল হওয়ার ফলে চরমপন্থী নেতারা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনেরও নেতা, আবার তাঁদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বিপ্লবীদের সে-কথাও সর্বজনবিদিত।

সেদিনকার সেই বাঙালী মানসিকতার প্রতিচ্ছবি দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও—তবে অবশ্যই অনেক জটিলতরভাবে। 'আবেদন আর নিবেদন থালা বহি বহি নতশির'-মডারেট রাজনীতির প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণার দরুন বিপ্লবী পন্থার সমালোচক হয়েও তাঁর মনে হয়েছিল : '…ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গে বিরোধে এ-রাস্তা কণ্টকিত।…ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপনার পথ সুগম করিতে চায় নাই' ('ছোটো ও বড়ো', র র, ২৪ খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ)। মডারেট রাজনীতির প্রতি বিমুখতার জন্যই রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশীসমাজে'র কর্মপন্থা, 'চরমপন্থা' ও বিপ্লবীদের পন্থা স্বতন্ত্র হলেও তার মধ্যে সেদিন প্রধানত মিলই খুঁজে পেয়েছিলেন যেমন রবীন্দ্রনাথ তেমনি আবার দেশের সাধারণ মানুষ। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : 'এই সময়ে সাধারণ লোকে রবীন্দ্রবাবুর মণ্ডলী, কংগ্রেসের গরম দল—যাহা বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দের চারিধারে গড়িয়া উঠিতেছিল—এবং বৈপ্লবিক দল, এই সকলকে এক দল বলিয়া মনে করিত' ('ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম', ১৫৮ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার লেখাতেও সাধারণত পাওয়া যায় সেই গোটা জাতীয় সমাবেশের রূপ। তার মধ্যে যে লেখাগুলিতে বিপ্লবীদের এবং তাদের

কার্যকলাপের বিশেষ উল্লেখ আছে অথবা তাঁর নিজের যে-সব কাজ বিশেষ করেই সেই বিপ্লবীদের সংক্রান্ত, শুধু তারই একটা হিসেব নেবার চেষ্টা করব এখানে। কালানুক্রম অনুযায়ী সাজালে ঐ ধরনের রচনা বা কর্মপরিকল্পনারা দাঁড়াবে অনেকটা এই ধরনের :

১৯০৮ সন—'পথ ও পাথেয়' (র র, ১০ খণ্ড, ৪৪৫-'৬৭ পৃঃ) ও তারই পরিপূরক 'সমস্যা' (র. র, ১০ খণ্ড, ৪৬৮-'৮৪ পৃঃ) প্রবন্ধ। 'রচনাবলী'র সংশ্লিষ্ট খণ্ডের শেষে, 'গ্রন্থপরিচয়ে' এ-সম্পর্কে লেখা হয়েছে '১৯০৮ সালে (১৩১৪-'১৫) মজঃফরপুরে বোমা-নিক্ষেপে দুইজন ইংরেজ মহিলা নিহত হইলে ও মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার হইলে রবীন্দ্রনাথ 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধ রচনা ও সভায় তাহা পাঠ করিয়া এ-বিষয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করেন' (র. র, ১০ খণ্ড, ৬৬১ পৃঃ)। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন চৈতন্য লাইব্রেরিতে।

—শ্রীমতী নির্ঝরিনী সরকারকে লেখা ৬ই মে তারিখের চিঠি ('চিঠিপত্র', ৭ খণ্ড, ১৩৫-'৩৬ পৃঃ)। ঐ চিঠিরও যে উপলক্ষ একই তা জানা যায় উপরোক্ত 'গ্রন্থ-পরিচয়' থেকে।

—'সদুপায়' (র র, ১০ খণ্ড, ৫২২-'৩১ পৃঃ) প্রবন্ধ। প্রবন্ধের শেষ দিকে চন্দননগরের মেয়র, শ্রীহট্টের ডিস্ট্রিক্ট ও কুষ্টিয়ার পাদ্রি হিগিনবোথামের উপর বিপ্লবীদের আক্রমণের উল্লেখ আছে।

—১৩১৫ সনের বৈশাখ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'ভেরা সেজোনোভা' প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। ভেরা সেজোনোভা নামে এক তরুণী রুশ বিপ্লবীর সঙ্গে মার্কিন সাংবাদিক, লেরয় স্কটের সাক্ষাৎকারের এই বিবরণের শেষে 'প্রবাসী' সম্পাদক একটি ছোট 'নোটে' জানান : 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রবন্ধের বাহুল্য অংশ বাদ দিয়া ইহা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন'। তার পর ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য যার সূচনায় ছিল এই কথাগুলি : 'এই প্রবন্ধের নায়িকার স্বদেশপ্রেমে আত্মোৎসর্গের (প্রবন্ধের শেষে লেরয় স্কট লেখেন যে ভেরা ঐ সাক্ষাৎকারের অল্পকালের মধ্যেই ক্রনস্টাড সৈন্যাবাসের মধ্যে ধরা পড়েন ও তাঁকে গুলি করে মারা হয়—প্রবন্ধকার) আশ্চর্য বিবরণটি আমাদের নিষ্ঠা উদ্রেকের উপযোগী বলিয়াই এটিকে আপনার নিকট পাঠাইতেছি'।

—কালীমোহন ঘোষ, ভূপেশচন্দ্র রায়, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও অক্ষয়চন্দ্র সেন—এই পাঁচজন তরুণ কর্মীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী সংগঠনের কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু পুলিসের কৃপাদৃষ্টির ফলে তাঁরা বেশিদিন

সে কাজ চালাতে পারেননি ('রবীন্দ্রজীবন' - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২ খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ, ৩ পাদটীকা)। এঁদের মধ্যে কালীমোহন জড়িত ছিলেন বিপ্লবী কাজকর্মে। অন্যদের কথা জানা নেই।

১৯১০ সন—হীরালাল সেন নামে এক তরুণ কর্মীকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন। এর আগে ইনি ছিলেন খুলনা সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'হুঙ্কার' নামে কবিতার বই তিনি উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকে। তার জন্য হীরালাল সেনের ছ'মাস কারাদণ্ড হয় এবং রবীন্দ্রনাথের নাম ঐ বইয়ের সঙ্গে জড়িত হওয়ায় তাঁকেও খুলনা আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয় উঠে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ দেন। কিন্তু পুলিসের শ্যেনদৃষ্টির দরুন বেশিদিন তাঁকে রাখা যায়নি আশ্রমে। ১৯১১ সনে কবি তাঁকে কাজ দেন তাঁর জমিদারিতে ('রবীন্দ্রজীবনী' ২ খণ্ড, ২০০ পৃঃ)। খুব সম্ভবত ইনিও জড়িত ছিলেন বিপ্লবী কাজকর্মে।

১৯১৬ সন—'ঘরে-বাইরে' (র র, ৮ খণ্ড, ১৪১-৩৩৪ পৃঃ) উপন্যাস। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথের মতে : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "ঘরে-বাইরে" নামক পুস্তকে দুইজন বিপ্লবীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—সন্দীপ ও বালক অমূল্য। সন্দীপ বক্তা ও স্বদেশসেবক দলের বড় এক পাণ্ডা। তাহার মুখে ত্যাগের ভান ও অন্তরে ভোগের ইচ্ছা। কিন্তু আমি অন্তত এ প্রকার বিপ্লবী বাঙলার ভিতর দেখি নাই।...অন্যদিকে অমূল্যের চরিত্রে যথার্থ ই বঙ্গের কিশোরবয়স্ক বিপ্লবীর চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্দীপ অন্য কোন পন্থাবলম্বী হইতে পারে কিন্তু বৈপ্লবিক নহে। তাহার চরিত্রে বৈপ্লবিকের চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই' ('ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম', ৮২-'৩ পৃঃ)।

ভূপেন্দ্রনাথের বক্তব্যের সম্পর্কে আজ আমরা যাই ভাবি না কেন, একজন বিপ্লবীর চোখে 'ঘরে-বাইরে'র ঐ দুই চরিত্র যে সেদিন ঐ রকম ঠেকেছিল, এ-ক্ষেত্রে সেইটেই লক্ষণীয়।

১৯১৭ সন—'ছোটো ও বড়ো' (র. র, ২৪ খণ্ড, ২৭২-'৭৩ পৃঃ) প্রবন্ধ। তরুণ বিপ্লবী শচীন্দ্র দাশগুপ্তের পিতৃগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় আত্মহত্যার খবরে ও তার আগে পিতাকে লেখা তাঁর শেষ চিঠি ('প্রবাসী' ১৩২৪, কার্তিক, ১০৯-'১১ পৃঃ) পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে ঐ-সময়ে বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন তা ঐ প্রবন্ধে শচীন্দ্রের একাধিক উল্লেখ থেকে বেশ বোঝা যায়। আর তারই একটিতে তিনি

যে ঐ-সব বিপ্লবী তরুণদের কি চোখে দেখতেন তা'ও ধরা পড়ে :'…আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অভিভাবকের চিঠি পড়লে বোঝা যায় যে, এ-ছেলেকে যে-ইংরেজ সাজা দিয়েছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিত এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত' (র. র, ২৪ খণ্ড, ২৮৭ পৃঃ)।

—শ্রীমতী বেসান্ট ও তাঁর দুই সহকর্মীর উপর সরকারী অন্তরীণ আদেশের খবরে রবীন্দ্রনাথ যে বিবৃতি দেন তারই জের টেনে ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় তাঁর আর একটি বিবৃতি। বাংলা দেশে যে শত শত তরুণ ঐ সময়ে 'বিনা বিচারে কারারুদ্ধ বা অন্তরীণ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁরা যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এমন কি কেউ কেউ পাগল বা আত্মঘাতী হয়েছেন—এরও উল্লেখ আছে ঐ বিবৃতিতে।

১৯২১ সন—'সত্যের আহ্বান' (র র, ২৪ খণ্ড, ৩২০-'৪০ পৃঃ) প্রবন্ধ। অসহযোগের আহ্বানের সমীচীনতা নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐ সুপরিচিত আলোচনায় প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন সেই সব যুবকদের কথা 'বঙ্গ-বিভাগের উত্তেজনার দিনে • রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন' এবং ' প্রলয় হুতাশনে নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন। • তাঁদের [illegible] দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল' (ঐ, ৩২৩ পৃঃ)।

১৯২২ সন—ময়মনসিংহের মণীন্দ্রচন্দ্র দাসকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের কাজে নিয়োগ করেন। মণীন্দ্রচন্দ্র ছিলেন 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য এবং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, পুলিন দাস, নলিনীকান্ত গুহ প্রমুখ বিপ্লবীদের সহযোগী। সম্প্রতি ৭০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

—'অনুশীলন সমিতি'র আর এক সদস্য, কেদারেশ্বর গুহকেও রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় নাগাদ শান্তিনিকেতনের পল্লীসংগঠনের কাজে নিযুক্ত করেন। তাঁর সম্পর্কে যা জানা যায় তা এই রকম : 'অনুশীলন সমিতি' ১৯১২ সালে তাঁকে বিদেশে পাঠায় বিপ্লবী কাজকর্মের জন্যে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি হয়ে তিনি আমেরিকা পৌঁছন ১৯১৪ সালে। এর অল্পদিনের মধ্যেই যুদ্ধ বাধে। ঐ সময়ে ইউরোপে যে সব ভারতীয় বিপ্লবী ছিলেন তাঁরা সকলেই যুদ্ধের সুযোগে, জার্মানির সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে জড়ো হন বার্লিনে এবং এক সমিতি গঠন করেন। সেই 'বার্লিন কমিটি'র তরফ থেকে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভাই, ধীরেন্দ্রকুমার সরকারকে আমেরিকা পাঠানো হয় সেখানকার বিপ্লবী 'গদর' দলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। সেখানে তাঁর দেখা হয় সহপাঠী, কেদারেশ্বর গুহর

সঙ্গে। কেদারেশ্বর তাঁরই কথা মতো 'বার্লিন কমিটির' খবর ও নির্দেশ নিয়ে ১৯১৫ সনে দেশে ফেরেন এবং যোগাযোগ করেন রাসবিহারী বসু প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে। কিন্তু এর অল্পদিনের মধ্যেই সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় রাসবিহারী নিজেকে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে 'পি. এন. ঠাকুর' নামে পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন এবং কবির জাপান যাত্রার ব্যবস্থাদি করার জন্য যেন আগে যাচ্ছেন, এইভাবে গোপনে জাপান পাড়ি দেন। এর কিছুদিন পরে কেদারেশ্বরও জাপানে (সেখানে তাঁর আবার দেখা হয় রাসবিহারীর সঙ্গে) হয়ে আমেরিকা যান। তারপর ঠিক কবে যে তিনি দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন এবং শান্তিনিকেতনে যোগ দেন, তার খবর জানতে পারিনি। তাঁর সম্পর্কে উপরোক্ত খবর পাওয়া গেছে শ্রীনলিনীকিশোর গুহর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' (৪র্থ সংস্করণ, ১৩০-'৩৫ পৃঃ) গ্রন্থে প্রকাশিত কেদারেশ্বর গুহর বিবৃতি থেকে।

১৯২৭ সন—বিনা বিচারে আটকের বিরুদ্ধে 'ফরোয়ার্ড', 'হিন্দু' প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি। তার একটি লাইন এই রকম: '...Taking short cuts in law is like setting the whole house on fire in order to roast one's pig'।

১৯৩১ সন—কবির ৭০ বছর জন্মোৎসব উপলক্ষে সারা দেশের সঙ্গে একযোগে বক্সা দুর্গে নির্বাসিত বিপ্লবীদের অভিনন্দনপত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রেরণ (র.'র, ১৫ খণ্ড, ১৯৪ পৃঃ)। তিন স্তবকের ঐ সুপরিচিত কবিতাটির প্রথম চরণটি এই: 'নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন'।

—হিজলী বন্দীশিবিরে গুলি চালিয়ে দুই রাজবন্দী, সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনকে হত্যা ও বহু রাজবন্দীকে আহত করার এবং চট্টগ্রামে পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য কলকাতা ময়দানে আহূত সভায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব ও ভাষণদান। 'হিজলি ও চট্টগ্রাম' নামে ঐ ভাষণটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র ২৪ খণ্ড, ৪৫৩-'৫৪ পৃষ্ঠায়।

ঐ নির্মম ঘটনাপ্রসঙ্গে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা বন্দীনিবাসের খুনী রক্ষীদের প্রতি সহানুভূতিজ্ঞাপক যে মত প্রকাশ করে তার জবাবে রবীন্দ্রনাথ 'স্টেটসম্যান' সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি পাঠান। সম্পাদক, এলফ্রেড এইচ. ওয়াটসন চিঠিটি শ্রী অমল হোমের কাছে ফেরৎ পাঠান এই মন্তব্য সমেত: 'I must definitely refuse to publish from Dr. Rabindranath Tagore or anybody else, a letter which accuses men of murder who

have never been tried on that count. I return the letter to you'। হিজলির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সেই পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য ঐ 'হিজলি ও চট্টগ্রাম' প্রবন্ধেরই শেষার্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে 'রচনাবলীর' ২৪ খণ্ডে, ৪৫৫-'৫৬ পৃষ্ঠায়।

১৯৩২ সন—'প্রশ্ন' (র র. ১৫ খণ্ড, ১৯৬-'৯৭ পৃঃ) কবিতা। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ঐ সময়ে যে সরকারী দমননীতির তাণ্ডব চলছিল তারই পৃষ্ঠপটে হলেও এ কবিতায় বিশেষ ছায়া পড়েছে তরুণ বিপ্লবীদের যন্ত্রণার।

১৯৩৩ সন—আন্দামানে নির্বাসিত বিপ্লবীরা রাজনৈতিক বন্দীর অধিকারের দাবীতে আমৃত্যু অনশন করছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিরস্ত হতে অনুরোধ জানিয়ে এক টেলিগ্রাম পাঠান। বিপ্লবীরা তাঁর ডাকে সাড়া দেন কিন্তু ইতিমধ্যে অনশনব্রতীদের উপরে জোর করে খাওয়ানোর নামে যে বর্বর অত্যাচার চালানো হয় তার ফলে শহীদ হন মহাবীর সিং, মানকৃষ্ণ নমোদাস ও মোহিতমোহন মৈত্র নামে তিন তরুণ বিপ্লবী।

১৯৩৪ সন—'চার অধ্যায়' (র র, ১৩ খণ্ড, ২৬৭-৩২৯ পৃঃ) উপন্যাস। এ উপন্যাসের, বিশেষ করে এর প্রথম সংস্করণের যে ভূমিকাটিতে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন তার তীব্র সমালোচনা হয় বিভিন্ন মহলে। সবচেয়ে বেশি আপত্তি উঠেছিল ব্রহ্মবান্ধবের 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে'-এই কথার ইঙ্গিতে। পরবর্তী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ বাদ দেন ঐ ভূমিকা তবে সেই ভূমিকা এবং বিভিন্ন সমালোচনার জবাবে রবীন্দ্রনাথ যে কৈফিয়ত দেন দুটিই পাওয়া যায় 'রচনাবলী'র, ১৩ খণ্ডের, ৫৪১-'৪৫ পৃষ্ঠায়। কৈফিয়তটিতে ব্রহ্মবান্ধবের কোন উল্লেখ নেই। 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে প্রভাতকুমার লিখেছেন '...এই বই সম্বন্ধে যে পরিমাণ সমালোচনা হইয়াছে তাহা "ঘরে-বাইরের" পর কবির অন্য কোন বই সম্বন্ধে হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যে সকল কপি বিক্রীত হইয়া যায়। লোকে ব'লতে আরম্ভ করিল গবর্মেন্ট এই বই কিনিয়া অন্তরীণাবদ্ধদের দিতেছেন, বিপ্লবদমনের জন্য এই বই সরকারের উপযুক্ত অস্ত্র হইয়াছে। ইহা "নিষিদ্ধ" পুস্তক হইতে পারে আশঙ্কায় প্রকাশ বন্ধ রাখা হইয়াছিল; পরে প্রকাশিত হইলে শোনা গেল যে, ইহা সরকারের বিপ্লবদমনের প্রচার পুস্তকরূপে স্বীকৃত হইতেছে' ('রবীন্দ্রজীবনী', ৩ খণ্ড, ৫৯ পৃঃ)। বিপ্লবী মহলে 'চার অধ্যায়' সেদিন যে ঢেউ তুলেছিল তার কথা বলা হবে যথাস্থানে।

১৯৩৬ সন—'অদ্ভুত' (র. র. ২০ খণ্ড, ১০৭-'১৪ পৃঃ) কবিতা। এ কবিতার নায়ক এক তরুণ যার 'বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে রাশিয়ার লম্বী খেলানো বাবুইটা'।

—২০ নভেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে 'Indian Civil Liberties Union' -এর সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি (Amrita Bazar Patrika, ২২ নভেম্বর, ১৯৩৬)। বিবৃতির উপলক্ষ—ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানার এক গ্রামে অন্তরীণ, মেদিনীপুরের নবজীবন ঘোষ ও দেউলী বন্দীশিবিরে আটক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি ক্লাসের ছাত্র, সন্তোষচন্দ্র গাঙ্গুলির আত্মহত্যার খবর। বিবৃতিতে সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করতে।

১৯৩৭ সন—আন্দামান বন্দীদের অনশন ধর্মঘটের খবরে ২ আগস্ট টাউন হলের জনসভায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতির ভাষণ। ঐ মৌখিক ভাষণের মর্মার্থ প্রকাশিত হয়েছে প্রভাতকুমারের বইয়ে ('রবীন্দ্রজীবনী', ৪ খণ্ড, ১০৩-'০৪ পৃঃ)। অনশনবন্দীদের কাছে তিনি যে টেলিগ্রাম পাঠান তার বাংলা তর্জমা দিয়েছেন প্রভাতকুমার এই রকম : 'বঙ্গদেশ তাহার অনশন ধর্মঘটী নির্বাসিত সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যাকুল। দেশ তোমাদের পশ্চাতে আছে' (ঐ, ১০৪ পৃঃ)।

—১৪০ অগাস্ট সারা বাংলা দেশে যে 'আন্দামান দিবস' পালিত হয় সেই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের সভায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতির ভাষণ। ভাষণটি 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' নামে প্রকাশিত হয়েছে 'রচনাবলী'র ২৪ খণ্ডের ৪৬০-'৬৪ পৃষ্ঠায়।

—চীনের উপর নৃশংস অত্যাচার চালানোর প্রতিবাদে কংগ্রেস জাপানী পণ্য বয়কটের যে ডাক দেয় তার থেকে কংগ্রেসকে নিরস্ত করার অনুরোধ জানিয়ে রাসবিহারী বসু কবির কাছে একটি 'তার' পাঠান। তার জবাবে রবীন্দ্রনাথ ১০ অক্টোবর শান্তিনিকেতন থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন (Amrita Bazar Patrika, ১১ অক্টোবর, ১৯৩৭) যার শেষ অনুচ্ছেদটি এই : 'This protest has not been engineered by any single individual. It is as spontaneous and heart-felt as the admiration that the peoples of the East felt for Japan thirty years ago. I should be powerless to check it even if I dare attempt it. You must, therefore, forgive me that I am unable to oblige you

and believe me when I say that I have great sympathy with my countrymen in Japan as, indeed, I have with the Japanese themselves but the cry that comes from China of broken hearts and broken heads and broken bones, is far too piercing and awful'। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এর কিছুদিন পরে জাপানস্থ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অনুরূপ অনুরোধের জবাবে ঠিক ঐ উত্তরই দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩৮ সন—'Manchester Guardian' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি ('Manchester Guardian', ১০ মার্চ, ১৯৩৮)। ভারতে ঐ সময়ে বৃটিশ শাসকবর্গ যে নতুন শাসন-ব্যবস্থা চালু করেছিল তার সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: '...As regards the new constitution, it is really not worth troubling about as it stands. It was made by politicians and bureaucrats, who even as they were framing it, were sending some of our best men and women to prison, mainly without trial. It, therefore, embodies all their narrow caution and miserly mistrust'.

—শ্রীমতী কল্পনা দত্তকে ১৯৩৮ সনের ২৪শে জুন তারিখে লেখা কবির চিঠি। কল্পনা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে ১৯৩৮ সনের গোড়ায় তাঁর পিতা জেলে দেখা করতে এসে তাঁকে জানান যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। প্রসঙ্গত তিনি কবির এই ছোট চিঠিটি দেখান: 'তোমার রক্ষার জন্যে যা আমার সাধ্য তা করেছি, তার শেষ ফল জানবার সময় এখনো হয়নি; আশা করি, চেষ্টা ব্যর্থ হবে না।' এই ছোট্ট চিঠিতে কল্পনার উদ্দেশ্যেও কবির কয়েক লাইনে আশীর্বাণী ছিল। কারামুক্তির পর কল্পনা কবিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে চিঠি লেখেন তার জবাবে কবি লেখেন: তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশী হলুম। অনেকদিন পরে মুক্তিলাভ করেছো—এখন দিনে দিনে শান্তি ও শক্তিলাভ করো, এই কামনা করি। দেশে অনেক কাজ আছে, যা অচঞ্চল ও সমাহিত চিত্তে সাধন করবার যোগ্য, দুঃখভোগের অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে পূর্ণতা দান করুক, এই আমি আশীর্বাদ করি। ইতি—

শুভৈষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪ ৬ '৩৮

১৯৩৯ সন—'শেষকথা' (র. র, ২৫খণ্ড, ২৩৫-'৬৮ পৃঃ) ছোটগল্প। এ কাহিনীর নায়ক, নবীনমাধব 'বাংলাদেশের বিপ্লবী দলের একজন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আন্দামান তীরের খুব কাছাকাছি টান মেরেছিল। নানা বাঁকা পথে সি. আই. ডি-র ফাঁস এড়িয়ে এড়িয়ে' সে গিয়েছিল 'আফগানিস্তান পর্যন্ত। অবশেষে পৌঁচেছে আমেরিকায় খালাসির কাজ নিয়ে'।

১৯৪১ সন—'বদনাম' (র. র, ২৭ খণ্ড, ৬৯-৮১ পৃঃ)। এ গল্পের নায়ক অনিল একজন পলাতক বিপ্লবী। কিন্তু পুলিস ইনস্পেক্টর, বিজয়ের স্ত্রী, সৌদামিনীও কম বিপ্লবী নয় তার চাইতে।

দুই

এবার দেখা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ কি ছিলেন বিপ্লবীদের চোখে। দু'টি কথা মনে হয় এ-প্রসঙ্গে। প্রথম কথা তাঁদের অনুসৃত পন্থা সম্পর্কে কবির সমালোচনা তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি কার্যক্ষেত্রে। এমন কি তার উপরে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে ঐ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বা নিজেদের মধ্যে কোন আলোচনারও চেষ্টা দেখা যায়নি তাঁদের তরফে। তবে ঐ-সব সমালোচনার জন্ম তাঁরা কখনো কবিকে আক্রমণ করেননি, এমন কি তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদও করেননি প্রকাশ্যে।

তা যে করেননি তার কারণ তাঁরা শুধু শ্রদ্ধা করতেন তাই নয়, গভীরভাবে ভালোবাসতেন কবিকে। তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও সমগ্র জীবনবোধকে, তাঁর সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে। আর তাঁরা ভালোবাসতেন তাঁর গান, কবিতা ও সাহিত্য যার বিপুল ঐশ্বর্যভাণ্ডার থেকে তাঁরা অবাধে সংগ্রহ করতেন তাঁদের দুর্গম যাত্রাপথের পাথেয়। এরই জন্ম কবির কাছে তাঁদের আন্তরিক ঋণ-স্বীকার বারবার প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের কথাবার্তায়, চিঠিপত্রে, রচনায়, কবির জন্মদিন পালনে আর সব চাইতে বড়ো কথা তাঁদের বিপ্লবী জীবনের চরম মুহূর্তে অনেক সময়ে তাঁর গান ও কবিতা থেকে সার্থক প্রেরণা গ্রহণে।

কবির প্রতি বিপ্লবীদের সেই চিরন্তন শ্রদ্ধা, ভালোবাসার ধারায় ছেদ পড়ার নজির যৎসামান্য। সেই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দিয়েই তাই শুরু করা যেতে পারে এ-প্রসঙ্গ।

১৯১৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ জাপান হয়ে বক্তৃতা-সফরে আমেরিকা পৌঁছানোর কিছু আগে থেকেই সেখানকার 'গদর' দলের বিপ্লবীরা তাঁর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু করেন। ঐ আন্দোলনের নায়কত্ব করেন পেশোয়ারের পণ্ডিত রামচন্দ্র ভরদ্বাজ যিনি লালা হরদয়ালের পর হাল ধরেছিলেন 'গদর' সংগঠনের। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা পৌঁছানোর আগে তিনি সরকারের হাত থেকে 'নাইটহুড' গ্রহণের জন্য কবিকে নিন্দা করে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন যাতে ছিল এ ধরনের কথা: 'When the title was offered him many eminent Hindus of his principles believed he would refuse the lure but Tagore set aside his nationalistic principles and beliefs and accepted the gift of the king. Since then he has been definitely on the other side of the fence. The present trip to the United States is for other purposes than merely to deliver aesthetic lectures. One of his purposes is to place a check upon the Hindu revolutionary propaganda which is being actively carried on from the Pacific Coast, particularly by the Hindus in California of whom there are more than six thousand' ('San Francisco Call', ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬। জার্মান গবেষক, অধ্যাপক ক্রুগারের একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত—প্রবন্ধকার)। কবি সান্ ফ্রান্সিস্কো পৌঁছানোর ঠিক আগেই 'The Examiner' পত্রিকায় রামচন্দ্রের একটি চিঠিও প্রকাশিত হয় 'Hindu editor attacks Tagore's teachings' শিরোনামায় (অধ্যাপক ক্রুগারের উপরোক্ত প্রবন্ধে এর উদ্ধৃতি পাওয়া যায়—প্রবন্ধকার)। সেখানে তিনি লেখেন রবীন্দ্রনাথ নাকি ভারত-বাসীদের পক্ষে বিজ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করেন না! রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে যার তিলমাত্র ধারণা আছে তিনিই জানেন যে উপরোক্ত একটি অভিযোগও ঠিক নয়। বাংলা দেশের বিপ্লবীদের মতো 'গদর' দলের প্রবাসী অবাঙালী (অধিকাংশই ছিলেন শিখ। কয়েকজন মাত্র বাঙালী বিপ্লবী তাঁদের সঙ্গে কিছুটা যোগ রাখতেন—প্রবন্ধকার) বিপ্লবীরা আদৌ পরিচিত ছিলেন না রবীন্দ্রনাথের বিশাল ও সমুজ্জ্বল পৃষ্ঠপটের সঙ্গে। তা ছাড়া আর এক কারণে ভুল বোঝার ব্যাপার ঘটতে পেরেছিল। কবি সেবার আমেরিকা পৌঁছানোর আগে জাপানে জাতীয়তাবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন (পরে জাপানের সংশ্লিষ্ট দুটি বক্তৃতা কিছুটা পুনর্লিখিত

আকারে 'Nationalism in Japan' নামে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'Nationalism' নামক সংকলনে, আরো দু'টি প্রবন্ধের সঙ্গে—প্রবন্ধকার) খবরের কাগজে তার টুকরো টুকরো বিবরণ পড়ে 'গদর' দলের বিপ্লবীরা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ বুঝি তাঁদের দেশ স্বাধীন করার প্রচেষ্টার বিরোধী। অথচ যে স্বদেশী যুগের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবর্তক তার চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তেও তিনি গোপন করেননি তাঁর এই মত যে, 'আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে কিন্তু বিলাতের নকলে নহে', 'মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে।'

আসলে সেদিন রবীন্দ্রনাথের ঐসব বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের মতো পরাধীন জাতির বিকাশোন্মুখ 'জাতীয়তা' নয়—তাকেও অবশ্য তিনি তাঁর মতো করে সঠিক পথে পরিচালনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন—তাঁর লক্ষ্য আসলে ছিল ইউরোপের সেই 'উগ্র জাতীয়তাবাদ' যা সাম্রাজ্যবাদেরই লক্ষণ। তাঁর সেদিনকার লেখার সতর্ক পাঠকের কাছে এ-কথা ধরা পড়তে বাধ্য।

আর ঠিক সেই কারণেই প্রভাতকুমারের ভাষায় 'কবির ন্যাশনালিজম-বিরোধী বক্তৃতাগুলি লইয়া জাপানে, আমেরিকায় ও য়ুরোপে যেরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, বোধ হয় তাঁহার আর কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধে তাহা হয় নাই' ('রবীন্দ্রজীবনী', ২খণ্ড, ৪৬৭ পৃঃ)। আমেরিকায় 'গদর' বিপ্লবীরা যখন রবীন্দ্রনাথকে খেতাবের লোভে পক্ষ-পরিবর্তনের অপরাধে অভিযুক্ত করছিলেন ঠিক তখনই সেখানকার ধনিক মহলের পত্রিকায় কবির সংশ্লিষ্ট বক্তব্য সম্পর্কে লেখা হল: '...such sickly, saccharined mental poison with which Tagore would corrupt the minds of the youth of our great United States' ('Detroit Journal', ১৪ নভেম্বর, ১৯১৬—প্রভাতকুমার কর্তৃক 'রবীন্দ্রজীবনী', ২ খণ্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত—প্রবন্ধকার)। আবার বৃটিশ-বিরোধী জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা যে তাঁর জাপানের বক্তৃতার স্পষ্টতই বৃটিশ-বিরোধী অংশগুলিকে তুলে ধরে তাদের কাজে লাগাবার এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল, তা'ও জানা যায় অধ্যাপক ক্রুপারের ঐ প্রবন্ধ থেকে। আর সে চেষ্টা থেকে যে উত্তরকালে প্রকৃত বিপত্তির উদ্ভব হয়েছিল তা বোঝা যায় শ্রীকল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Indian Freedom Movement Revolutionaries in America' বইটির শেষ 'পরিশিষ্ট'টি পড়লে।

অন্যদিকে কোন কোন প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কিন্তু তখনই কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন কবির বক্তৃতার যাথার্থ্য। প্রভাতকুমার লিখেছেন: '...শোনা যায় যুদ্ধের মধ্যে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে (Nationalism গ্রন্থের) টাইপ-করা কপি সৈনিকদের মধ্যে চালাচালি হইত। Max Plowman নামে একজন তেজস্বী ইংরেজ যুবক ১৯১৪ সালে যুদ্ধে যোগদান করেন কিন্তু ১৯১৭ সালে "ন্যাশনালিজম" পাঠ করিয়া তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। তিনি যুদ্ধ করিবেন না স্থির করায় সমর-বিভাগীয় শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়' ('রবীন্দ্রজীবনী', ২ খণ্ড, ৪৬৭পৃঃ)।

ভারতীয় বিপ্লবীদের 'বার্লিন কমিটি' সম্পর্কেও অধ্যাপক ক্রুগার তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন যে ঐ কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের ঐ সব 'ন্যাশনালিজম'-বিরোধী বক্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মনে করেন যে সে বক্তব্য তাঁরা ব্যবহার করতে পারবেন তাঁদের কাজে। পরে অবশ্য সান্‌-ফ্রান্‌সিস্কো ঘটনার সূত্রে তাঁরাও নাকি এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'The political apostasy of Rabindranath Tagore' নামে। ক্রুগার লিখেছেন ঐ প্রবন্ধে কিছুটা নরম ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ১৯০৮ সনের পরবর্তী রাজনৈতিক মতামতের।

'গদর' বিপ্লবীদের রবীন্দ্র-বিরোধিতা বিশেষ বিসদৃশ রূপ নেয় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা পৌঁছানোর পর। স্টকটন শহর থেকে বিষম সিং মণ্ডু নামে এক ব্যক্তি আসছিলেন তাঁকে সেই শহরে আমন্ত্রণ জানাতে, এমন সময় 'গদর' দলের লোকেরা তাঁকে বাধা দেন। ফলে মারামারি হয় এবং গুজব রটে যে 'গদর' দল নাকি স্থির করেছে যে তারা রবীন্দ্রনাথকে খুন করবে। এর পর থেকে পুলিস রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার জায়গাগুলিকে রক্ষা করার কিছুটা ব্যবস্থা করে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঐ সব ঘটনা সম্পর্কে যা বলেন তা তাঁরই উপযুক্ত: 'সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো কাগজে আমাকে হত্যা লইয়া একটা খবর প্রকাশ পায়; আমি তাহার সমস্ত পড়ি নাই।... হত্যা সম্বন্ধে যে গুজব রটিয়াছে সে-সম্বন্ধে আমার দেশবাসীর বুদ্ধির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে এবং আমি আমার সমস্ত কাজ পুলিসের সহায়তা ব্যতীতই করিব। আমি এখানে স্পষ্ট বলিতেছি যে আমাকে হত্যা করিবার কোনো ষড়যন্ত্র হইয়াছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি না (Los Angeles Examiner, ৭ অক্টোবর, ১৯১৬, 'রবীন্দ্রজীবনী', ২ খণ্ড, ৪৬৮-'৭০ পৃঃ)। রবীন্দ্রনাথ এও স্বীকার করেননি যে ঐ [illegible] [illegible] তাঁর কর্মসূচীর কোন পরিবর্তন করতে হয়েছিল।

চিন্মোহন সেহানবীশ

রামচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা অস্বীকার করলেন বটে কিন্তু কি ভাষায়!—'আমাদের দলের এইরূপ কোনো অভিসন্ধি নাই। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ, তাঁহার কাজ কাব্য, রাষ্ট্রনীতি নহে। সেইজন্য তাঁহাকে আমরা বিশেষ গ্রাহ্য করি না। তাঁহার ক্ষতি করিলে আমেরিকায় আমাদেরই সর্বনাশ, সে কথা আমরা জানি। পথে মারামারির কারণ এই যে, আমরা চাই নাই যে লোকটি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র আপত্তি এই যে, বৃটিশের সম্মান তাঁহাকে কিনিয়া ফেলিয়াছে, তিনি বৃটিশ নাইট হইয়া আজ পৃথিবীর কাছে দেখাইতে চান যে বৃটিশ শাসন ভারতের কত মঙ্গল করিয়াছে, কিন্তু এই আন্তর্জাতিক মহিমা পাইবার পূর্বে তিনি বিদেশীদের বিরুদ্ধে বাটখানি বই লিখিয়াছিলেন' ('The Evening Telegrm, Portland', ২১ অক্টোবর, ১৯১৬, 'রবীন্দ্রজীবনী', ২ খণ্ড, ৪৬১ পৃঃ)।

যা হোক ঐখানেই সেদিন সমাপ্তি ঘটে ঐ অপ্রীতিকর ও লজ্জাজনক পরিস্থিতির আর তার আড়াই বছরের মধ্যে যা নিয়ে সেদিন অত কাণ্ড সেই 'স্যার' পদবী বড়লাটের কাছে ফেরত দেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে 'গদর' বিপ্লবীরা আদৌ পরিচিত ছিলেন না তাঁর জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে। তারই জন্য সম্ভব হয়েছিল অমন সব কাণ্ডকারখানার (অবশ্য ঐ একটি ঘটনা দিয়েই 'গদর' দলকে বিচার করার মূঢ়তা নিশ্চয়ই আমাদের হবে না—প্রবন্ধকার)। আর সে-পরিচয় কিছুটা ছিল বলেই বাংলা দেশের বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে কবির ভর্ৎসনা সত্ত্বেও অমন কাণ্ড দূরে থাক, কখনো ভাবতেও পারেননি তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কথা।

তবে তাঁরাও একবার গভীরভাবে বিচলিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের একটি লেখায়—'চার অধ্যায়।' লক্ষ্য করতে হবে সেখানেও কিন্তু তাঁদের সেই একান্ত স্বাভাবিক বিক্ষোভ কোনদিন বিস্ফোরিত হয়নি কোন বিসদৃশ আচরণে বা প্রকাশ্য বিতণ্ডায়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেক বছর পরে এবং নিজের মৃত্যুর দু'এক বছর আগে সরোজ আচার্য মহাশয় তবু এক আশ্চর্য, জীবন্ত মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়ে গেছেন সেদিনকার ঘটনার। তাঁর চাইতে ভালো করে দু দিনের কথা [illegible]

[illegible]

[illegible]

চল্লিশ ধরে দেউলী বন্দীনিবাসের বাসিন্দা আমরা। "চার অধ্যায়" আমাদের হাতে পৌঁছল অনেক বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে, আর আমরা সেই বই আগাগোড়া পড়লাম একদমে, একটানা। ঠিক সে-সময় আমাদের মনের অবস্থা কী রকম হয়েছিল তা এখনও অনায়াসে স্মরণ করতে পারি।...রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে বার হয়ে "চার অধ্যায়" যখন নানা সরকারী হাত ঘুরে আমাদের হাতে পৌঁছল এবং আমরা যখন ঘরে ঘরে গোল হয়ে দল বেঁধে পড়লাম ইন্দ্রনাথ, এলা, অতীন্দ্রের কাহিনী, তখন সত্যিই আমরা যেন অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ঘরে ঘরে নিদারুণ বিষাদের ছায়া, চাপা সুরে সকাতর প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, তিনি এই বই লিখলেন, কেন লিখলেন ঠিক এই সময়ে যখন কিনা বাংলা দেশ জুড়ে এণ্ডারসনী তাণ্ডব চলছে? এ কোন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছ থেকে যে বিপ্লবীরা জপমন্ত্র পেয়েছিল "ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে, নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ?" একী সেই রবীন্দ্রনাথ, যাঁর বজ্রগর্ভ বাণী থেকে বিপ্লবীরা মরণজয়ী সাধনার পাথেয় সংগ্রহ করেছিল ' ('রবীন্দ্রনাথ: চার অধ্যায়', 'সাহিত্য স্বাধীনতা' প্রবন্ধ সংকলন, ১২৮ পৃঃ)?

তবু এত সত্বেও প্রভাতকুমার যে লিখেছেন '...লোকে বলিতে আরম্ভ করিল গভর্ণমেন্ট এই বই কিনিয়া অন্তরীণাবদ্ধদের দিতেছেন, বিপ্লব দমনের জন্য এই বই সরকারের উপযুক্ত অস্ত্র হইয়াছে' সে কানাঘুষায় কর্ণপাত করেননি বিপ্লবীরা। সরোজবাবু লিখেছেন '...লোকে যাই বলুক গভর্ণমেন্ট ঐ বই কিনে অন্তরীণাবদ্ধদের দেননি। অন্ততপক্ষে দেউলী বন্দীশিবিরে "চার অধ্যায়" তখন সহজে প্রবেশ করতে পারেনি। মনে আছে প্রথমে এক কপি মাত্র "চার অধ্যায়" সরকারী সেন্সরের দরজা দিয়ে দেউলী বন্দীশিবিরে ঢুকতে পেরেছিল। এক কপি বই, পাঁচটি ক্যাম্পের প্রায় পাঁচশ রাজবন্দী "চার অধ্যায়" পড়বার জন্য আগ্রহে উন্মুখ। অগত্যা সহজ উপায় আবিষ্কৃত হল, গোটা বইখানার সবগুলি পাতা ছিঁড়ে আলাদা আলাদা করা, এক একটি করে পালা করে দশ বারো জনের পাঠচক্রে এক এক বেলার বৈঠকে পাতার পর পাতা "চার অধ্যায়" অধ্যয়ন সমাপন। "চার অধ্যায়কে" বিপ্লব দমনের প্রচার পুস্তকরূপে বৃটিশরাজ ব্যবহার করেননি। বৃটিশরাজ কি করেছিলেন বা করেননি "চার অধ্যায়" নিয়ে সে কথা আমরা তখন মোটেই ভাবিনি। "বিপ্লব দমনের প্রচার পুস্তক" হিসাবে রবীন্দ্রনাথ "চার অধ্যায়" রচনা করেছেন, এমন কোনো সন্দেহের ঘুণ-মাত্র আমাদের মনে স্থান পায়নি, যদিও আমরা বিচলিত, ব্যথিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথ,

আমাদের রবীন্দ্রনাথ বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে, বিপ্লবী চরিত্রকে কী করে এত লঘুভাবে প্রচলিত প্রণয়কাহিনীর সামিল করতে পারলেন' (ঐ, ১২৯-'৩০ পৃঃ)?

আর একটি ঘটনাতেও কিছুটা অবাক হয়েছিলেন বিপ্লবীরা, তথা রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী সাধারণ মানুষও। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' যখন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় তখন সেই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানান শরৎচন্দ্র। কবি সে অনুরোধ রাখেননি এই যুক্তিতে যে অমন লেখা যাঁরা লিখবেন তাঁদের তো প্রস্তুত থাকতেই হবে শাস্তির জন্য, তাই নিয়ে নালিশ জানালে তা'তে প্রকারান্তরে সম্মান জানানো হবে ইংরেজ শাসকবর্গকেই। মুখ ফুটে না বললেও সেদিন অনেকের মনে হয়েছিল কবি নিজেও তো জালিয়ানওয়ালাবাগের জগদ্বিখ্যাত প্রতিবাদের আগে ও পরে বহুবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন সরকারের বহু অনাচারের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ সব সময়ে নিশ্চয়ই নিছক নালিশ নয়, বরঞ্চ তেমন ভাবে জানাতে পারলে বা তেমন লোকে জানালে তা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিকারের প্রথম ধাপ।

মনে হয় সাময়িক কোন উত্তেজনা বা বিরক্তির কারণে হয়তো রবীন্দ্রনাথ সেদিন রাজী হননি প্রতিবাদ জ্ঞাপনে।

রবীন্দ্রনাথ কি কোনদিন সভ্য ছিলেন কোন বিপ্লবী দল বা গোষ্ঠীর? তিনি ঠিক কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন বিপ্লবীদের কার্যকলাপের সঙ্গে? এসব নিয়ে এক সময়ে কিছুটা কানাঘুষো চলত আমাদের দেশে। অরবিন্দের বন্ধু, সহকর্মী ও ভক্ত, চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁর 'পুরানো কথা—উপসংহার'-এ লিখেছেন: '...আমাদের মধ্যে ছিলেন একজন জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক, একজন নামজাদা বৈজ্ঞানিক, একজন জাহাজ-ঘাটার মালিক (আমার পিতৃস্থানীয় হেম মল্লিক মহাশয়) এবং বিশ্ববিশ্রুত জাপানী শিল্পী ও ভাবুক ওকাকুরা কাকুজো। সুরেন ঠাকুর ও আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম বিদ্রোহী' (১ পৃঃ)। সেই 'জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক' যে রবীন্দ্রনাথ এবং 'নামজাদা বৈজ্ঞানিক' যে জগদীশচন্দ্র, এ-কথাও কিছুটা ছড়িয়েছিল মুখে মুখে।

আসলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোরের সেই 'হামচুপামুহাফ'-এর পরে আর কোন গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেননি আর মতামতের দিক থেকে বিপ্লবীদের পন্থা সম্পর্কে তাঁর কোন 'প্রশ্রয়ের মনোভাবও ছিল না কোনদিন। আগেই বলেছি, যেটা তাঁকে ঐ দুঃসাহসী তরুণদের দিকে আকৃষ্ট করেছিল তা হল তাদের প্রবল

আত্মনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিবেদিতা, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, চিত্তরঞ্জন, সখারাম গনেশ দেউস্কর থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত এমন সব নেতৃবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল যাঁরা প্রত্যেকেই কমবেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বিপ্লবী তৎপরতার সঙ্গে। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: '১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রচলিত হয় (ডাঃ দত্ত এখানে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করছেন—প্রবন্ধকার)। প্রথম হইতেই প্রমথনাথ মিত্র ('ব্যারিস্টার পি. মিত্র' নামে সমধিক পরিচিত—প্রবন্ধকার) নিখিল বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সমিতির সহ-সভাপতিদ্বয় ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কার্যকরী সমিতির অন্যতমা সদস্যা ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। উক্ত পাঁচজনকে লইয়া প্রথম নিখিল বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলের কার্যকরী সমিতি স্থাপিত হয়' ('অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস', ২০৫ পৃঃ)। আসলে এই পাঁচ জনের উপরেই ছিল 'অনুশীলন সমিতি'র গুপ্ত কাজকর্ম পরিচালনার ভার।

দেখা যাচ্ছে ঐ পাঁচ জনের মধ্যে চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ ও নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল আর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো ছিলেন তাঁর বিশেষ প্রীতিভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র। একমাত্র ব্যারিস্টার পি. মিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা জানি না, তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে তাঁর গিরিডিতে পরিচয় ঘটেছিল এবং রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দিতে অনুরোধও করেছিলেন, তা জানা যায় তাঁর 'পিতৃস্মৃতি'তে (৯৮-১০০ পৃঃ)।

তবে বেআইনী হওয়ার আগে পর্যন্ত 'অনুশীলন সমিতি'র যে প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড ছিল তার সঙ্গে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কিছুটা যোগ ছিল। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তে সেই যোগাযোগের কথা লিখেছেন এইভাবে: 'স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, সখারাম গনেশ দেউস্কর, পি. মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রাজা সুবোধচন্দ্রের পিতৃব্য মন্মথ বসুমল্লিক, সুরেন্দ্রনাথের ভাই ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশন ও ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি স্বামীজি সমিতিকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তাঁরা মাঝে মাঝে আসতেন এবং কোন কিছু শেখাবার উদ্দেশ্যে এসে উপদেশ বা বক্তৃতা দিয়ে সভ্যদের উৎসাহিত করতেন' (২৭১ পৃঃ)।

মনে রাখতে হবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে জাগ্রত জাতীয়তাবোধের যোগাযোগ নবগোপাল মিত্র ও 'হিন্দু মেলা'র সময় থেকে। আর বিপ্লবীরা

সেখানে যাতায়াত শুরু করেন স্বদেশী যুগে। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের যে গগনেন্দ্রনাথ-স্মৃতি ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে 'দেশ' পত্রিকায় তা'তে আছে : 'বাঙালী বিপ্লববাদীদের আনাগোনা ছিল ঠাকুরবাড়িতে · তবে খুব কম লোকেই জানতেন এঁদের কথা। এঁদের চিনতেন, এঁদের কথা জানতেন সুরেন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথ। এই দুই ভাইয়ের কাছে আসতেন সন্ত্রাসবাদীরা। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই ছিল এঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আর তিনি এঁদের গগনেন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে আসতেন। গগনেন্দ্রনাথ এঁদের লুকিয়ে লুকিয়ে চাল দিয়েছেন, বিপ্লবের তহবিলে গোপনে সাহায্য করেছেন। বারীন ঘোষ এসেছেন, উল্লাসকর এসেছেন, খুব সম্ভবত রাসবিহারী বসু এবং অরবিন্দ ঘোষও এসেছেন। আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের প্রায় সকলেরই যোগাযোগ ছিল সুরেন ও গগনের সঙ্গে' ('দেশ', ১৬ অক্টোবর, ১৯৭১, ১০০১ পৃঃ)।

কিন্তু বিপ্লবীদের ঠাকুরবাড়িতে এই সব আনাগোনা যে রবীন্দ্রনাথের জন্য নয়, প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ ও কিছুটা গগনেন্দ্রনাথের জন্য, সে-কথা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও লিখেছেন তাঁর 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে'। তবে বিপ্লবীদের তরফ থেকে একবারই মনে হয় কিছুটা যথার্থ চেষ্টা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একযোগে কাজ করার। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" বক্তৃতা এবং parallel government স্থাপন করিয়া দেশমুক্ত করার প্লানের পর, অনুমান হয় ১৯০৫ খৃঃ বারীন্দ্র প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কর্মীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে একটি পত্র লিখি যে, আমরা ভারতীয় সভার সহযোগে কর্ম করিতে প্রস্তুত নই, তাঁহার সহিত সংযুক্তভাবে কর্ম করিতে চাই। ইহাতে তিনি তাঁহার দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ বাসায় আমাকে আহ্বান করেন এবং বলেন "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এই বিষয়ে কথা কও"। ইহাতে সখারামবাবু, দেবব্রতবাবু এবং আমি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালীগঞ্জের বাড়ীতে যাই। তিনি বলিলেন, রবিবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করেন, "ইহারা কাহারা?" আমি সব কথা বলি। তিনি বলেন, তিনি বক্তৃতা ও সাহিত্য দ্বারা কার্য করিবেন। ইহাতে সখারামবাবু ব্যঙ্গ করেন—"কবিতা লিখিয়া ভারতোদ্ধার হইবে না।" পরে এই সহযোগিতার তাগাদার জন্য ব্যোমকেশ মুস্তফীর সহিত সাহিত্য পরিষদ অফিসে···আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি "স্বদেশীসমাজ" পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন।···বলিলেন, পরিকল্পনা পূর্ণভাবে তৈয়ারী হইলে পরীক্ষার জন্য একস্থলে তাহা বাস্তবিক কর্মে পরিণত করার চেষ্টা

হইবে। এই পরিকল্পনা পড়িয়া বুঝিলাম উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাঙ্গারীর জাতীয়তাবাদী ডিক্‌ (Deak) হাঙ্গারিতে অস্ট্রিয়ার ক্ষমতার বিলোপসাধন-করে এইরূপ 'স্বদেশীয়ানা' করিয়াছিলেন এবং কিঞ্চিৎ পূর্বে আয়র্ল্যাণ্ডে সিন-ফিনেরা তাহা করিয়াছিল। তদনুরূপ ইহা "স্বদেশী" হইবার একটি কর্ম-পদ্ধতি মাত্র যাহাই হউক পরে এই দলের কোন এক মিটিং-এ রবিবাবু আমাদের ডাকিয়াছিলেন। আমি তখন "ভবানী মন্দির" পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বিহারে প্রেরিত হইয়াছিলাম। প্রত্যাবর্তন করিয়া অন্নদা কবিরাজের কাছ হইতে ইহা শুনিলাম; তিনি এই আহ্বানে এই সভায় গমন করিয়াছিলেন। সভায় নানাজনে নানা কথা বলে, রবিবাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কি মত"? কবিরাজ জবাব দেন, "আমরা তর্ক করিতে অক্ষম, কার্য দিন, করিতে প্রস্তুত"। রবিবাবু বলিলেন, "তাহা আমি জানি।" রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রতিষ্ঠাকল্পের প্রচেষ্টার সহিত বৈপ্লবিক সমিতির সহযোগিতার উদ্যম এই স্থলেই শেষ হয়' ('ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম', ১৫৭-'৫৮ পৃঃ)।

একদা 'অনুশীলন সমিতি'র বিশিষ্ট নেতা, পুলিন দাস মহাশয়ের সঙ্গেও দেখা হয় রবীন্দ্রনাথের। এ বিষয়ে তাঁর আত্মকথায় লেখা হয়েছে: 'রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রবন্ধ কিম্বা কবিতা দ্বারা 'শঙ্খ' পত্রিকাকে (এ'টি ছিল এক সময়ে 'অনুশীলন সমিতি'র মুখপত্র'—প্রবন্ধকার) সমৃদ্ধ করার মানসে তাঁহার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য নলিনী গুহ ও জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন যাইয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করে। তাহারা আসিয়া আমাকে জানায় যে, কবি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। সেই অনুসারে আমি জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া শান্তিনিকেতন যাইয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কবি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমার রচিত "কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য" সম্পর্কিত আমার পরিকল্পনা ও ভারত সেবক সংঘ নামীয় পুস্তিকা পড়িয়া দেখিলেন। কবি অতঃপর রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে আমার সহিত কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাদি জানিয়া লইলেন...।

'আমার "কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য" পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া কবি আমাকে শান্তিনিকেতনের মিঃ এলমহার্স্ট মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন।... আমার পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া ও আমার সহিত আলোচনা করিয়া মিঃ এলমহার্স্ট'ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে সংশ্লিষ্ট রাখিবার প্রস্তাব করেন এবং কবিকে

সমন্তও করাইলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিশেষ কারণে আমার শান্তিনিকেতনের চাকুরী গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

'কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াই আমাদের "পথ" পত্রিকা ও সাধারণ কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে কবির নিকট পত্র লিখিলাম। তিনিও সর্বরূপ সহানুভূতি জানাইয়া জবাব পাঠাইলেন এবং সেই পত্রের সহিত "পথ" পত্রিকায় মুদ্রিত করিবার জন্য একটি কবিতাও পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটি "পথে"র প্রথম সংখ্যায়ই মুদ্রিত হইয়াছিল এবং উহা নিম্নরূপ—

"সাধন কি তোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে।
খাঁটি জিনিস হয়রে মাটি নেশার পরমাদে॥
কথায় তো শোধ হয় না দেনা, গায়ের জোরে জোড় মেলে না—
গোলমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ফাঁদে॥
কে বলতো বিধাতারে তাড়া দিয়ে ভোলায়।
সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে যাচ্ছকরের ঝোলায়॥
মস্তো বড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,
ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশের ফাঁদে॥"

'...শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে শান্তিনিকেতনের জন্য একজন সুদক্ষ লাঠি-শিক্ষক নিয়োগের কথায় আমি আমার ছাত্র শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্তীকে সঙ্গে করিয়া কবির তিরোধানের অল্প কিছুদিন পূর্বে পুনরায় শান্তিনিকেতনে যাই এবং উহাই কবির সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ' ['বিপ্লবী পুলিন দাস', ২৮০-'৮৩ পৃঃ)।

১৯২৬ সনে ঢাকায় বেশ কিছু বিপ্লবী একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চান। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় তাঁর 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ ও সশস্ত্র বিপ্লব' অধ্যায়ে (২৯৭-৩০৭ পৃঃ) তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন (১৯৪০ সনের প্রথম দিকে ভূপেন্দ্রকিশোর আর একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন আরো দুই বিপ্লবী মেজর সত্য গুপ্ত ও রসময় শূরের সঙ্গে। —প্রবন্ধকার)। ভূপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন যে কবি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন এই বলে: ..'বিপ্লব সহিংস বা অহিংস পথে আসুক, তা নিয়ে আমি ভাবিত নই; কিন্তু কোন পথেই প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতা বা নীচ অভিব্যক্তি যেন

থাকলে তার পরিণতি আত্মঘাতী।...আবার বলি, সারা দেশের প্রত্যেকটি কানে সর্বমুখর বিপ্লবের বাণী যদি না পৌঁছে দিতে পার, তবে তোমাদের দুর্বার চেষ্টায় ইংরেজ পালালেও তোমরা বেঁচে থাকবে না। তার মানে, তোমাদের আদর্শ বেঁচে থাকবে না। অত জনতার পুরোভাগে এসে তারাই নেবে করের পূর্ণ ভাগ যারা এতকাল অন্যায় ও অসত্যকে সমাজের প্রতি স্তরে একান্ত লোভে লালন করে এসেছে'।

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও একবার চুঁচুড়ার সুবোধ রায় মহাশয়ের সঙ্গে জোড়াসাঁকো গিয়েছিলেন কবির আমন্ত্রণে আর তারপর আরো একবার সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, আশুতোষ দাস ও অরুণচন্দ্র গুহ-র সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। দু'বারের বিবরণই পাওয়া যায় ডাঃ যাদুগোপালের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তে (৪৬৯-'৭২ পৃঃ) যদিও সেখানে কোন উল্লেখ নেই ঐ দুই সাক্ষাতের সন তারিখের। যাদুগোপাল লিখেছেন : '...কবির লেখাগুলি বনে-জঙ্গলে সর্বপ্রকার বিপদের মাঝে কি পরিমাণ যে আত্মিক খোরাক যুগিয়েছিল তা আর বলে শেষ করা যায় না। · বললাম, তাঁর সম্বন্ধে তো আমাদের লুটের অধিকার জন্মে গেছে। কবি খুব হাসলেন। এণ্ড্রুজ সাহেবকে বললেন—'Andrews, I can understand these young men, I don't understand the other variety, the tame variety' (ঐ, ৪৬৯ পৃঃ)।

যাদুগোপাল আর এক জায়গায় লিখেছেন : '.. কবি অনেক কথা বললেন, একাল ও সেকালের। দেশ কি ছিল, কি হয়ে গিয়েছে। তিনি বিপ্লবের একটা ব্যাখ্যা দিলেন। বিপ্লব মানে 'ধ্বংস' কোনদিনও নয়। একটার জায়গায় আর আর একটা কিছু ভরে থাকবে। নিজেদের চেষ্টায় আত্মশক্তিতে জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলি গড়ে ওঠানোই 'বিপ্লব'। ভাঙা মানেই সেই জায়গায় আর একটা কিছু গড়ে তোলা। নিজেদের সংস্কৃতির যেগুলির সর্বজনীন দিক আছে তা বাঁচবেই। তাকে বাঁচিয়ে যাওয়া একটা তপস্যা' (ঐ, ৪৭১ পৃঃ)।

যাদুগোপাল লিখেছেন আসার সময়ে কবিকে তিনি বলেছিলেন : '...যে জীবন আপনি যাপন করেননি, আমরা করেছি—তাও লিখেছেন একেবারে বাস্তব করে। তাই আবার প্রণাম করি কবি, ঋষি ও দ্রষ্টাকে' (ঐ, ৪৭১ পৃঃ)। কবি ডাঃ যাদুগোপালকে সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলেন ডাক্তার হিসেবে। যাদুগোপাল

লিখেছেন: 'আমি কলকাতায় ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপ করেছিলাম। তাঁদের মত হল না' (ঐ, ২৭২ পৃঃ)।

১৯৩১ সনে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের একবার সুযোগ হয়েছিল কবির সঙ্গে দেখা করার। সেখানে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা এখনো কোথাও প্রকাশিত হয়নি, গোপালবাবুও এখনো পর্যন্ত লেখেননি তাঁর 'রূপনারাণের কূলে'। তবে কথাটা তাঁর মুখে শুনেছি বহুবার। তাঁর অনুমতি নিয়ে এবং লেখার এই অংশটি তাঁকে দেখিয়ে তবে ঘটনাটি লিখছি যেমন শুনেছি তাঁর মুখে: "হিজলি হত্যাকাণ্ডের দু'চার দিন পর আমি একদিন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলাম আমার কাজে। তিনি তখন বেরোচ্ছিলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকেও নিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে। জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে, ('বিচিত্রা'র আসর বসত সেখানে—প্রবন্ধকার) দোতলার এক ছোট ঘরে আমরা কবির দেখা পেলাম। কবিকে আমার পরিচয় দেবার পর সুনীতিকুমার শুরু করলেন তাঁর কাজের কথা। আমি বসে রইলাম একপাশে। কবির মন বিচলিত বোধ হল—সম্ভবত হিজলির ঘটনায়। আলোচনা তাই অনতিবিলম্বে ঘুরল সে প্রসঙ্গের দিকেই। সুনীতিকুমার কবিকে তখন জানালেন যে আমিও জড়িত আছি ঐ-সব কাজকর্মে। শুনে কবি আমাকে প্রশ্ন করলেন, এই কি চলবে? এই খুনোখুনি আর তার পাল্টা খুনোখুনি? এতে কি তোমাদের লক্ষ্য সিদ্ধি হবে? আমি তখন সবিনয়ে বললাম, যদি অনুমতি করেন তো দু'একটা কথা বলি। কবি সাগ্রহে বললেন, বলো, বলো। আমি বললাম, আমরা যে এই রক্তপাত পছন্দ করি তা নয়। তবে আমরা মনে করি যে অল্পলোকের এই চরম আত্মদান একদিন আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে অন্তত ন্যূনতম আত্মত্যাগের স্পৃহা। দেশের স্বাধীনতা অর্জন তবেই সম্ভব হবে।

মনে হল কবি তেমন আমল দিলেন না ঐ 'propaganda by action'-এর যুক্তিতে। বললেন, ঐভাবে বাইরে থেকে উত্তেজনা যুগিয়ে স্থায়ীভাবে জাগানো যাবে না দেশের মানুষের মন।

আমি বললাম, আর একটা কথা। আমরা যখন দেখি সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের মুষ্টিমেয় কিছু লোক এই প্রাচীন দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের উপর যথেচ্ছ আধিপত্য ও অত্যাচার চালাচ্ছে তখন মনে হয় যে এ আমাদের মনুষ্যত্বের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। এর জবাব যদি আমরা যেভাবে পারি না দিতে পারি তা হলে আমরা খাটো হয়ে যাব নিজেদের কাছেই।

কবি চোখ বুঁজে, যেন মনের গভীরে তলিয়ে গিয়ে শুনছিলেন আমার কথা। ঐভাবে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অবশেষে বললেন, বুঝলাম তোমাদের অন্তরের যন্ত্রণা। কিন্তু ব্যাপারটাকে তো ওভাবে দেখলে চলবে না। আসলে এ দেশে যা ঘটছে তা পৃথিবীজোড়া সমস্যারই অঙ্গ। কাজেই সেই বড় প্রশ্নের জবাব দিতে হবে বড়ভাবে। ভারতবর্ষের উপর পড়েছে সেই দায়িত্ব। উত্তেজনায় অধীর হয়ে যেভাবে পারি জবাব দিলে তো তাই চলবে না।

গোপালবাবু বললেন, এর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে রাজবন্দী হলাম। আর তারপর একদিন বন্দীনিবাসে হঠাৎ হাতে এল কবির "প্রশ্ন" কবিতা। চমকে উঠলাম পড়ে, মনে হল এতে যেন ছায়া পড়েছে সেদিনের কথাবার্তার।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২৫ সালে দেশে ফিরে এসে 'রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আহূত হইয়া শান্তিনিকেতনে যান' ('অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস', ২৫৪ পৃঃ) নলিনী গুপ্ত ও প্রতিবাদী আচার্যের মতো বিপ্লবীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ও পত্রালাপের উল্লেখও ঐখানে পাওয়া যায়। নলিনীকিশোর গুহ মহাশয়ও যে একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন তা জানা যায় তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে (৪ সংস্করণ, ৭৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা)। সেখানে সাক্ষাতের বিশদ কোন বিবরণ নেই, যেটুকু খবর আছে তার আলোচনা একটু পরে করব ভিন্ন প্রসঙ্গে।

কবির বিদেশভ্রমণের সময়েও কোন কোন নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। যেমন প্রভাতকুমার ১৯২৬ সনে প্যারিসে শ্রীধর রাণার (তাঁর আসল নাম সর্দারসিংজী রাওজী রাণা—প্রবন্ধকার) সঙ্গে কবির সাক্ষাতের কথা লিখেছেন ('রবীন্দ্রজীবনী' ৩ খণ্ড, ৬৮-৬৯ পৃঃ)। রাণাজীর ছিল জহরতের ব্যবসা কিন্তু মাদাম কামার সহকর্মী হিসেবে একদা তিনি তাঁর জহরতের সঙ্গে ভারতবর্ষে চালান করতেন পিস্তল, বিস্ফোরকও। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁকে নির্বাসিত করা হয় মার্টিনিক দ্বীপে। সেখানে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হয় ঐ বিপ্লবীর জার্মান স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র, রণজিতের। ঐ রণজিতের নামেই রাণাজী পরে তাঁর গ্রন্থাগার দান করেন 'বিশ্বভারতী'কে। রাণাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কবির সঙ্গে মাদাম কামার দেখা হয়েছিল কিনা তার খবর জানি না—তাঁরও তো তখন প্যারিসেই থাকার কথা।

বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (ইনি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভাই—প্রবন্ধকার) সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ১৯২৬ সনে দেখা হয় বার্লিনে।

তখন কবির সঙ্গে ছিলেন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশও ছিলেন কবির সহযাত্রী। বীরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: 'সত্যিই অসাধারণ মানুষ। কবি ও লর্ড সিংহ, দু'জনেই মুগ্ধ হলেন বীরেন চট্টোর মনের পরিচয় পেয়ে। তিনি সেই সময় বার্লিনের শহরতলীতে একটা ইস্কুলে মাস্টারী করছেন। খুব মোটা রকমের পোষাক এবং সেই রকমই অত্যন্ত মোটা রকমের জীবনযাত্রা।... খুব বামপন্থী মতামত কিন্তু স্বদেশপ্রেমের প্রতিমূর্তি যেন।...কবি এবং লর্ড সিংহকে একদিন বললেন: আমার একটি মাত্র ইচ্ছে একবারে দেশে ফিরে যাবার। এই আকাঙ্ক্ষা আপনারা দু'জনে মিলে যেমন করে হোক পূর্ণ করুন। কবি লর্ড সিংহকে মিনতি করে বললেন বৃটিশরাজের আপনার কথার উপরে আস্থা আছে এবং আপনার অনেক উঁচু স্তরের লোকেদের সঙ্গে বন্ধুতাও আছে। আপনি চট্টোকে সুপারিশ করলে হয়ত ওরা ক্ষমা করতেও পারে। লর্ড সিংহ কবিকে কথা দিলেন যে ফিরে গিয়েই তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করবেন এবং কি ফলাফল হল কবিকে জানাবেন। একদিন চিঠি এল কবির কাছে যে বৃটিশ রাজনীতির উপরের লোক, যাদের হাতে চট্টোর ভাগ্যের কলকাঠি আছে তাদের বিশেষ অনুরোধ করেও কোন ফল হয়নি।... সেদিন যখন বীরেন আবার কবির কাছে জানতে এলেন যে লর্ড সিংহের কাছ থেকে খবর এসেছে কিনা কবি চিঠিটা পড়ে শোনালেন। ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, শুধু জলে চোখ ভরে এল। পরে বললেন: এই আশঙ্কাই করেছিলাম। তবে মনে হয়েছিল লর্ড সিংহের এত ইনফ্লুয়েন্স আছে যে হয়ত উনি চেষ্টা করলে হতেও পারে। আমার ভারতবর্ষের মাটিতে মরা হল না' ('কবির সঙ্গে য়ুরোপে', ১৭৩-'৭৫পৃ:)।

সত্যই দেশের মাটিতে আর মরা হয়নি বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথের। দুঃখের বিষয় তাঁর ও রাণাজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ আলোচনার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গেও সেবার কবির দেখা হয় জার্মানিতে। তার কোন বিবরণও প্রকাশিত হয়নি কাগজপত্রে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার, তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ অবশ্য অধিকাংশ বিপ্লবীরই হয় নি। তাঁরা দূরের থেকেই তাঁকে জানিয়েছেন তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা ভালবাসা। এর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত ১৯৩১ সনে বক্সা দুর্গে আটক রাজবন্দীদের কবির কাছে অভিনন্দন-পত্র পাঠানোর ঘটনাটি। তাঁদেরই একজন, শ্রীপ্রমথ ভৌমিক লিখেছেন: 'সেবার রবীন্দ্রনাথের ৭০-তম জন্মোৎসব। সারা দেশে সাড়া পড়ে গেছে।...বক্সা বন্দীশালায়ও সেই ঢেউ এসে পৌঁছল। "বক্সা

লিটারারি এসোসিয়েশন" রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালনের তোড়জোড় করতে আরম্ভ করলেন। এই লিটারারি এসোসিয়েশন ছিল সকল দলের এক মিলিত সংস্থা।··· দুর্গের মধ্যে একটা টিনের লম্বা ঘরের মতো ছিল। সেই লম্বাটে জানলা কেটে তাকে একটা হলের রূপ দেওয়া হয়েছিল। সেই ছিল বন্দীদের সাধারণ মিলনস্থান। · ঠিক হল ঐ হলেই উৎসবের আয়োজন করা হবে। বন্দীদের মধ্যে একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী ছিলেন। নাম শ্রীসুধীর বসু। রবীন্দ্রনাথের একটা প্রতিকৃতি আঁকার ভার তাঁকে দেওয়া হল। অভিনন্দন-পত্র রচনার ভার পড়ল অমলেন্দু দাশগুপ্তের উপর।···প্রথম মহাযুদ্ধের যুগে বিখ্যাত বিপ্লবী 'বাঘা যতীনে'র নেতৃত্বে বালেশ্বরের বুড়ী বালাম নদীর তীরে যে পঞ্চ বীর বিপ্লবী বৃটিশবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে লিপ্ত হন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। অমলেন্দু ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। · তিনি কত উঁচু দরের লেখক ছিলেন তার পরিচয় রেখে গেছেন 'ডেটিনিউ' ও 'বক্সা ক্যাম্প' নামে দুটি বইয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে অমলেন্দুবাবু এখন আর জীবিত নেই' । ('বক্সা বন্দীশালায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব', পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৭৬, ১০৬৫-'৬৯ পৃ:)।

অমলেন্দুবাবুর লেখা সেই অভিনন্দন-পত্র শুরু হয়েছিল এইভাবে: 'ওগো কবি, আমরা তোমায় করি গো নমস্কার। সুদূর অতীতের যে পুণ্যপ্রভাতক্ষণে তোমার আবির্ভাব, আজ বাংলার সীমান্তে বসিয়া আমরা বন্দীদল তোমার সেই জন্মক্ষণটিকে বন্দনা করি। আর স্মরণ করি বিরাট মহাকালকে যিনি সেই ক্ষণটির দ্বারপথ উন্মুক্ত করিয়া এই দেশের মাটির পানে তোমাকে অঙ্গুলি ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়াছেন'।

ঐ অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে কবি 'বক্সা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি' উদ্দেশ্য করে পাঠান তাঁর সেই সুপরিচিত 'প্রত্যভিনন্দন' :—

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।

মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।
'অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

শ্রীপ্রমথ ভৌমিক লিখেছেন: '· আমরা ভাবতেও পারিনি সেবারের সারা দেশব্যাপী উৎসব ও শত শত অভিনন্দনের মধ্যে সামান্য কয়েকজন বিপ্লবী বন্দী প্রেরিত অভিনন্দন-বাণী কবির মনে কেন রেখাপাত করবে।···কবিতাটি পড়ে বন্দী বিপ্লবীরা সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কবির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা শতগুণ বেড়ে গেল' (ঐ, ১০৬৮-'৬৯ পৃ:)।

কবির ঐ 'প্রত্যভিনন্দনে'র শেষ পঙ্‌ক্তি সম্পর্কে বিপ্লবীদের অভিনন্দন-পত্র রচয়িতা, অমলেন্দু দাশগুপ্ত তাঁর 'বক্সা ক্যাম্প' বইয়ে লিখেছিলেন: '···শেষ কথাটিতে কবি প্রশ্ন করেছিলেন—"বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়?" উত্তরে আজ তার বলিতে পারি না, আমি বা আমরা। অপরের কথা জানি না, কিন্তু নিজের কথা যতটুকু জানি, তাহাতে বলিতে পারি যে, বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের পরিচয় অন্তত আমি দিতে পারি নাই। আমার মুক্ত পরিচয় আমার কাছে এখনো অনুদ্ঘাটিত রহিয়াছে বাহিরের শৃঙ্খলচ্ছন্দে তাহার পরিচয় দেওয়ার কথা তো ওঠেই না' ('বক্সা ক্যাম্প', ১৫৪ পৃ:)।

অমলেন্দুবাবুর এক বিপ্লবী-বন্ধু, শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় এ-সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'আজ মনে হয় অমলেন্দুবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা পূর্ণ করার পথে চলেছিলেন বলেই তাঁর মনে ঐ প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁর জিজ্ঞাসার মধ্যেই এর উত্তর রয়েছে। অমলেন্দুবাবুই লিখেছেন: "কিন্তু কবি এমন কথা কেন লিখিলেন? অমৃতের পুত্র মোরা, এ কথা তো আমরা জানি না, বিশ্বময় জানানো তো অনেক পরের কথা। কেন কবি আমাদের সম্বন্ধে লিখিলেন' 'আত্মারে কে জানিল অক্ষয়'? অথচ শুনিতে পাই 'ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রচনা মিছে না কহে'। প্রত্যভিনন্দনে আমাদের সম্বন্ধে ঋষি কবির উক্তি কি প্রকৃতই সত্য—ইহাই প্রশ্ন"।

'অমলেন্দুবাবু যদি মনে করে থাকেন যে, বিপ্লবীরা দল বেঁধে 'মুক্তি'র পরিচয় দেবে তবে তাঁর আশা সফল হয় নি। কিন্তু বিপ্লবীদের অনেকে তাঁদের ব্যক্তিক-জীবনে যে 'মুক্ত' হয়ে গেছেন তা'তো শহিদদের জীবনেই অমলেন্দুবাবু লক্ষ্য করেছেন' ইত্যাদি ('সবার অলক্ষ্যে', ২ পর্ব, ২৬৬-'৬৭ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, বিশেষ করে তাঁর গান ও কবিতা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল বিপ্লবীদের উপরে। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'History of the Freedom Movement in India' গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : '... some of his finest poems could only be interpreted as an admiring appreciation of the selfless and fearless terrorist revolutionary. In any case we have the confession of terrorists that they found encouragement in and drew inspiration from the soul-stirring poems of Rabindranath. More than one of them, now grown old as settled house-holders, have des- cribed how, when hunted by the police from one place to another, in hills and jungles, and deprived of any company, they found their only solace in singing by brook-side, in evenings or dark nights, those songs or poems which urged them to move forward, even if everyone deserted them, amid thunder and lightening, with a heart made of steel and an adamant resolve' (২ খণ্ড, ৪৭৫-'৭৬ পৃঃ)।

ডাঃ মজুমদার এ-প্রসঙ্গে যে কবিতা বা গানগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল :

'যে তোরে পাগল বলে
তারে তুই বলিসনে কিছু,
আজকে তোরে পাগল ভেবে
আজ যে তোর ধুলা দেবে
কাল সে প্রাতে আপন হতে
আসবে যে পিছু পিছু' ইত্যাদি।

'হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়' ইত্যাদি।

'যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা।

যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে
ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে ;
যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিয়ে আলো
সবায় যে তুই করবি কালা' ইত্যাদি।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে,
যদি আলো না ধরে, ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলরে' ইত্যাদি

আর 'বন্দীবীর' কবিতার বিভিন্ন কলি। ডাঃ মজুমদার লিখেছেন 'বাঘা যতীন' ও তাঁর সঙ্গীদের অসমসাহসিক সংগ্রামের পর কেউ কেউ নাকি ঐ কবিতাটি আবৃত্তি করতেন এইভাবে একটি পঙ্‌ক্তির সামান্য রদবদল করে :

'বুড়ী বালামের তীরে
ভক্তদেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কিরে।
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী-সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে' ইত্যাদি। ঐ, ১৭০-'৭১ পৃঃ ।।

শ্রীনলিনী কিশোর গুহও ডাঃ মজুমদারের তালিকার শেষের পর প্রথম তিনটিরই উল্লেখ করেছেন তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদে' (৪ সংস্করণ, ২৭ পৃঃ), তবে তার সঙ্গে যোগ করেছেন কবির 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান' গানটি।

এ ছাড়াও কবির অসংখ্য কবিতা ও গানের লাইন সেদিন বিপ্লবীদের মুখে মুখে ফিরত। তাঁরা মনে করতেন ওগুলি তাঁদের জন্যই বা তাঁদের উদ্দেশ্যেই লেখা। শ্রীপ্রমথ ভৌমিকের যে লেখাটির উল্লেখ করা হয়েছে এর আগে তা'তেও আছে : '...বিপ্লবীদের মনে হ'ত রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা যেন তাঁদের আহ্বান করেই লিখিত। "তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান—রুদ্রের ভৈরব গান"—রুদ্রসাধক বিপ্লবীরা মনে করতেন তাঁদের পথও তপ্ত রৌদ্রের পথ—রুদ্রের ভৈরব গানে ঝঙ্কৃত পথ। "পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা। নিন্দা দিবে

আর অপবাদ, এই তোর রুদ্রের প্রসাদ'—বিপ্লবীদের ছাড়া আর কাদের উদ্দেশে করে কবির এই কবিতা? কবি লিখলেন:

'চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক—
গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্কবিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি"।

বিপ্লবীরা ভাবতেন—তাঁদের ছাড়া আর কাকে লক্ষ্য করে কবির এই কবিতা হতে পারে। (ঐ, ১০৬৯ পৃঃ)।

তেমনি

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'।

অথবা

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন'?

আর 'এবার ফিরাও মোরে'র বিভিন্ন লাইন বিপ্লবীদের যেমন মুখে মুখে শোনা যেত তেমনি দেখা যেত তাঁদের পত্রিকার পাতায় বা সভাসমিতির সাজসজ্জায়।

ঐসব গান বা কবিতা পড়লেই বোঝা যায় বিপ্লবীদের তরফে সেদিন এগুলির অত সমাদর ঘটেছিল কেন। কিন্তু কবির যেসব কবিতা এগুলির চাইতে অনেক কম প্রাসঙ্গিক বোধ হতে পারে একালে, সেগুলিও মাঝে মাঝে তাঁরা নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে লাগিয়েছেন তাঁদের কাজে—এমন কি অনেক সময়ে মনে করেছেন যে ঐ কবিতা রচনার পিছনেও আছে তাঁদের সংক্রান্ত বিশেষ কোন ঘটনা। শ্রীনলিনীকিশোর গুহ তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদে' (৪ সংস্করণ, ৭২-৭৩ পৃঃ) লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে—"লেগেছে অমল ধবল

পালে মন্দ মধুর হাওয়া।" কবি কি উদ্দেশ্যে গানটি লিখিয়াছিলেন কবিই বলিতে পারিতেন কিন্তু বিপ্লববাদীরা সেই গানের মধ্যেও তাহাদের কথাই শুনিল। কোন কোন বিপ্লববাদীর মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ গানটি লিখিয়াছিলেন নবীন বাংলার এই নূতন বিপ্লবপথের যাত্রাকে লক্ষ্য করিয়া। এমনটি দেশে আর হয় নাই, একেবারেই নূতন, তাই কবি লিখিয়াছেন 'দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া'। দেশের কাব্য, সাহিত্য সকলই তাহারা তাহাদের বিপ্লবের দিক হইতে বুঝিতে চাহিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানের বিকৃত অর্থ দেখিয়া হয়ত হাসিতেন কিন্তু বিপ্লববাদীরা তাহাদের প্রয়োজনে এমন করিয়াই অনেক জিনিস বুঝিয়াছে'। নলিনীকিশোর এখানে পাদটীকায় যোগ করেছেন 'রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে তাঁহার গানের ব্যাখ্যা দেখিয়াছিলেন। লেখক সেই প্রসঙ্গ তুলিলে কবি হাসিয়া বলেন, তোমার ব্যাখ্যা দেখিয়াছি। ব্যাখ্যা ঠিক, ইহাও বলেন নাই, ব্যাখ্যা ভুল, ইহাও বলেন নাই। লেখকও অহেতুক কৌতূহল দেখাইতে সাহসী হন নাই' (ঐ, ৭৩ পৃঃ)।

আবার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৪৮ সনে প্রথম প্রকাশিত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি' প্রবন্ধে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ঠিক ঐ গানটিরই ব্যাখ্যার কথা লিখেছেন। ব্যাখ্যাটি এই রকম: '..."তরণী" হল ship of state—"অমল ধবল পাল" হল গিয়ে আমাদের political consciousness, feudal যুগেরই পাল-তোলা জাহাজ; তবেই "মন্দ মধুর হাওয়া" কিনা moderate, liberal movement এই দাঁড়াল" ইত্যাদি। তবে ভূপেন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা আমরা তাঁর লেখায় বা তাঁর মুখ থেকে পাইনি। আর ধূর্জটিপ্রসাদের লেখায় ভূপেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গটি আনা হয়েছে কিছুটা কৌতুকভরে। তাই ব্যাপারটিতে কিছুটা সংশয় থেকে যায় শেষ পর্যন্ত।

ডাঃ যাদুগোপাল তেমনি লিখেছেন: '...বালেশ্বরের যুদ্ধের ঘটনা (অর্থাৎ 'বাঘা যতীনে'র মৃত্যুবরণ-সংক্রান্ত ঘটনা—প্রবন্ধকার) কি বিশ্বকবির মনকে স্পর্শ করেছিল? তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন। ঐ সময়কার তাঁর একটি রচনা পড়ে এই কথাটা ভাবি। কবি লিখে গেছেন:

"ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল!"

—কারা তাঁর পাগল চাঁপা ও উন্মত্ত বকুল' ?

('বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', ৪০০ পৃঃ)

বিপ্লবীদের লেখা প্রায় প্রত্যেকটি বই বা স্মৃতিকথায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতার লাইন আর শরৎচন্দ্রের উল্লেখ। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' ও 'সবার অলক্ষ্যে' বইটির প্রথম পর্বে তো তার উপরেও আছে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে স্বতন্ত্র অধ্যায় ('ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবে'র ১৮ অধ্যায়ের নাম 'রবীন্দ্রনাথ ও সশস্ত্র বিপ্লব,' ২৯৭-৩০৭ পৃঃ আর 'সবার অলক্ষ্যে'র ১ পর্বের ৭ অধ্যায় হল 'বিপ্লবীর জীবনে রবীন্দ্রনাথ', ১১৫-'২৪ পৃঃ)। 'সবার অলক্ষ্যে'র দ্বিতীয় পর্বে ভূপেন্দ্রকিশোর প্রেসিডেন্সি জেলের একটি সাহিত্যিক আড্ডা'র কথা লিখেছেন যার সদস্য ছিলেন রাখাল দত্ত, কোহিনূর ঘোষ, অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়। '...এই বন্ধুচক্রের প্রাণ-প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রকাব্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সমালোচনা বড় বেশি হত না, হত কাব্যপাঠ—তন্ময় স্তব্ধতায় পাঠ।· এই রসকেন্দ্রটির মধ্যমণি ছিলেন অমলেন্দু দাশগুপ্ত। রবীন্দ্ররচনা বেশির ভাগই পাঠ করতেন অমলেন্দুবাবু ও ভূপেনবাবু। কোহিনূরবাবু ও রাখালবাবু ছিলেন অদ্ভুত নীরব শ্রোতা। এমন আত্মহারা হয়ে যাওয়া শ্রোতা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে পাওয়া খুবই মুস্কিল।

একদিন কবিতা পাঠ হচ্ছে। ঘরের আবহ স্তব্ধ। দু'একজন বাইরের লোকও আছেন। রাখালবাবু ও কোহিনূরবাবুর কাছে ইহলোকের অস্তিত্ব যেন গৌণ হয়ে গেছে। অমলেন্দুবাবুও সেদিন শ্রোতা। তাঁর দীর্ঘায়ত চোখ দুটি নিমীলিত হয়ে আছে, তাঁর সর্বাঙ্গ একটি অনবদ্য পুলকসঞ্চারে তপস্যানিরত রূপ গ্রহণ করেছে। সেদিন যে-রূপটি অমলেন্দুবাবুকে ঘিরে প্রকাশিত হয়েছিল তা সাধকের রূপ' (ঐ, ২৬৫-'৬৬ পৃঃ)।

শ্রীসংঘের বিশিষ্ট নেতা, অনিল রায় মহাশয় সম্পর্কেও ভূপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন ' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কাব্য-গানে পরিব্যাপ্ত তাঁর সত্তা দলের ছোট বড় সকলকে রূপ, রস ও গন্ধে ভরা পৃথিবীর বড়ই কাছাকাছি নিয়ে যেত।·· বন্ধুদের অনেকেরই বড় ভালো লাগত তাঁকে যখন তিনি একান্তে রবীন্দ্রনাথের গানে তন্ময় হতেন। একদিনের কথা বলি। সেটা হবে ১৯৪৬ সালের এক সন্ধ্যা। ঠিক সন্ধ্যা নয়, সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। সেন্ট্রাল জেলের একটি সেলে বসে গুনগুন করে একা একা সুর ভাঁজছিলেন অনিলবাবু।· সন্ধ্যায় এলেন দুটি বন্ধু অনিলবাবুর সেলে। তাঁরা ঢুকতেই গানের সুর থামিয়ে হাসিমুখে অনিল বাবু বললেন, "কি খবর"?—"খবর কিছু নেই। গান শুনবো।"— "শুনবে? আচ্ছা, একটি মাত্র গান শোনাব, তারই সুর ভাঁজছিলাম এতক্ষণ।"—"ঠিক

আছে"। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।···তারপর শুরু হল গান।···একেবারে অন্য মানুষ।. একেবারে অন্য জগতের। গাইছেন, "রোদনভরা এ বসন্ত, সখী, কখনো আসে নি বুঝি আগে" · বহুক্ষণ ধরে গেয়ে গেয়ে থেমে গেলেন এক সময়। থমথম করছে বাইরের আকাশ ও পৃথিবী' ('সবার অলক্ষ্যে', ১ পর্ব, ১৫২-'৫৪ পৃঃ)।

ভূপেন্দ্রকিশোরের নিজের প্রসঙ্গেও এটি উল্লেখযোগ্য যে তাঁর 'বেণু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল কবির।

'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী'

গানটি আর তারপর তাঁর সম্পাদনায় 'চলার পথে' নামে যে মাসিকপত্রিকাটি বেরোয় তারো প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা—'চলার পথে'—

'চলার পথের যত বাধা
পথ বিপথের যত ধাঁধা
পদে পদে ফিরে ঘ'রে,
পথের বীণার তারে তারে'

('সবার অলক্ষ্যে', ১ পর্ব, ২০৪ পৃঃ)।

সেদিনকার বিপ্লবী বন্দীদের মধ্যে ছিলেন গোপাল হালদার বা সরোজ আচার্যের মতো সাহিত্য-রসিক, উত্তরকালে যাঁদের অসংখ্য মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য বিষয়ে।

বিপ্লবীরা রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা কেন ভালোবাসতেন, কি চোখে তাঁরা সেগুলিকে দেখতেন—এতো হল তারই একটা সাধারণ বিবরণ। এবার দেখা যেতে পারে বিশেষ কোন এক বিপ্লবী তাঁর বিপ্লবী জীবনের এক চূড়ান্ত মুহূর্তে কিভাবে প্রেরণালাভ করেছেন কবির বিশেষ কোন একটি গান বা কবিতা থেকে।

আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রথমে সেশন আদালতে যখন উল্লাসকর দত্ত ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয় তখন 'শোনা যায়, ফাঁসির হুকুম হইয়া গেলে উল্লাসকর গান ধরেন "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"' ('ভারতে জাতীয় আন্দোলন'—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৫০ পৃঃ)। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'History of the Freedom Movement in India'-র দ্বিতীয় খণ্ডে এই ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে: '···One day

when the prisoners were assembled in the court room some time before the judge was due, one of them began to sing a patriotic song' (ঐ, ২৭৭ পৃ:)। তিনি তারপর উদ্ধৃত করেছেন 'সার্থক জনম আমার' গানটির কয়েক লাইনের ইংরেজী তর্জমা। তারপর লিখেছেন: 'It is reported that there was a pin-drop silence when this song was being sung in a melodious tune, with a feeling of pathos natural to one who was perhaps going to close his eyes very soon for serving his motherland. The lawyers, visitors and even the menials who crowded the room, listened with rapt attention, with tears flowing from their eyes and nobody thought of stopping the young man, almost a boy, who poured out the inmost thought and desire of his mind in a melodious strain' (ঐ, ২৭৭ পৃ:)।

লক্ষ্য করতে হবে এখানে কোন উল্লেখ নেই গায়কের নামের বা ঘটনাটি যে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হওয়ার পর ঘটেছিল এমন কোন কথার। তবে গানটি একই।

আবার ঐ মামলারই অন্যতম আসামী, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সুপরিচিত 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় লিখেছেন: '...মকদ্দমা আরম্ভ হইবার এক বৎসর পরে যখন রায় বাহির হইল তখন দেখা গেল অরবিন্দবাবু মুক্তি পাইয়াছেন। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির আর দশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া উল্লাসকর হাসিতে হাসিতে জেলে ফিরিয়া আসিল, বলিল "দায় থেকে বাঁচা গেল।" একজন ইউরোপীয় প্রহরী তাহা দেখিয়া তাহার এক বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন—Look, look! the man is going to be hanged and he laughs!. তাঁহার বন্ধু আইরিশ, তিনি বলিলেন—Yes, I know, they all laugh at death.' (ঐ, ৮ সংস্করণ, ৬৩ পৃ:)

এখানে ফাঁসির হুকুম শোনার পর উল্লাসকরের কথাবার্তার উল্লেখ রয়েছে কিন্তু ঐ গান গাওয়ার কোন কথা নেই।

আবার ঐ মামলার আর এক আসামী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বেশ পরিষ্কার করেই লিখেছেন: '...বস্তুত শ্রীউল্লাসকর কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া গাহিয়াছিলেন বিশ্বকবির বিশ্ববিশ্রুত জাতীয় সঙ্গীত—"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"' ('ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা', ১২৭ পৃ:)।

সব মিলিয়ে উল্লাসকরের ঐ গান গাওয়ার ঘটনাটি সত্য বলেই মনে হয়। উল্লাসকর প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনাও এখানে উল্লেখযোগ্য : '...১৯০৪ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশীসমাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে গিয়া দেখিতে পান পুলিশ ভিড় সরাইবার জন্ম বেপরোয়া লাঠি চালাইতেছে। পুলিশের এই আচরণ অসহ্য হওয়ায় তিনি প্রতিবাদ করেন। ফলে উল্লাসকরের পিঠে ছড়ি ও ঘুষি বর্ষিত হইল এবং পুলিশ তাঁহাকে থানায় লইয়া যায়। সেখানে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস জামিন দিয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া আসেন এবং ঔষধ দিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা করেন' ('বিপ্লবী বাংলা'—তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী, ১৪৭-'৪৮ পৃ:)।০

বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে কত ভালোবাসতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় ভূপেন্দ্রকিশোরের 'ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থে (৩২১-'৩২ পৃ:)। কলকাতায় 'বেণু' অফিসে পত্রিকা সম্পাদক ভূপেনবাবুর সঙ্গে দীনেশ গুপ্তের একটি আলাপের বিবরণ সেখানে দেওয়া হয়েছে। দীনেশ একদিন ঐ অফিসে একটি প্যাকেট হাতে নিয়ে ঢুকেছিলেন। তার মধ্যে ছিল একটি যুদ্ধবিজ্ঞানের বই আর 'বলাকা' ও 'গীতাঞ্জলি'। ভূপেনবাবু প্রশ্ন করেছিলেন : 'ঐ মেশিনগানের সঙ্গে গীতাঞ্জলির সমন্বয় ঘটবে কি করে, দীনেশ' ? উত্তর পেয়েছিলেন—"বেণু" যেমন করে বিপ্লবের তূর্যধ্বনির সঙ্গে তাল রাখে'। ভূপেনবাবু তাঁকে প্রশ্ন করেন 'আচ্ছা, দীনেশ, তুমি তো ভীষণ চঞ্চল ছেলে, কোন্ বই পড়বার সময় তুমি শান্ত হয়ে যাও ?

—'কবিতা।

—কার কবিতা তুমি স্থির হয়ে পড় ?

—'রবীন্দ্রনাথের।...

—'রবীন্দ্রনাথের কবিতা তোমাকে চঞ্চল করে না ?

—'অভিভূত করে, ক্ষিপ্ত করে না। ভালো লাগে এত বেশি যে আমার রক্তধারা বিবশ হয়ে আসে...আমি স্থির হই'।

এর পর আছে তাঁর প্রিয় কবিতা ও গানগুলি থেকে বিভিন্ন চরণের আবৃত্তির কথা।

দীনেশ গুপ্তের এই রবীন্দ্র-অনুরাগের পৃষ্ঠপটেই বোঝা যায় তাঁর চূড়ান্ত অভিযানের পূর্ব মুহূর্তের ঘটনা। তার এই বিবরণ পাওয়া যায় ভূপেন্দ্রকিশোরের বইয়ে : 'বিপ্লবী বিনয় বসুর নেতৃত্বে দীনেশ ও বাদল রাইটার্স বিল্ডিংসে ঢুকে

কারাধিপতি কর্ণেল সিম্পসন ও অন্যান্য রাজপুরুষদের আক্রমণ করবেন স্থির হয়ে গেছে। লোম্যান হত্যার পর বিনয় বসু আত্মগোপন করে আছেন, মেটিয়াবুরুজে থাকেন গুহ মহাশয়ের গৃহে। দীনেশ ও বাদলকে রাখা হয়েছে নিউ পার্ক স্ট্রীটের এক বাড়ির ভিতরে। মেটিয়াবুরুজ থেকে বিনয়কে রসময় শূর এবং নিউ পার্ক স্ট্রীট থেকে দীনেশ ও বাদলকে নিকুঞ্জ সেন ট্যাক্সি করে খিদিরপুর পাইপ রোডের মোড়ে একই সময়ে নিয়ে আসবেন বলেও স্থির হইল। দীনেশ ও বাদলকে আনবার জন্যে যথাসময়ে নিকুঞ্জ সেন নিউ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে তরুণদ্বয় দুঃসহ কর্মযাত্রার জন্য তৈরের হয়েই কাব্যপাঠে মগ্ন! মৃত্যুপথে পা বাড়াবা'র পূর্ব মুহূর্তে দীনেশ পড়ে যাচ্ছেন:

"শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।"

'বাদল মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেন সেই আবৃত্তি।··· দীনেশ পড়ে যাচ্ছেন:

"যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক।"

'দীনেশ আবার পড়ছেন:

"তারপরে দীর্ঘ পথ শেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে।"

'কিন্তু নিকুঞ্জ সেনের উপস্থিতি টের পেতেই তাঁরা কাব্যগ্রন্থ গুটিয়ে রাখলেন এবং অনায়াসে সৈনিকের ক্ষিপ্রতায় এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ালেন' ('ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব', ৩৩০-'৩১ পৃঃ)।

• এর পরের ঘটনা সকলেরই জানা। আহত দীনেশ ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে। তারপর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আবদ্ধ হলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের এক 'সেলে'। পাশের 'সেলে' ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর, তারিনী মুখার্জিকে হত্যা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত এই দুই তরুণ বিপ্লবীর মধ্যে গড়ে ওঠে এক নিবিড় বন্ধুত্ব। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির আগের দিন রামকৃষ্ণ আবৃত্তি করছিলেন:

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তা'ও হয়নি হারা'

পাশের সেল থেকে দীনেশ জবাব দিলেন কবির কথায়:

'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই'

('সবার অলক্ষ্যে', ১০ পর্ব, ৬৬-'৭ পৃঃ)।

ফাঁসির আসামীর জন্য নির্দিষ্ট ঐ 'সেল' থেকেই দীনেশ ৩.৭. '৩১ তারিখে তাঁর মণিদিকে এক চিঠিতে লেখেন: ..'ভগবান যাকে আপন কাজের জন্য বেছে নেন, তার সুখ, সম্পদ সব কিছু দেন ধুলোয় লুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখারী, রিক্ত, কাঙাল। তিনি যাকে বরণ করেন, মরণ-মালা তারই গলায় পরিয়ে দেন। সে মালা কি সহজ?

"এতো মালা নয় গো, এযে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্র-হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি"।..

'যার প্রাণ আছে প্রেয়কে বরণ করবার জন্য, যার আছে শ্রদ্ধা, সে কি কখনও তাঁর মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে? কি শক্তি আছে এই মিথ্যা মোহের যে তাকে আটকে রাখবে? তাঁর আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না—

"শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।"

'আজ যাই দিদি। এই হয়ত শেষ প্রণাম।

—স্নেহের দীনেশ'

('ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব'—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, ৩৬৯-'৭০ পৃঃ)।

২. ২. '৩১ তারিখে লেখা আর একটি চিঠিতে তাঁর এক ছোট ভাইকে দীনেশ লিখেছেন...'কিছুদিন আগে একটি গান শুনেছিলাম। আজ তার পদগুলো বারে বারে মনে পড়ছে—

"আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।...
বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা
গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ ঢালা
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে।"

'শীতের কুজ্ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিনও ফুরিয়ে এল। আমায় ভুলো না ভাই... ইতি দাদা'।

('সবার অলক্ষ্যে'— ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, ২ পর্ব ৭৫ পৃঃ)।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডগলাসকে হত্যা করার অপরাধে বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। মৃত্যুদণ্ড শোনার পর জেল থেকে এই তরুণ যে চিঠিগুলি লেখেন তার মধ্যে একটি তাঁর বড়বৌদি শ্রীযুক্তা বনকুসুম দেবীর কাছে লেখা। তার মধ্যে আছে এই কথা : "গীতাঞ্জলি"তে আছে :

"আকাশ হতে প্রভাত আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো।
জয়ধ্বনি উঠল রে, উঠল রে"

'এ বাণী আমার অন্তরে স্পন্দিত হচ্ছে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই দেখে যে কবির এই ছন্দ যেন আমার জীবনের প্রতিধ্বনি। আমার এই জীবনের খাতায় যে কবির কোন অক্ষরটিই বাদ যাচ্ছে না। সবই যে সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। এতো গান শোনা নয় বা কাব্য পড়া নয়, এ যে একেবারে মর্মে মর্মে অনুভব' ('ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,' ৩৭৯ পৃঃ)।

মেদিনীপুরের আর এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বার্জকে হত্যা করার অপরাধে দণ্ডিত কিশোর, ব্রজকিশোর চক্রবর্তীও তাঁর মা'কে লেখেন :

...'মা ফিরে আসবার যদি কোন পথ থাকে তবে এই "সব পেয়েছির দেশে" ফিরে আসব—তখন চরণে স্থান দেবেন। আমার মা, মা আমার প্রণাম নিন।

"তবে আমি যাই গো তবে যাই,
ভোরের বেলা শূন্য কোলে ডাকবি যখন 'খোকা' বলে,
বলবো আমি—নাই গো 'খোকা' নাই' মাগো যাই।" ইতি—
প্রণত ব্রজকিশোর' (ঐ, ৩৮৩ পৃঃ)

তাঁর বাবাকেও ব্রজকিশোর লেখেন : '…বাবা, গর্ব করার মতো অত ভগবানের প্রতি বিশ্বাস নেই, তবে যতটা আছে তাতে এইটুকু বলতে পারি, যিনি আপনাদের আমাদের ভগবান তিনি আমার ইষ্টদেবী—

"তারি মাঝে যায় অভিসারে
তার কাছে—জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে ? জানিনা কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী…"। ইতি

প্রণত—ব্রজ

(ঐ, ৩৮৪ পৃঃ)।

বাংলা দেশের গভর্ণর, সরকারী দমননীতির প্রধান নায়ক, স্যার জন এণ্ডারসনকে মারবার জন্ম রণযাত্রায় তৈরী হচ্ছেন দুই তরুণ—ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি বন্দ্যোপাধ্যায়। 'যন্ত্রগুলো পরিষ্কার করছেন মনোরঞ্জন। বুলেটগুলো কাগজ জ্বালিয়ে গরম করছেন উজ্জ্বলা'। একটু হাসিঠাট্টাও চলছে মৃত্যুপথযাত্রীদের সঙ্গে। উজ্জ্বলা দেবী বলছেন ভবানী ও রবিকে : "চুলে লাইমজুস লাগাও, ভালো করে সাজসজ্জা করো—আজ যে বরের বেশে যাচ্ছ দু'টিতে!" · ভবানী ছিলেন দীনেশ গুপ্তের মতোই উচ্ছল যৌবন-চঞ্চল অথচ সুদূরমনস্ক কাব্যরসিক। উজ্জ্বলার কথার সাথে সাথে বলে উঠলেন :

"যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ হে মোর মরণ,
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন,
ছিল কত শত উপকরণ"

('সবার অলক্ষ্যে', ২পর্ব, ১৫৫-'৫৬ পৃঃ)।

১৯৩৫ সনের ৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। শ্রীমতী উজ্জ্বলা মজুমদার (রক্ষিত-রায়) তখন মেদিনীপুর জেলে আটক। ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসির রাতের কথা পরে উজ্জ্বলা লিখেছেন এইভাবে : "…তারপর রাজশাহী জেলের এক অসহ্য রাত।…দুরান্তের অপর এক জেলে বসে শুনি, রাত্রির গভীরে কিশোর বন্ধুর কণ্ঠে তুলে দিয়েছে ফাঁসীর রজ্জু বিদেশী শাসক। মুহূর্তে ধুলায় গড়িয়েছে তাঁর সোনার শরীর। সে দুঃসহ রজনীর ব্যথাবিধুর ইতিহাস জীবনে ভুলবার নয়। কিন্তু তারো মধ্যে ছিল এক পরম বাণী। সারা

যাত সেই বাণীকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম ভবানীরই কণ্ঠে বারে বারে শোনা রবীন্দ্রনাথের একটি গানে—

"কাঁপিবে না ক্লান্ত কর ভাঙিবেনা কণ্ঠস্বর
টুটিবে না বীণা।
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি—
দীপ নিবিবে না।"

('স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী'
—কমলা দাশগুপ্ত, ১৩১ পৃঃ।)

এবার যে বিপ্লবীর কথা বলব তিনি বাংলা দেশ নয়, বিহারের লোক—মজঃফরপুরের বিখ্যাত বিপ্লবী, যোগেন্দ্র শুকুলের ভাই, বৈকুণ্ঠ শুকুল। লোক সেবক সংঘের নেতা ও যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা'র সদস্য, শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত এঁর আত্মদান সম্পর্কে 'সেই মহাবরষার রাঙাজল' নামে চমৎকার একটি লেখা প্রকাশ করেন ১৩৭৫ সনের শারদীয় 'কম্পাস' পত্রিকায়। এই বিবরণ সবটাই তাঁর সেই লেখা থেকে নেওয়া।

১৯৩০ সনে বিভূতিবাবু তখন পাটনা ক্যাম্প জেলে আটক। সঙ্গে বইপত্র বিশেষ নেই, 'চয়নিকা' ও 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া। মাঝে মাঝে তার থেকে তিনি জোরে জোরে কবিতা পাঠ করতেন। দু'একজন বিহারী বন্দী রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হয়ে শুনতে আসতেন, তাঁকে বলতেন বুঝিয়ে দিতে। ধীরে ধীরে 'চয়নিকা' ও 'গীতাঞ্জলি'-কে কেন্দ্র করে শ্রোতা সংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগল। একদিন তিনি 'মরণ মিলন' পড়ছিলেন এমন সময় একটি ছেলে অনুরোধ করল কবিতাটি দেবনাগরী অক্ষরে লিখে দিতে—সে চায় মুখস্থ করতে।

এরপর বৈকুণ্ঠ শুকুল আসত—বসে "চয়নিকা" খুলে পড়ার চেষ্টা করত।···একদিন একটু জোরে জোরে পড়ছিল: "সেই মহাবরষার রাঙা জল, ওগো মরণ, হে মোর মরণ"। এর ঠিক আগের লাইনটা হচ্ছে "আমি করিব নীরবে তরণ।" বললাম—"সমঝা?" শুকুল বললে—"তরণা তো হম্ লোগ্‌কি কহ্‌তে হাঁয়"। বললাম—"ঐসে হী তরণে সকোগে না"? বৈকুণ্ঠ শুকুল কুণ্ঠিতভাবে একটু হাসল।

এর প্রায় বছর চারেক পর আবার দু'জনে দেখা গয়া সেন্ট্রাল জেলে। বৈকুণ্ঠ শুকুল এবার দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী, ফনী ঘোষকে হত্যার অপরাধে ফাঁসির আসামী। ফাঁসির আগের রাতে বিভূতিবাবু ও শুকুলজী

ছিলেন কাছাকাছি দুই 'সেলে'। হঠাৎ মুকুল ভাঙা বাঙলায় বলল—'একবার সেই ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটা গান না দাদা! সেই "হাসি হাসি পরব ফাঁসি"!

'...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করলাম গান। গরাদ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে গাইছি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে—আর এক ক্ষুদিরাম শুনতে চাইছে সেই ক্ষুদিরামের গান...। মাঝে মাঝে মুকুলের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি আমার সঙ্গে গাইবার চেষ্টা করছে—গাইছে'।

তারপর মুকুল বাঁশী শুনতে চাইল। বাঁশিতে রামপ্রসাদ বিস্‌মিলের বিখ্যাত গানের সুর শুনে গানটা শুনতে চাইল—বিভূতিবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিজেও গাইল; 'সর ফরোশী কি তমন্না অব্ হমারে দিলমেঁ হ্যয়'।

'আমার সম্বল কিছু নেই। তবু যত গান ছিল যত সুর ছিল গেয়ে চলেছি অবিরাম! আজ ও যে গান শুনতে চাইছে! রাত্রি শেষে ঊষার আলোয় ও যে সমস্ত গানের ওপারে চলে যাবে'। মাঝে বদলী ডিউটির ওয়ার্ডার এসে বললে, 'বাবুজী সারে জেলমে সায়দ কোইভি কৈদী আজ শো নহী হ্যয়। শোতা ভি মগর সারা জেল আপকা গানা শুন রহা হ্যয়...'।

'এবার কি গাইব ভাবছিলাম—মুকুলজীর ডাক শুনতে পেলাম

—"দাদা ওহী গানা গাইয়ে"।

—"কোন গানা"

—"ওঁহি যে রবীন্দ্রনাথকা—মরণ হে মোর মরণ"

বললাম—"ওহ্ তো গানা নহী হ্যয়, কবিতা হ্যয়—"

—"নহী নহী গাইয়ে—"

'মরণ মিলন'...আমার কণ্ঠস্থ। কিন্তু একে সুরে দিয়ে গাই কি করে?

—"দাদা—গাইয়ে"

'আর তো ভাবা যায় না। যাবার সময় যে হয়ে এল। আমি দরবারী কানাড়াতে ধরলাম – "অত চুপি চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ হে মোর মরণ"।

'আমি কিন্তু সমস্ত জীবনে ঐ একটি রাত্রিতেই গান গেয়েছিলাম আর একটি গানই সার্থক গেয়েছিলাম...।

'কখন চারটে বেজে গেছে খেয়াল নেই—মুকুল বললে-"দাদা ওক্ত নজদীক্ আগয়া, আখরী গানা বন্দে মাতরম্ শুনাইয়ে।"

'এক নম্বর, আট নম্বর, নয় নম্বর, দশ নম্বর আমরা এক সঙ্গে গেয়ে উঠলাম "বন্দে মাতরম"। পনেরো নম্বর থেকে বেরোবার আগে মুকুল বোধ হয় একটু

দাঁড়াল—আমাদের দেশের দিকে চেয়ে বলল—"দাদা, তবে চলি—আবার আসব। দেশ তো এখনো আজাদ হয়নি—বলে বাতরব্।

• • • • •

১৯৩০ সালে পাটনা ক্যাম্প জেলে ··একটি সুন্দর কিশোর জোরে জোরে পড়ার চেষ্টা করছিল—

"সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ হে মোর মরণ"

'এর ঠিক আগের দু'টি লাইন হচ্ছে

"আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়,
আমি করিব নীরবে তরণ।"

'বলেছিলাম—"সমঝা ?"

'সুকুল বলল—"তরণা তো কম্‌লোগ ভি কহ্‌তে হয়।

'বলেছিলাম—"ঐ সে ভী তরণে সকোগে না ?'

'বৈকুণ্ঠ সুকুল কুণ্ঠিতভাবে একটু হেসেছিল'

(শারদীয় 'কম্পাস', ১৩৭৫, ১৯-৩২ পৃঃ)।

যে সব ভারতীয় বিপ্লবী বিদেশে নির্বাসিতের যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যেও এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা গেছে। এঁদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা আগেই লেখা হয়েছে। তাঁর ও মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একবার দেখা হয়েছিল বার্লিনে। কিন্তু এখানে প্রাসঙ্গিক হবে বীরেন্দ্রনাথ-সংশ্লিষ্ট আর একটি ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার সময় তিনি ও আলিপুর বোমা-ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন বার্লিনে। তাঁরা মনে করলেন ইংলণ্ডের এই সংকট মুহূর্তে তাঁদের সুযোগ উপস্থিত দেশকে স্বাধীন করার। তার জন্য প্রয়োজন জার্মানির কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্রসাহায্য। তারই ব্যবস্থার জন্য অবিনাশচন্দ্রের চেষ্টায় বীরেন্দ্রনাথ বার্লিন গেলেন উচ্চপদস্থ এক জার্মান কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আর অবিনাশচন্দ্র জার্মানরা তাঁদের প্রস্তাবে সাড়া দেবে কিনা জানার জন্য উৎকণ্ঠ হয়ে বসে রইলেন তাঁর 'হালে' শহরের আস্তানায়। তারপরের ঘটনা ডাঃ অবিনাশচন্দ্রের ভাষায়: '...সহসা পূর্বের দিনের মতো দুধের দোকানের মেয়েটি আসিয়া খবর দিল "ডক্টর! বার্লিনের ট্রাঙ্ক কল।" ছুটিয়া গেলাম। চট্টোপাধ্যায় জার্মান ভাষায় বলিলেন "ভট্টাচার্য! অবস্থা অকল্পিতরূপে উৎসাহব্যঞ্জক। কালই

সকালে ফিরব। কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছি।" তারপর উৎসাহের আতিশয্যে ব্যধানিষেধ বিস্মৃত হইয়া বাংলায় বলিলেন—

'ভক্তা! এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে ·"

—'লাইন কাটিয়া গেল। কারণ যুদ্ধকালে বিদেশী ভাষায় কোন কথা নিষিদ্ধ' ('ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা', ১৩৯ পৃঃ)।

বাংলা দেশের আর এক নির্বাসিত বিপ্লবী, অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একমাত্র ছেলের নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়কের নামে—'গোরা'। এ খবর জানা গেছে অবনীনাথের স্ত্রীর কাছ থেকে।

বিদেশের বিপ্লবী মহলেও রবীন্দ্রনাথের সমাদর, তাঁর সম্পর্কে আগ্রহের নজির বেশ কিছুটা দেখা যায়। এ-প্রসঙ্গে স্বয়ং লেনিন সম্পর্কে এই খবর জানা গেছে। ১৯২১ সনে লেনিন বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী, আবদুর রব পেশোয়ারীকে অনুরোধ জানান তাঁর জন্য ভারতের জাতীয় আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে দিতে। আবদুর রব লেনিনের জন্য ৩৭-টি বইয়ের যে তালিকা তৈরি করে দেন তার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'Nationalism' বইখানি। লেনিন ঐ বই ছাড়াও কবির আরো চারটি বই (তার মধ্যে আছে 'ঘরে-বাইরে' ও 'Gardener'—প্রবন্ধকার) সংগ্রহ করেন তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির জন্য। গর্কি, লুনাচারস্কি, ক্রুপস্কায়া প্রমুখ বিপ্লবীরাও বিশেষ সমাদর করতেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের। এ-কথাগুলি জানা গেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবীণতম বিপ্লবী, পেট্রভের (এঁর বয়স এখন ৯৫ বছর) কাছ থেকে।

১৯৭০ সনে তেমনি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'আফ্রোএশীয় লেখক সম্মেলনে' দেখেছি ভিয়েটনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি সাম্রাজ্যবাদী নৃশংসতাকে ধিক্কার দিলেন রবীন্দ্রনাথের এই ক'লাইন উদ্ধৃত করে:

'নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।'

আর দক্ষিণ ভিয়েটনামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি সেখানে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন কবির এই ক'লাইন উচ্চারণ করে:

'তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে,
মুক্তিরণ ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে,
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু…
পরাণ দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।'

ইংরেজ কবি, উইলফ্রেড ওয়েন অবশ্য রাজনৈতিক অর্থে এঁদের মতো বিপ্লবী ছিলেন না, তবে তিনি যথার্থ যুদ্ধবিরোধী কবি ছিলেন আর অনেকের মতে আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি যে সব কবির রচনায় 'প্রথম পরিস্ফুট হয় তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর মা ১৯২০ সনের ১লা অগাস্ট রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন সেটি এ-ক্ষেত্রে তাই হয়তো কিছুটা প্রাসঙ্গিক। চিঠিতে ছিল এ-ধরনের কথা: '…আজ থেকে দু'বছর আগে আমার অতি স্নেহের বড় ছেলে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে ফ্রান্সে পাড়ি দেয়। যাবার আগে আমার কাছে বিদায় নিতে এল। আমরা দু'জনেই তাকিয়ে আছি ফ্রান্সের দিকে। মাঝখানে সমুদ্রের জল রৌদ্রে যেন ঝলমল করছে। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমার কবি-ছেলে তখন আপন মনে আপনার লেখা কবিতার সেই আশ্চর্য ছত্রগুলি আউড়ে চলেছে:

"যাবার আগে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।".

'এই পোড়া যুদ্ধ থামবার এক হপ্তা আগে আমার বুকের ধন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল। যেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল সেদিনই এই নিদারুণ খবর এসে পৌঁছল আমাদের কাছে। …তার পকেট-বই যখন আমার কাছে ফিরে এল, দেখি তার নিজের হাতে ঐ ক'টি কথা লিখে তার নীচে আপনার নাম লিখে রেখেছে' ('পিতৃস্মৃতি'—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৬৫-'৬৬ পৃ:)।

আলোচ্য ক্ষেত্রে আরো প্রাসঙ্গিক হবে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজনৈতিক ব্যুরো'র সদস্য, নিয়োনো-সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি। ইংরেজী সাপ্তাহিক 'লিঙ্ক' পত্রিকা ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র (১২ মার্চ, ১৯৬৬) প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে সামরিক আদালত ঐ তরুণ বিপ্লবীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলে নিয়োনো আদালতের সামনে একটি অন্তিম বিবৃতি দেন। সে-বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন রবীন্দ্রনাথের গানের এই দুই কলি:

'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।'

আর আমাদের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী বাংলা দেশের জনসাধারণ, তাঁদের মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তিবাহিনী এবং অসামান্য নায়ক, শেখ মুজিবর রহমানের জয়পতাকায় যে সগৌরবে লেখা আছে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথের নাম—সে তো আমরা সকলেই জানি।

দেশবিদেশের বিপ্লবী—তাঁরা জাতীয় বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট বিপ্লবী যাই হোন না কেন—তাঁদের সবারই কাছে রবীন্দ্রনাথের কেন এই সমাদর? কেন তাঁদের অনেকেই বধ্যভূমিতেও উচ্চারণ করেন তাঁর কবিতা বা গানের কলি? কোথায় তাঁদের মিল? রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীদের জীবন, চিন্তা ও কর্মধারায় তো দুস্তর ব্যবধান—একথা তো ঠিক। এ কি তবে নিছক বিপরীতের আকর্ষণ? সম্ভবত এ প্রশ্নের উত্তর কিছুটা আঁচ করা যায় সোভিয়েত পণ্ডিত, অধ্যাপক কোগানের এই কথাগুলি থেকে: 'It may seem that Tagore, avoiding all political struggles, absorbed in his deep meditation, must be foreign to us and far away from our life, which is spent in an atmosphere of stormy political discussions and feverish reconstructions. But it is an error. A thinker, reflecting on the Eternal and a Revolution full of today's interests and immediate problems, are not enemies. There is no rupture between them and somewhere high upon the last summit they will hold a friendly meeting. Our Revolution does not reject the hope of a 'golden age,' of a future brotherhood of humanity, the idea which during many thousand years animated all religions and also the best representatives of humanity. The communist revolution has traced on its banner the practical realisation of these ideals. The revolution is not a destroyer, an enemy of noble thinkers. On the contrary, the proletariat looks upon itself as the lawful heir who is called upon to translate these ideals into life. That is why the songs of Tagore are resounding in our hearts as a beautiful call for liberation ('The Golden Book of Tagore', ১২৮ পৃ:)।

রবীন্দ্রনাথ

নজরুল

ও

বাঙলাদেশ

দ্বিতীয় পর্ব :

নজরুল প্রসঙ্গ

নব মূল্যায়ন ? কেন ?

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

আমি সাহিত্যের কারবারী নই, আর সঙ্গীতেরও কিছু বুঝি না, তবে গান শুনতে আমার ভালো লাগে। কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে সে কলকাতায় আসে। সেই থেকে সে আর আমি এক সঙ্গে এক চালের তলায় ও একই ঘরে অনেক দিন বাস করেছি। আমরা দু'জন এক সঙ্গে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' লিখেছি। তখন আমি তাকে কবিতা লিখতে দেখেছি। তার দু'চা'রটি কবিতা মাসিক পত্রে ছাপা হতেই এক রকম রাতারাতি সে কবি প্রসিদ্ধি লাভ করে যায়। এটা তার 'বিদ্রোহী' রচনার অনেক আগের কথা। 'বিদ্রোহী' সে রচনা করেছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে।

ফৌজ হতে নজরুল ফিরে এসেছিল দেশপ্রেমে ভরপুর হয়ে। তার কণ্ঠে তখন শুধু রবীন্দ্রনাথের গানই ছিল না, তাঁর একজন ভক্ত-অনুরক্ত যুবকও ছিল সে সেই সময়ে। আশ্চর্য যে এই নজরুল ইসলাম কবিতা লিখল রবীন্দ্র-প্রভাব এড়িয়ে। রবীন্দ্র-প্রতিভার সেই মধ্যাহ্ন যুগে এটা যে-সে কথা ছিল না। ১৯২০ সালেই নজরুল ইস্‌লামের জয়-জয়কার হলো।

বিরাশি বছরের বৃদ্ধ আমি এখন সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে বন্দী হয়ে আছি। চোখে ভালো দেখি না ব'লে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পড়তে বিরক্তি ধরে যায়। এই অসহায় অবস্থায় শুনছি কাজী নজরুল ইসলামের নাকি নব মূল্যায়ন হবে। তার স্কুল জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নাকি আবার তাকে ধর্মের আবরণে মুড়িয়ে দিতে চাইছেন। নজরুল যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ওপরে নির্ভর না করে যোগাভ্যাস করতে গেল তখন তার সাহিত্যিক বন্ধুরা ধন্য ধন্য করেছিলেন। কিন্তু এই ভুলের জন্যে নজরুলের মস্তিষ্ক চিরদিনের জন্যে অকেজো হয়ে গেল। এখন বাকি আছে শুধু তার দেহটা। এতেও তার সাহিত্যিক বন্ধুদের আশ মেটে নি। শৈলজানন্দ ধর্মাবরণ নিয়ে আবার ছোটাছুটি আরম্ভ করেছেন। নজরুলের গান ও স্বর কেন ডুবে গেল, কেন গ্রামোফোন কোম্পানী কোনো কপি না রেখে নজরুলের সমস্ত গানের রেকর্ড নষ্ট করে দিলেন,

কেন অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে নজরুলের গান গাওয়া (ডক্টর কেসকারের মন্ত্রিত্বের সময়ে (?)) বছরের পর বছর বন্ধ থাকল এ সবের সন্ধান করতে তাঁরা প্রস্তুত নন। রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষুদ্র নাটিকা "বসন্ত" উৎসর্গ করেছিলেন। তার উল্লেখ রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীতে আছে কিনা সে খোঁজ নিয়েছেন তাঁরা? যদি উল্লেখ না থাকে তবে কেন নেই? নজরুলের এক জন্মদিনে মস্কো রেডিও হঠাৎ তার গান গেয়ে উঠেছিল। তার পরে সে গান কেন আর হলো না তার কারণ কেউ কি ডক্টর বিনয় রায়কে জিজ্ঞাসা করেছেন?

আমি আসল কথা হতে অনেক দূরে সরে এসেছি। নজরুল 'বিদ্রোহী'সহ তার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি রচনা করেছে উনিশ শ' বিশের দশকে। এই দশকে সে বহু সঙ্গীতও রচনা করেছে। এই দশকেই গ্রামোফোন কোম্পানী তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উস্তাদ জমীরুদ্দীন খানের সঙ্গেও নজরুল ইস্লামের বহরম-মহরম হয়েছিল উনিশ শ' বিশের দশকেই। আমি এতকাল বুঝে এসেছি যে, নজরুলের মূল্যায়ন উনিশ শ' বিশের দশকেই হয়ে গেছে। সে দেশপ্রেমের কবি। একজন পদস্থ পণ্ডিত ব্যক্তি আমায় একদিন বলছিলেন:—"নজরুলের নিকট হতে যে আমি অনেক পেয়েছি। তাকে ভুলব কি করে?" এই দেশপ্রাণতার কবিকেই হাজার হাজার যুবক, যুবতী ও মধ্য বয়স্করা এমন কি বৃদ্ধরাও শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। আশীর্বাদ লাভের জন্যে পীরের দরগাহতে তাঁরা নিশ্চয়ই আসেন না। দেশের লোকেদের চেতনা যত বাড়ছে নজরুল ইস্লামের জনপ্রিয়তা ততই বাড়ছে। পূর্ব পাকিস্তানে নজরুলের গানের ও কবিতার শব্দ পরিবর্তন করে তাকে ইস্লামী কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলেছিল। এখন সেই ভ্যানডালিজ্‌ম বন্ধের মুখে। তবে নজরুলের নব মূল্যায়ন কি নিয়ে হবে এবং কেন হবে?

প্রথম পরিচয় | পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

নজরুল বিদ্রোহী কবি, অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি বাজিয়ে ভাঙার গান গেয়েছিল, অন্যায় অবিচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামী আহ্বান জানিয়ে। পরবর্তী কালে তাঁর গজল গান বা শ্যামা সঙ্গীত আজও নজরুল রচনা সম্ভারে আনুষঙ্গিক, তাতে মূল অবদান রুদ্ররসপ্রধান।

তবু নজরুল মূলত কবি। তাঁর অনুপম রূপপিপাসাকে চেপে রেখে সেই কবিত্ব শক্তিতে যুদ্ধের বাজনায় ব্যবহার করতে হয়েছিল যে সামগ্রিক পরিবেশে, ক্ষোভভরে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা। রূপপিয়াসী কবি বাস্তব জীবনে হিংসা লোভ ও স্বার্থপরতার পদপীড়নে জীবনের সব রূপ ও রসকে বিদলিত হতে দেখেই রৌদ্ররসে জ্বলে উঠে ভাঙার গান গেয়েছিলেন।

নজরুলের কবি মানসের মৌলিক স্বরূপ যে রূপ পিপাসা, বাঙলার শ্যামল মাটির প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, তার স্বাক্ষর বহন করেছিলেন তিনি তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য প্রয়াসে। নইলে উনি করাচি শহরের ফৌজী ছাউনিতে বসে কবিতাটি তিনি সবুজ পত্র পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন কবিতা প্রকাশের প্রথম প্রয়াসে, সেটি পারসিক কবি হাফেজের অনুসরণে হলেও তার মধ্যে বাঙলার জুঁই ফুলের মৃদুগন্ধ ও দূর্বার শ্যামলতাই মুখ্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল।

প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব বৈদগ্ধ্যের বাহন সবুজ পত্রে প্রকাশের জন্য সেই শিশির ভেজা রোমান্টিক কবিতাটি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় নি। বহুদূর প্রবাসে এসে বাঙালী-তরুণ আত্মীয় পরিজন ও অভ্যস্ত পরিবেশে বঞ্চিত হয়ে জীবন-মরণের খেলা খেলছে, সে তার আকুল মনের দুটো কথা নিপুণ হাতে ছন্দে গেঁথে জানাতে চেয়েছে তার বাঙালী আপন জনের কাছে। সবুজ পত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে রেখে তাকে ভালো কবিতা বলা হয় তো চলে না, কিন্তু তার মধ্যে যে প্রাণের কথা উৎসারিত, ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে তার অনিবার্য আশ্রয় ভাবতেও আমার হৃদয় ব্যথিত হল। তাই সবুজ পত্রের কর্মচারী আমি সেটিকে নিয়ে চলে গেলাম প্রবাসী অফিসে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন প্রবাসী সম্পাদনার দেখাশুনা করেন। তাঁর সঙ্গে আমার ইতিপূর্বেই পরিচয় হয়েছিল, সেই সুবাদে কবিতাটির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে সেটি এগিয়ে

দিলাম তাঁর কাছে এবং একবার তাতে চোখ বুলিয়েই চারুবাবু বলে উঠলেন, নিশ্চয় ছাপবো এ কবিতা। পরের সংখ্যা প্রবাসীতেই তা প্রকাশিত হল।

সব ব্যাপার জানিয়ে অপরিচিত নজরুলকে চিঠি লিখে দিলাম আমি। সেই চিঠির জবাব এল :

…কুমিল্লার লেটর দলের গান লিখিয়ে ছোকরা নজরুলকে কে-ই বা এক কানাকড়ি দাম দিয়েছে। স্কুল-পালানো, ম্যাট্রিক-পাশ না-করা পল্টন-ফেরত বাঙালী ছেলে কী নিয়েই বা সমাজে প্রতিষ্ঠার আশা করবে? আমার একমাত্র ভরসা মানুষের হৃদয়। হয়ত আগাছা বা ঘাসের মত অঢেল খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু বাঙলা দেশে তা যে দুর্লভ নয়, তার প্রমাণ আমি এই সুদূরে থেকেও পাচ্ছি। নিঃসংকোচে ও নির্বিকারে প্রাণ-দেওয়া-নেওয়া প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু মন-দেওয়া-নেওয়া যে স্থান-কাল-দূরত্বের ব্যবধান মানে না, তাও উপলব্ধি করছি।

এর পর ছ'মাসের ওপর কেটে গেছে। সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনের প্রায়-অবচেতনের কোঠায় ঝিমিয়ে পড়েছে, স্থান-কালের দূরত্বের ব্যবধান না-মানা মন-দেয়া-নেওয়ার একটুকুও অনুভূতি থেকে সরে গিয়েছে, হঠাৎ একদিন সেই মন আচমকা আমায় এসে ধাক্কা মারলো। সত্যি বলতে কি সে ধাক্কা আমি সামলাতে পারি নি।

সেই প্রথম কবিতার পর আর কোনো কবিতা আমায় পাঠায়নি নজরুল, অন্য কোথাও তার কবিতা বেরিয়েছে, এমন কি সে পাঠিয়েছে এই ধরনের কোন খবরও শুনি নি। কাজেই কবিতাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করে আমি যে একজন কবি আবিষ্কার করে ফেলেছি, এমন আত্মপ্রসাদ বোধ করবার কারণও পাইনি আমি। কিন্তু তিন নম্বর হেস্টিংস স্ট্রীটে সবুজ পত্রের মুদ্রণালয়ে সাময়িক অনুপস্থিতির পর ঘরে ঢুকেই যখন একখানা চিরকুট পেলাম :

পবিত্রবাবু,

কাল কলকাতায় এসে পৌঁচেছি। দেখা করতে এলাম কিন্তু বরাত খারাপ। আছি ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে। বাড়িটা আপনার সুপরিচিত। দেখা পাওয়ার আশায় বসে থাকব।

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

আর চিঠিখানা হাতে তুলে দেবার সময় প্রেসের সহকর্মী শশীবাবু তখন বললে, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সোজা এক মিলিটারি ম্যান আপনার খোঁজে এসেছিল,

এই চিরকুট খানা রেখে গেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। শশীবাবু বললেন, সেই ঘোড়ায় চড়া ছেলেটির কাছে ছুটছেন বুঝি?

ঘোড়ায় চড়া কেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ওরে বাবা, ঘোড়ায় চড়া নয়? খাকি পোশাক, চাপা পাৎলুন, হাঁটু পর্যন্ত বুট, যে রকম গট্‌গট্‌ করে এসে ঢুকলো, মনে হল, যেন জোর দৌড়ায় ঘোড়াটা থামিয়ে এসেছে, সেটার মুখ দিয়ে এখনো ফেনা কাটছে।

লড়াই ফেরত কি-না, আমি বললাম, হাবিলদার! সেই রেশ এখনো বোধ হয় কাটে নি।

শশীবাবুর ভাঙানো বিস্ময়, বললেন, তাতো হল, আপনিও তো দেখছি পত্রপাঠ ছুটলেন। শ্যামের বাঁশি বাজার ডাক শুনে রাধিকাও ঘর ছাড়তে এর বেশি সময় নিত!

আমি ফিরে তাকাতেই শশীবাবু বললেন, তা শ্যামচাঁদই বটে! পরনে ঘোড়-সোয়ারি পোশাক থাকলে কি হবে, মাথায় ইয়া ফাঁপানো বাবরি চুল, মোহন চূড়া বেঁধে দিলেই হয়। আর মুখখানিও যেন ননী গোপাল, ইয়া বড় বড় টানা চোখ।

বেশ তো দেখে আসি একবার, বলেই বেরিয়ে পড়লাম আমি। শুনতে পেলাম পিছনে শশীবাবুর গলায় সুর উঠেছে: না দেখিতেই ভালোবেসেছি।

ভালোবাসাটা যে একতরফা নয়, তা বুঝলাম যখন ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে মুখোমুখি হলাম তার সঙ্গে। মন দেওয়ার সঙ্গে টেনে নেওয়ার অদ্ভুত চুম্বক অনুভব করলাম তার মধ্যে।

খোলা দরজা, ঘরে মানুষ নেই, অথচ হারমোনিয়ামের পোঁ পোঁ শোনা যাচ্ছে, যেন ভিতর থেকে আসছে। ঘরের একপাশের দরজা পেরিয়ে একটু অন্দর মহল আছে যেন। তবু ব্যাচেলারের ডেরা, অন্দর মহল থাকলেও জেনানা নেই, এই ভরসায় উঁকি মারতেই দেখি একখানা কেওড়া কাঠের নেড়া তক্তাপোশে বসে গেনজি গায়ে লুঙ্গি পরনে একজন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, সুরের আবেশে মাথা ঝাঁকাতে যে তার চুল দুলে দুলে উঠছে, আমার লেশমাত্র সংশয় রইল না এ-ই শশীবাবুর সেই শ্যামচাঁদ।

একটু ইতস্তত করতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বললাম, হাবিলদার সাহেবকে চাই।

কোলের উপর থেকে হারমোনিয়ামটা নামিয়ে রেখে একলাফে উঠে এসে বলে উঠল, পবিত্র গাঙ্গুলী এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরলো আমায়।

বাইরের ঘরে দু'জনে এসে তক্তপোশে জাঁকিয়ে বসলাম। এবার বললাম, আমি যে পবিত্র গাঙ্গুলী, একথা বুঝলে কি করে?

বুঝতে সময় লাগে নি, হেসে উঠল নজরুল। কে যেন আসবে আমার মন বলেছে, গেয়ে উঠল গানের কলিটা। অবশ্য অঙ্ক কষেও প্রমাণ করতে পারতাম— এ পবিত্র গাঙ্গুলী না হয়ে যায় না।

কিছু কথাবার্তার পর আমাকে বসিয়ে নজরুল টুক্ করে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল একহাতে চায়ের কেৎলি আর এক হাতে সিঙাড়ার ঠোঙা ও কলা পাতায় মোড়া পান।

কিহে তুমি যে দেখছি ফিষ্টি বসাচ্ছ, আমি বললাম।

বাঃরে, 'বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল' সুরের রেশের জের কেটে দিয়ে সোজা কথায় যোগ করে দিল, 'ফিষ্টি করবো না তো কি?' চা সিঙাড়া পান, মজলিশের এই তিনটি উপাদান।

কলেজ স্ট্রীট মুজফ্ফর আহ্‌মদের এই ডেরায় এসে ওঠার ইতিহাস বসিয়ে বললো নজরুল। কৈশোর সখা শৈলজা মুখুজ্যের মেসে এসে প্রথমে উঠেছিল। শৈলজার স্বাভাবিক অকপটতায় ফলে সেখানে প্রকাশ হতে দেরি হল না নজরুল মুসলমান, তাকে মেসে এনে উঠিয়ে সবার জাত মারছে শৈলজা। সেই মুহূর্তে মেস ছেড়ে যাবার সমবেত দাবি রক্তচক্ষু দেখিয়ে জানিয়ে দিল সবাই।

কিছুক্ষণ পরেই সেই শৈলজা'র আবির্ভাব। তারও মাথায় বাবরি চুল। নজরুল পরিচয় করিয়ে দিল, প্রেমের কবিতা লেখে। শৈলজার কথায় 'আজেবাজে কথা রেখে দিয়ে' শুরু গান ধরলো

'দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে—'

ঘর কাঁপিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে গেয়ে চলল নজরুল। প্রতিটি কথা স্পষ্ট জোর করে উচ্চারণ করছে—যেন সুরের তলায় কথা চাপা না পড়ে। কিন্তু সুর শেষ যখন গাইছে: 'ভয় নাহি ভয় নাহি!' তখন সুর উঠেছে সপ্তমে, সকল ভয় যেন অপসারিত করতে চাইছে সবদিক থেকে। তবু ঘর চৈত্রের অগ্নিবাণের ভয় বিদূরণ করতে কেউ ততখানি উদাত্ত হয়ে উঠতে পারে না। তার সেই সুর এবং উচ্চারণের মধ্যে সর্বযুগের সর্ব ভয় হরা আশ্বাসবাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে, সবাইকে ডেকে বলছে, মাভৈঃ।

এই মাভৈঃ বাণী নিয়ে অচিরেই নজরুলের আবির্ভাব ঘটলো বাঙলার কাব্য জগতে, নতুন যুগের অগ্রদূত হিসেবে—

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ওই এল ওই
ওই এল তোর রক্ত যুগান্তর রে।

সেই যে যাওয়া-আসা শুরু হল তারই ধারায় একদিন আফজলুল হকের প্রস্তাবে পরামর্শ করে স্থির হল পত্রিকা বার করা হবে। সত্যি বার হল 'মোসলেম ভারত'। এককালের সবুজ পত্র পরে প্রবাসী এবং তার পরে বিচিত্রার মুখ্য আকর্ষণ যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা, 'মোসলেম ভারত' এর আকর্ষণ হল নজরুলের কবিতা। পক্ষান্তরে মোসলেম ভারতের জন্যই যেন কলম চালালো নজরুল পরম উৎসাহে, নির্ঝরের বাঁধ টুটে গেল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ সবাই আগ্রহী পাঠক। বাংলার কাব্যগগনে নতুন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত হলো সবাই। রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানালেন 'ধূমকেতু'কে, কারণ কিছু দিনের মধ্যেই নজরুল 'ধূমকেতু' প্রকাশ করলো। ইতিমধ্যে অবশ্য 'বিদ্রোহী'র প্রকাশে নজরুল সর্বত্র বিস্ময় সৃষ্টি করে ফেলেছে। কবিতার ক্ষেত্রে নজরুল বিদ্রোহ জানাল শুধু সুরে ও বক্তব্যে নয়, কাব্য দৃষ্টিতে ও জীবন জিজ্ঞাসায়।

সেই সুরই পরে বাঙলা গানকেও নব নব বিচিত্র ধারায় বইয়ে ছিল। একদিন সে নদী হঠাৎ শুকিয়ে গেল, হয়ে গেল মরুভূমি। আজ নজরুলের কংকাল পড়ে আছে সেখানে। আমি নজরুলের কবিতার ভক্ত যতটা ছিলাম, মানুষটিকে ভালো বেসেছিলাম অনেক বেশি। তাই মানুষটির জীবন্মৃত সত্তাই আজ আমার কাছে রূঢ় সত্য, সামগ্রিক জীবনের ট্র্যাজেডি ছাপিয়ে উঠেছে আমার ব্যক্তি জীবনের এক বিরাট ট্র্যাজেডি।

'বাঙলা দেশ':
রবীন্দ্র-নজরুলের মানসপুত্র

গোপাল হালদার

'বাঙলাদেশে' পাকিস্তানী-পৈশাচিকতা প্রত্যক্ষ করে একজন বিদেশী সাংবাদিক নাকি বলেছেন, 'বাঙলা দেশে জাতীয় আন্দোলনের মূল আন্তর্জাতিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথ।' কথাটা মিথ্যা নয়, তবে মূল আরেকজনও—নজরুল। এবং দু'জনই 'আন্তর্জাতিকতাবাদী' হয়েও 'জাতীয়তাবাদী', অর্থাৎ জাতীয়, স্বাধীনতাবাদী, ও মানব স্বাতন্ত্র্যের পুরোহিত।

এ প্রসঙ্গে অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনার পুনরুল্লেখ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—বাঙালি মাত্রই গৌরবে উল্লসিত। ছোট নোয়াখালি শহরে আমি কৈশোরেও পা দিয়েছি বলা যায় না। সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ডবল্যু. এস. এডি.—অনুদারচিত্ত নন, তবে ইংরেজ শাসক। কি কাজে আমার বাবাকে যেতে হয়েছিল সেদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। প্রথম সম্ভাষণের পরেই সাহেব বললেন - 'আনন্দের কথা—তোমাদের কবি টাগোরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন'—তারপর—'কোনো ইংরেজ লেখক আজ পর্যন্ত এ পুরস্কার পান নি।' বাবা ধন্যবাদ দিয়ে সহজ বিশ্বাসে বলতে গেলেন, 'কিন্তু কিপ্‌লিং তো আগেই তা পেয়েছেন।' সাহেব কথাটা মানলেন না, 'কিপ্‌লিং ইংরেজি-লেখক,—ইণ্ডিয়া-বর্ন্।' সেদিনের পরিভাষায় কিপ্‌লিং তাই 'এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্'। সে তর্ক থাক—এখানে অবান্তর। বাবা ব্যঙ্গ ক'রে বললেন, 'মুস্কিলেই পড়ল ইংরেজ—ভারতবাসীকে আর অসভ্য জাতি বলে তো পৃথিবীতে প্রচার করা সহজ নয়। যে জাতির মধ্যে বিশ্ব-বরেণ্য কবির আবির্ভাব পৃথিবীতে সে জাতির পরিচয় চাপা পড়ে থাকে না।'

তাই বলে চাপার চেষ্টা কি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজই ছেড়ে দিয়েছিল? না, ঔপনিবেশিকতাবাদী পাকিস্তানী শোষকরাই ছেড়ে দিল? রবীন্দ্রনাথ 'ইণ্ডিয়ান' লেখক, অনৈসলামিক ভাবধারার বাহক, এই ওজরে পূর্ব বাঙলার বাঙালির মন থেকে রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসিত করতে গেল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। তার ফল হল সেই কবির কণ্ঠেই বেরোল সমস্ত পূর্ব বাঙলার কণ্ঠস্বর—'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

নজরুলের ভাবলোক :

নজরুলকে নিয়ে পূর্ব বাঙলায় এরূপ সংকট দেখা দেয় নি। কারণ, নজরুল আরও বেশি কঠিন ও জটিল সমস্যা। বাঙলা ভাষাকে সে দেশ থেকে উৎখাত করলেই নজরুলকে পূর্ব বাঙলায় উৎখাত করা সম্ভব—অন্য কোনো কৌশল খাটবে না—এ কথাটা প্রথম থেকেই ছিল স্পষ্ট। অথচ, এক হিসাবে পাকিস্তানী মিথ্যানীতি ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে ডিরেক্ট বিদ্রোহ তো নজরুলেরই,—রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ তত ডিরেক্ট নয়। আমরা সকলেই জানি—রবীন্দ্রনাথকে শুধু 'ভারতীয় ঐতিহ্যে পালিত ও পুষ্ট লেখক' বলা যথেষ্ট নয়। তাঁর ভারতবর্ষীয়তা'র অর্থ 'স্বজাতির মধ্যে সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্যে স্বজাতিকে' সত্য ক'রে অনুভব করা। তিনি মহামানবতা'র কবি—সংকীর্ণ ন্যাশনালিজমএর নয়, বর্ণধর্মী ভারতীয় ন্যাশনালিজমের সমর্থকও নন। বিশেষতঃ, রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তায় নিরাকার একেশ্বরবাদ যে ভাবে স্বীকৃত তাতে তাঁকে অনৈস্লামিক বলার অর্থ ইস্লামের মূল সত্যের পরিবর্তে সে ধর্মের আচার-প্রথা-নিয়ম বা তার বাইরের আবরণকে বড় করে দেখা। ওসব বাহ্য লক্ষণ যদি ইস্লামের প্রধান জিনিস হয় তা হলে নজরুল তো সে ইস্লামের পূর্বাপর বিরোধী—

> "মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্‌-লা'রা' ক'ন হাত নেড়ে,
> দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে।
>
> ফতোয়া দিলাম—কাফের কাজী ও,
> যদিও শহীদ হইতে রাজী ও।
>
> 'আম পারা'-পড়া হাম-বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে।'
> হিন্দুরা ভাবে, 'ফার্শী শব্দে কবিতা লেখে ও পা'ত-নেড়ে।"

এ বক্তব্যের মূল কথাটা রবীন্দ্রনাথেরও মনঃপূত হতে পারত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিরীতিতে সাধ্য ছিল না এমন সরল, স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলেন। শুধু বাণীবিন্যাস নয়, তাঁর দৃষ্টিও অন্তরীতির। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি 'বিদ্রোহী'র রাজনীতি নয়—তা 'স্বদেশী সমাজের' রাজনীতি, সৃষ্টিমূলক বাস্তিক দৃষ্টি বা creative politics. নজরুল বিশেষ করেই বিদ্রোহী, 'ভাঙার গানে'র কবি

> 'কারার ঐ লৌহ কবাট
> ভেঙে ফেল, কররে লোপাট
> রক্ত জমাট
> শিকল পূজার পাষাণ বেদী!"

দুই কবির দুই রূপ বৈশিষ্ট্য আমরা জানি ও বুঝি। সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। নিশ্চয় দুজনাই মানবমুক্তির পূজারী, জাতীয় স্বাধীনতারও সাধক। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী নজরুলও নন, কিন্তু তিনি অনেক বেশি ডিরেক্ট। তাই তাঁর বাণী কর্মোদ্দীপনার বাণী, বিদ্রোহের বাণী; রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রধানতঃ চৈতন্যের রূপান্তরের বাণী। অত্যাচারী শোষণবাদীর পক্ষে নজরুল প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ফ্রন্ট লাইনের শত্রু। রবীন্দ্রনাথ বরং পরোক্ষ বিরোধী—সহযোগি কর্মী তিনি নন। তবু যে পূর্ব বাংলায় কাজী নজরুল ইসলাম তেইশ বৎসরেও শাসকদের প্রত্যক্ষ শিকার হন নি, তার প্রধান কারণ তাঁর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি মুসলমান পিতা-মাতার ঘরে জন্মেছেন—এবং তাঁর কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ হয়েছে সুশোভন ও সু-সিদ্ধ আরবী-ফারসীতে মুসলমান ধর্ম ও জীবনযাত্রার আবহাওয়া প্রবল, তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলার মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণী নজরুলকে এই কারণেই প্রথমাবধি আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নজরুল মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্ত তাঁর কাব্য রচনা করেন নি, সে উদ্দেশ্যে কাব্যে-গানে ওসব শব্দ ব্যবহারও করেন নি। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মে সত্যকার বিরোধ আছে, বা থাকতে পারে, তা তিনি মানতেন না। আর কোনো ধর্মের সেরূপ গোঁড়ামিকে তিনি বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার মানসিকতার, শোষণ-বিরোধী মানবতার সচেতন বাহন, এবং মানব-অধিকারের (রাইট্স্ অব্ ম্যানের) এবং শোষিত-জনতার (হ্যাভ্-নট্সে-এর) আত্মাধিকারের সংগ্রামী কবি।

বরং এক দিক থেকে দেখলে সন্দেহ থাকে না, নজরুল রবীন্দ্রনাথের মত 'ভারততীর্থে'রই এক সাধক। ভারতীয় ঐতিহ্যের যে মিলনাত্মক ধারা বারেবারে হারিয়ে যেতে-যেতেও দ্বন্দ্ব-মিলনের মধ্য দিয়ে বহমান, রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুল নিজেও সে ধারার এ যুগের এক প্রকাশ—কবীর, দাদূ, হাবা খাতুন প্রভৃতি সাধকদের থেকে নজরুল একেবারে ভিন্নগোত্রীয় নন,—স্বভাবতই যুগের নিয়মে তিনি আরও বেশি সমাজ সচেতন মানুষ। শেষ অবধিও নজরুল তাই নির্বিকার চিত্তে ইসলামী ভক্তি সঙ্গীত, এবং বাউল, রামপ্রসাদী, এমন কি, কৃষ্ণ-লীলার গান, অজস্র দেবীস্তুতি, কালীকীর্তন, প্রভৃতি সমভাবেই রচনা করেছেন—ভারতীয় মিশ্রিক প্রেরণায় এই বিশিষ্ট মিলনাত্মক ধারাকে নজরুলও দিয়েছেন নতুন প্রকাশ।—তখনো তিনি ভুলতেন না—

"আমার দেশের মাটি
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি।"

এবং যুগ ধর্মের নিয়মে, রাজনৈতিক সামাজিক ভাবনায় তখনো সেকুল্যার। তিনি 'শিবালয়ে'র ইকবালকে এযুগের মুসলিম সমাজের কবি বলা যেতে পারে—ভক্তিধর্মী ইস্‌লাম অপেক্ষাও মুস্‌লিম যোদ্ধ জাতি উপজাতিদের শক্তিবাদী ধর্মই 'শিকায়' কবির শেষ দিককার অন্তর প্রেরণা,—সে হিসাবে ইকবালকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কবি বলা সম্ভবতঃ অসঙ্গত নয়। কিন্তু নজরুলকে পাকিস্তানী ভাবধারার সমর্থক বলা একেবারে অসম্ভব। 'কম্যিউনিস্ট' তাঁকে বলা চলে কি চলে না, তা বিতর্কের বিষয়; তবে তিনি শোষিত জনগণের সহযাত্রী। নিশ্চয়ই আরও বলা চলে—তিনি 'ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যে'র এ যুগের কবি—এই যুগের প্রেরণাতেই তিনি তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী, সর্বদেশের শোষিত মানুষের সহযাত্রী এবং সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। যুগের এই প্রেরণাই নজরুলের মনে প্রধান, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যও নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য। সেই ভারতীয় ঐতিহ্য-রীতিতেই তিনি বাঙলা ভাষায় আরবী-ফারসীর বিষয় গ্রহণ করতে গিয়েছেন; এবং বাঙলা ভাষার 'জিনিয়াস' বা প্রকৃতি অনুযায়ী তা গ্রহণ করেছেন; বিষয়, ভাব ও শব্দসম্পদের দিক থেকে বাঙলা ভাষার পরিধিকে প্রসারিত করেছেন এবং বাঙালির রস-চেতনাতে নতুন উপলব্ধি জুগিয়েছেন। সে হিসাবে তিনি যেমন এযুগের কবি, মানব মৈত্রীর কবি, তেমনি মহাজাতিক ভারতবর্ষের কবি; এবং বাঙালির জাতীয় কবিও। কিন্তু পাকিস্তানী ভাবনার কবি নন, হিন্দুস্থানী ভাবারও কবি নন, অর্থাৎ না তিনি টু-নেশন-বাদীদের কবি, না হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কবি।

'টু-নেশন' তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান শ্রেণী প্রবলতর শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর আধিপত্য এড়িয়ে পাকিস্তানের মধ্যে আপন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই নজরুলকেই তাঁরা বাঙালির জাতীয় কবি হিসাবে গ্রহণ করেন; তাঁর নাম, তাঁর জন্মগত পরিচয় ও তাঁর 'আরবী-ফারসী' বিষয়ের সার্থক স্বাঙ্গীকরণের জন্য তাঁকে নিজেদের খণ্ডিত শ্রেণীস্বার্থের মুখপাত্র করে নেবার চেষ্টাও করেন। এ অবশ্য নজরুলের সঙ্গেও তাঁদের প্রবঞ্চনা, নিজের সঙ্গেও তাঁদের প্রবঞ্চনা। নজরুলের উপর কোনো দাবিই 'টু-নেশন'বাদীদের খাটে না। কিন্তু 'টু-নেশন' তত্ত্বটাই ত প্রবঞ্চনার তত্ত্ব। তাঁদের এ আচরণ নিঃসন্দেহ স্ববিরোধী—তাই হাস্যকরও মনে হতে পারে।

কিন্তু একটা নিগূঢ় সত্যও তাঁদের এই নজরুল-স্বীকৃতির মধ্যে থেকে গিয়েছিল। বাঙালি জাতির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিকাশ সমভাবে হয় নি।

বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের এই পার্থক্যের ও ঐক্যের স্বরূপ তাই নজরুল-রবীন্দ্রনাথ ও পাকিস্তানের সমালোচনায় বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বাঙালি মধ্যবিত্তের ফেরফের :

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে নজরুলের আবির্ভাব (খ্রীঃ ১৯২১-২২) সমস্ত বাঙলা সাহিত্যে একটা নতুন আশার সঞ্চার করে। কারণ, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সকল বাঙালির আপনার হলেও মুসলমান বাঙালির সৃষ্টি প্রতিভা নজরুলের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি। বিশেষ করে, আধুনিক যুগ যখন বাঙলা দেশে এল (মোটামুটি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে), প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যাদর্শের বদলে আধুনিক সাহিত্যাদর্শ তখন বাঙলা সাহিত্যে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল (মোটামুটি খ্রীঃ ১৮৫৭ '৫৮ এর দিকে)। তখন সেই যুগ ও সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠে ইংরেজি ভাষায় (আধুনিক ধারায়) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি,—যারা সকলেই প্রায় হিন্দু, একজন মাত্র মাইকেলের মত ধর্মে খ্রীষ্টান। মুসলমান বাঙালির মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখনো (১৮৫৮ এর সময়) গণনীয় নয়—আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণী হিন্দু মধ্যবিত্তের থেকে পঞ্চাশ বৎসর পিছনে পড়ে গিয়েছিল। কাজেই আধুনিক যুগধর্ম যেমন করে মধ্যবিত্ত মুসলমান বাঙালিকে প্রভাবিত করে নি—আধুনিক সাহিত্যাদর্শে আত্মপ্রকাশের সুযোগও মুসলমানদের আরও অনায়ত্ত থেকে যায়। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দু'একজন মুসলমান সুলেখক ছিলেন, কবিও ছিলেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা কেউ ছিলেন না। অথচ বাঙালি জাতীয়তার পক্ষে তার প্রয়োজন ছিল প্রথম থেকেই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে তার কিছু আয়োজনও হয়েছিল, কারণ এই সময়ের মধ্যে মুসলমান বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও আবির্ভাব স্পষ্ট হয়।

প্রয়োজন প্রথম থেকেই ছিল—কারণ, মধ্যযুগের নানা ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার কাটিয়ে শক্তিমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব না হলে জাতীয়তার বিকাশ সম্ভব হয় না। জাতীয়তার পথে সাধারণতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব গ্রহণ করে; তাদেরই দায়িত্ব সমাজের সাধারণ মানুষকে সেই শিক্ষায়, সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। যে দেশে ধর্মগত কারণে সমাজের মধ্যে বরাবর একটা পার্থক্য

থেকে গিয়েছে,—সমস্ত সমাজ জীবনে মোটামুটি মিল থাকলেও ওই ধর্মগত কারণেই সমাজটি সম্পূর্ণ এক হয়ে উঠতে পারে নি,—সেখানে একটা বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় যে-কোন কারণে পিছিয়ে পড়লে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সেই সম্প্রদায় নিজেদের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করতে না পারলে, সেই ধর্মাবলম্বী মধ্যবিত্ত নিজেরাও জাতি-গঠনের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত থেকে যায়; সেই সূত্রে সমগ্র জাতীয় চেতনাকে খণ্ডিত ও বঞ্চিত রাখে, এবং অন্য ধর্মাবলম্বী মধ্যবিত্তের জাতীয়তা-বোধেও বিকৃতির কারণ ঘটায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মগত-গোষ্ঠীবোধ ঠিক বিদূরিত না হয়ে বরং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিভক্ত করে রাখল। তাই জাতীয়তার প্রেরণা তখন সাম্প্রদায়িকতায় আকার-লাভ করারও কারণ ঘটল। মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অভাবে হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যখন একা-একা দাঁড়িয়ে উঠল তখন তাদের ভাবনা-ধারণায় হিন্দু ভাবনার প্রাবল্য দেখা দিল,—কতকটা ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর শিক্ষায়ও তারা 'হিন্দুত্ব'কেই মনে করে নিলে 'জাতীয়ত্ব', আর বাঙালি মুসলমানের ভাবনা-ধারণাকে মনে করে নিলে 'বিজাতীয়'। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাই 'হিন্দু জাতীয়তা' প্রবল হয়ে উঠতে থাকে, তা আমরা জানি। তাই তখন বিশেষ করে প্রয়োজন ছিল এই বিষম বিকৃতি নিরস্ত করার জন্য মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির জাত আত্মপ্রকাশ, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীর যথাযথ আবির্ভাব। কিন্তু প্রয়োজন থাকলেও সে প্রয়োজন তখন মিটল না।

বাঙলার মধ্যবিত্ত জাতীয়তা-বাদ এর ফলে গোড়া থেকেই দাঁড়াতে গেল চোরাবালির ওপর—সে চোরাবালি ধর্মগত বিচ্ছিন্নতাবোধ, বর্ণচোরা সাম্প্রদায়িকতা, প্রথম দিকে তা ছিল হিন্দু ধর্ম-গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ভাবনায়, আর ক্রমে এল মুসলমান ধর্ম-গোষ্ঠীরও ভাবনায় যখন থেকে মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে লাগল। দোষটা কোনো এক পক্ষকে দিলে সুবিচার হবে না;—ভারতবর্ষে সমস্ত আদান-প্রদান সত্বেও সাধারণভাবে হিন্দু ও মুসলমান তো একাকার হয়ে যায় নি, পৃথক গোষ্ঠীসত্তা সম্বন্ধে দুয়েই ছিল সচেতন। এই ব্যাপারটাকে একেবারে 'জাতীয়তার লেশ বর্জিত সাম্প্রদায়িকতা' বললেও যথার্থ হবে না। নানা স্ব-বিরোধী আচরণ ও ভাবনা দুই গোষ্ঠীর মধ্যবিত্তেরই মধ্যে বরাবর ছিল, ডায়েলেকটিকাল দৃষ্টিতে তার ঘাত-প্রতিঘাত বোঝা প্রয়োজন। যে দিকটা ক্রমশঃই উনবিংশ শতক থেকে প্রবল হয়ে উঠতে থাকল তা হচ্ছে তখনকার হিন্দু মধ্যবিত্তের দৃষ্টিতে

মুসলমান মধ্যবিত্তের (যেমন 'নেড়ে'র) প্রতি অবজ্ঞা ও সন্দেহ,—'মুসলমানরা যবন বিজাতীয়।' মুসলমান মধ্যবিত্তের মনে হিন্দু মধ্যবিত্তের সম্বন্ধে ক্ষুব্ধবোধ ও ঈর্ষা। 'হিন্দুরা শুধু কাফের নয়, মুসলমান-বিদ্বেষী ও বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধারও একচেটিয়া অধিকারী।' লক্ষণীয়, এ কিন্তু মূলতঃ Have's ও Have-nots দুই-ই এর বিরোধ নয়; কারণ, পরাধীন ভারতীয় জীবনে দুই-ই Have-nots.

কলোনিয়াল জীবনের গণ্ডীর মধ্যে এ যেন বড় Have-nots ও ছোট Have-nots-এর পরস্পর বিরোধ, অথবা, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবিকার জগতে (হিন্দু) first comers ও (মুসলমান) late comers-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা—ধর্মগত পার্থক্যবোধ তাতে জুগিয়ে দিল একটা বিষময় উপকরণ। যা ছিল সহজ বৈশিষ্ট্য (characteristics) তাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে লাগল অসুস্থ একান্তিকতা (separatism)। এই একান্তিকতারই নাম সাম্প্রদায়িকতা। রাজনৈতিক জাতীয়তা রইল ধারণায়, কার্যতঃ তা হয়ে উঠতে লাগল ব্যাপক সাম্প্রদায়িকতা।

তবু ধারণায় হলেও জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজমও ছিল—কারণ, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের তা স্বধর্ম—যদিও আমাদের জটিল পরিস্থিতিতে তার ঘটছিল এই বিকৃতি। এই অবিরোধিতা নিয়েই মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালি বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি জীবনে ক্রম-বর্ধমান শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। দেশপ্রীতি ও গোষ্ঠী-একান্তিকতা দুই-ই তাদের ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫-০৭) ব্যর্থতারি একটা কারণ তো তা'ই,—'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' তখন জাতীয় ঐক্যের সম্বন্ধে, জাতীয় স্বাধীনতার নামে উদ্দীপিত। কিন্তু তা বিকাশমান মুসলিম আত্মচেতনার এই দ্বিধা ও দ্বৈত-আবেগ বুঝতে চায় নি; মুসলমান মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক আবেগের প্রকৃতি ও সম্ভাব্যতারও পরিমাপ করতে পারে নি। নজরুলের আবির্ভাবের (১৯২০) আগেই মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত হিসাবে তৈরী হয়ে গিয়েছিল; 'মুসলিম সাহিত্য সমিতি' তার 'পত্রিকা' ও 'সওগাত' প্রভৃতির আবির্ভাব সে জন্যই সম্ভব হয়। মুসলমান শিক্ষিতরা বুঝেছেন—মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে চাই আধুনিক বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সাফল্য। নিশ্চয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ছোপ অংশতঃ গাঢ় হয়ে পড়েছিল। 'মুসলমান সাহিত্য সমিতি' নিজেদের পৃথক করে সংগঠিত করে বাংলা সাহিত্যে নিজেদের ছোপ জোগাবার কথাও ভেবে থাকবেন। অন্ততঃ তাবা ছিল স্বাভাবিক।

এই দ্বিধা সত্বেও কিন্তু বাঙালি হিন্দু মুসলমান দুই শিক্ষিত গোষ্ঠীই একটা কথা অন্তরে অন্তরে বুঝতেন—বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙলা সংস্কৃতিতে তাঁদের সমান উত্তরাধিকার। সেখানে বিরোধের বীজ নেই। বাঙলা লোক-সংস্কৃতির তো কথাই নেই, আধুনিক শিষ্ট সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বাঙালি মাত্রই একান্ত—কোনো গোষ্ঠীই তাতে একান্ত নয়—সেখানে প্রত্যেকের সৃষ্টিতেই প্রত্যেকের সৃষ্টি; প্রতিযোগিতাতেও অন্তর্নিহিত সহযোগিতারই প্রকাশ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি সমস্ত চাকরির কাড়াকাড়ি ও মারামারির মধ্যেও এই সত্যটা অন্তরে-বাহিরে তখনো উপলব্ধি করতেন—বাঙালি লেখক বাঙলা ভাষারই লেখক—শুধু হিন্দুর বা শুধু মুসলমানের নন। অবশ্য বিরোধ যখন জমে উঠল, তখন দুর্বুদ্ধির বশে ১৯২৫-১৯৫০ পর্যন্ত বাঙলা ভাষাকে ফারসী আরবী শব্দের দ্বারা মুসলমানী (?) ভাষায় পরিণত করার জেদ যে উগ্রপন্থীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তা স্বীকার্য। কিন্তু তা কৃত্রিম জেদ—তার লোপ ছিল তাই অনিবার্য।

নজরুলের আবির্ভাব-ক্ষণে ঐক্য ভাবনা নানা কারণে বিশেষ করে প্রবল হয়ে উঠতে পেরেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে সমস্ত মুসলমান জগৎ তখন ব্রিটিশ-বিরোধী। ভারতীয় মুসলমান সেই কারণে ভারতীয় হিন্দুর কাছাকাছি এসে পড়েন। গান্ধীজীর প্রবর্তিত স্বরাজ ও খেলাফত সম্পর্কিত আন্দোলন দুই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাময়িক ভাবে মিলিত করেছে (সেই জোড়াতালি দেওয়া মিলটা "মিলন" নয়, তা স্বীকার্য)। নজরুলকে (১৯২০-২৫এ) তাই সমগ্রভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেন লুফে নেবার জন্য অপেক্ষা করছিল। আর তা নেয়ও। নজরুলের নামে যাঁরা সেদিন 'পাগল' হতেন তাঁদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের থেকে কম ছিল না—এখনো নয়। কিন্তু তা সত্বেও যা স্বীকার্য তা এই—নজরুলের কাব্যে-গানে মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম আত্মপ্রত্যয় লাভ করেন—আত্মপ্রতিষ্ঠারও প্রতিশ্রুতি পান। একটু হয়তো নিরাশও তাঁরা হয়ে থাকবেন—একান্ত করে মুসলমান বাঙালির একান্ত হয়ে তো নজরুল উদিত হন নি—কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, শাত-উল আরব, 'ঈদ মোবারক' যাতেই তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের আনন্দিত ও আশ্বস্ত করুন, মুসলমানের separate identity-স্থাপনে নজরুল কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করতেন না। জীবনে ও ভাবনায় নজরুল আপন সহজ হৃদয়ধর্মে ছিলেন ওরূপ একান্তিকতার (separatism-এর) ঊর্ধ্বে—এমন কি, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদেরও ঊর্ধ্বে—শোষিত জনগণের সহযাত্রী। এসব তত্ত্ব—হয়তো বা এসব কারণে—

নজরুলকে প্রথম থেকে অকুন্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করে বাঙালি হিন্দু মুসলমান সকলে—বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নজরুলের মধ্যেই দেখেছিল আপনার মুখচ্ছবি—কি হিন্দু, কি মুসলমান বাঙালি। এমন কি, আবেগভরা অন্তরে বুঝে-না-বুঝে সকলে স্বীকার করেছিল—'সাম্যের গান গাই'।

তথাপি ১৯২৫ থেকে ১৯৪৭এর মধ্যে মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি আপন বাস্তব আকাঙ্ক্ষার ও মানসিক ভাবনার তাড়নায় ক্রমে বিরোধ-বিচ্ছেদ থেকে 'টু নেশন' থিওরিতে সামিল হয়ে যান। তার প্রধান কারণ—পাকিস্তানের মধ্যেই 'একান্ত' (separate) সত্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের আশা ও আশ্বাস মধ্যবিত্ত মুসলমান বাঙালি অন্বেষণ করেছিলেন। ভেবেছিলেন পাকিস্তানের অর্থ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের স্বরাজ লাভ—যে আশা হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিপত্তিতে অখণ্ড বাঙলায় তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, পূর্ব পাকিস্তানে তাই হবে সফল। স্ববিরোধী হলেও সেই মুসলিম বাঙালি মধ্যবিত্তের জাতীয়তার কবি নজরুল।

দুর্দিনের আশ্রয় নজরুল :

বলা বাহুল্য, দেখতে-না-দেখতে তাঁরা বুঝতে পারলেন 'টু-নেশন' থিওরিতে 'বাঙালিত্বের' স্থান নেই, এমন কি, বাঙলা ভাষা সাহিত্যেরও আশ্রয় দুর্লভ। পাকিস্তানের অর্থ বাঙালি জীবন-ধর্মের বিলোপ, এবং শুধু বাঙালি শিক্ষিত-মধ্যবিত্তের আশাভঙ্গ নয়, পশ্চিম-পাকিস্তানী কায়েমি স্বার্থের (সামন্ত-সৈনিক-প্রাধান-ধনিক প্রাধান্যের) নিকট গণতন্ত্রের বলি, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অধীনে বাঙালির রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল রকমের কলোনিয়াল দাসত্ব। তবু তখনো পাকিস্তানী ভাবধারা বা 'টু-নেশনের' নামে নজরুলের বিরুদ্ধে প্রচার ছিল অসাধ্য। কারণ, নজরুল মুসলিম মধ্যবিত্ত বাঙালির আশার প্রতীক—যতই হোন না নজরুল পূর্বাপর সাম্প্রদায়িক একান্তিকতার শত্রু। এমন-কি, ১৯২৯-১৯৪১ পর্যন্ত তাঁর গানে, কবিতায়, জীবন-দৃষ্টিতে নজরুল এক ধরনের অধ্যাত্ম সমন্বয়বাদী সাধক—যার সমর্থন চিরায়ত ইসলামে মিলে না। পাকিস্তানী মতাদর্শানুযায়ী কোরান ও সুন্নাতেও নিশ্চয় তাঁর কালীস্তব, কৃষ্ণকীর্তন, প্রভৃতি অসহ কুফরি। তর্ক অবশ্য তখনো উঠেছিল—নজরুল 'মুসলিম নেশনে'র কবি নন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজ থেকে নব শিক্ষিত শ্রেণী ক্রতগতিতে উদ্ভূত হল—তাদের মনে 'হিন্দু জাতীয়তার' কোনো দুঃস্বপ্ন আর

নেই। তরুণ শিক্ষিত সমাজ তাঁদের এই সাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রগতি প্রেরণার পুরোধাকে কোনো কারণেই ছাড়লেন না—তাঁরা স্বাধীনতা চান, তাঁরা আধুনিক জীবন চান, তাঁরা প্রগতিবাদী, তাঁদের মন্ত্র 'চলরে চলরে চল'—নজরুল নয় তো পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি হবেন কে? কোন্ মোল্লা না মৌলবী?

দ্বিতীয় রিনাইসেন্স:

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কিন্তু তখন তখনি পূর্ব পাকিস্তানে এত উৎসাহ দেখা যায় নি। তার সহজ কারণ আমরা বলেছি। আরও কারণ—রবীন্দ্রনাথ যে স্তরের কাছে প্রগতিরূপ মহাকবি তাদের শিক্ষা দীক্ষা আরও সূক্ষ্মতর ও গভীরতর হওয়া প্রয়োজন। ১৯৪৭-'৪৮এ সেরূপ বোধের অধিকারী মুসলমান শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা ছিল কম। অবশ্য তুস্তর যে বাধা বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের জন্ম তা তখন প্রবল; অন্য দিকে পূর্ব বাঙলার অধিকার-চ্যুত বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তানী চক্রান্ত তখনো তত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি। তা প্রত্যক্ষ হবার পক্ষে প্রথম অসহনীয় ঘটনা—বাঙলা ভাষার উপর আঘাত (১৯৫২)। তাতে একমুহূর্তে পাকিস্তানী নীতির বিরুদ্ধে বাঙালির মনে বিদ্রোহ জাগ্রত হল—বাঙালিত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণে পাকিস্তানীদের প্রধান ও প্রথম অস্ত্র হল—বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতি বিনাশ। বই, সংবাদপত্র, যাতায়াত, ব্যবসাপত্র—দুই বাঙলার মধ্যে সব সম্পর্ক রুদ্ধ করেও কোনো পথই পাকিস্তানী শাসকেরা পেলনা,—অত্যাচারে না, আর ঘুষের ব্যবস্থায়ও না, বাঙলা ভাষাকে 'মুখে' মেনে নিয়ে না, বাঙলা সাহিত্যকে উৎসাহ দিয়ে না, বাঙলা একেডেমির বাঙলা গবেষণায় অর্থ জুগিয়ে না, এমন কি, বাঙলার অধ্যাপক-গবেষকদের মোটা মাইনে ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েও না। কারণ, ১৯৫২ এর ভাষা-আন্দোলনের সময় থেকে একদিকে দেখা দিল নতুন শিক্ষিত যুবক শ্রেণী ও সাংস্কৃতিক রিনাইসেন্সের তৎপরতা। অন্যদিকে বছরের পর বছর সামরিক শাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণে এই সত্যই আরও পরিষ্কার হয়—পূর্ব বাঙলায় বাঙালি মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ পায়নি, পাবে না; পেয়েছে কলোনিয়াল শাসন ও শোষণ। তাই বাঙালি শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত সেই ১৯৫২ এর আঘাতেই এমন নতুন বাঙালিত্বে ও বাঙালি সংস্কৃতির সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল যাকে 'দ্বিতীয় বাঙালি রিনাইসেন্স' বলা অন্যায় নয়। এই কার্য-পরম্পরার মধ্য দিয়েই তাদের রিনাইসেন্স-প্রবুদ্ধ বাঙালি চেতনা নজরুলের অপেক্ষাও মহত্তর আশ্রয় পেল রবীন্দ্রনাথে—যে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বমানবের মুক্তির অগ্রদূতে, তাঁর কাছ থেকে সেই মহৎ মন্ত্রের সঙ্গে পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান এবার সংগ্রহ করলেন বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধনায় আত্মনিয়োগের দীক্ষা।

ভারতবর্ষে ইস্‌লামের সমস্যা :

আরও দুটি কথা হয়তো এই সূত্রে এখানে উল্লেখ করা যায়—যদিও তার বিশদ আলোচনা এখানে অসম্ভব। ইস্‌লামের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট—কলিমা, ও কোরাণে ধোঁয়া নেই। তবু মুসলিম সমাজ দেশে দেশে বিশিষ্ট আকার লাভ করেছে, কালে-কালে পরিবর্তিত হয়েছে—৮ম/১০ম শতাব্দীর আরবের চিরায়ত মুসলমান সমাজ আরবীয় দেশসমূহেও বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে—তাদের সেরূপ জাতীয় সত্তা বিকাশের পক্ষে ইস্‌লাম বাধা হয় নি। ধর্মমতে যতটাই মিল থাক, সমাজ বিবর্তন জাভা থেকে আলজেরিয়া পর্যন্ত, সোভিয়েত তুর্ক দেশগুলিতে ও খাঁটি তুর্কি দেশে একভাবে ঘটে নি। বিশেষ করে তুর্কি প্রভৃতি দেশ যুগধর্ম অনুযায়ীই জাতীয় জীবন গঠনে সচেষ্ট—'ইস্‌লামিক রাষ্ট্রের' দোহাইতে তারা কানও দেয় না। ভারতের মত উপমহাদেশেও ইস্‌লামের কম বৈচিত্র্য দেখা যায় নি। গুজরাতীয় খোজা মুসলমান ও পাঞ্জাবী সৈয়দ, জাঠ, রাজপুত মুসলমান কি আচারে বিচারে পার্থক্যহীন? সে সব সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমানকে ভেঙে চুরে এই "ইস্‌লামি রাষ্ট্র" স্থাপনের অপচেষ্টার তবে অর্থ কি?

অর্থ না হোক একটা কারণ এই :—আরব, ইরাণ থেকে জাভা পর্যন্ত দেশে ইস্‌লাম প্রায় একমাত্র ধর্ম। ভিন্ন কোনো ধর্মের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ যেখানে পাঁচ শত বৎসর রাজত্ব করেও ইস্‌লাম পুরোপুরি দেশের এক-তৃতীয়াংশেরও ধর্ম হয়ে উঠতে পারে নি। তাই ভারতবর্ষে তার গর্ব ও শক্তিবোধ আছে কিন্তু আশঙ্কাও তেমনি প্রবল। সেই আশঙ্কা ও আত্মরক্ষার তাগিদে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ ধর্মগত গণ্ডী দিয়ে আপনাকে পৃথক করে রাখতে না পারলে স্বস্তিবোধ করেন না। এদেশে ইস্‌লামের স্বাভাবিক বিকাশও এজন্য ব্যাহত। কিন্তু যেখানে ইস্‌লাম অধিবাসীদের একমাত্র ধর্ম, সেখানে ইস্‌লামের স্বাভাবিক বিকাশে এরূপ বাধা ঘটে না। অবশ্য সব ধর্মেই গোঁড়া থাকে, সব দেশেই তারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এবং আধুনিক জীবন ও ভাবনাকেও বাধা দেয়, তা জানা কথা।

নজরুলের নির্দেশ :

এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা ছেড়ে শেষ কথাটায় আসি—বাঙলা দেশ ও নজরুল। পূর্ব বাঙলায় ১৯৪৭ থেকে এই ১৯৭০ এর মধ্যে যে স্বপ্নাতীত গণজাগরণ ঘটেছে তার আয়োজন আরম্ভ হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই —মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আবির্ভাবে। সেই মধ্যবিত্ত শক্তি পূর্ব বাঙলায় 'বাঙলাদেশের' জাতীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে—জনসাধারণ ও তাঁদের নেতৃত্ব একবাক্যে মেনে নিয়েছে। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও এখন আত্মপরীক্ষা দরকার—নজরুলকে ও রবীন্দ্রনাথকে—কি ভাবে তাঁরা এখন গ্রহণ করবেন? কথা এই—জনযুদ্ধের নেতৃত্ব শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণী-আদর্শ ও শ্রেণী-পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বাঙলা দেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রধান শর্ত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, যুক্তফ্রণ্ট; সেই মুক্তিসংগ্রাম গণতান্ত্রিক আদর্শে গণবিপ্লবের উদ্দেশ্যে পরিচালনা। 'বাঙলাদেশের' জাতীয় নেতৃত্ব নজরুলের বিদ্রোহের আহ্বান ও নজরুলের প্রেরণাতেই পাবেন তাঁদের এই গতিপথের সন্ধান। নজরুলের মন্ত্র—'সাম্যের গান গাই'। জনশক্তির নেতৃত্বে জাতীয় বিপ্লবকে গণবিপ্লবে রূপায়ণ — এই তো নজরুলের ইঙ্গিত।

মানুষ নজরুল | প্রেমেন্দ্র মিত্র

কবিকে তাঁর কাব্যে খোঁজা বৃথা।

রবীন্দ্রনাথ থেকে আরো অনেক রথী-মহারথীর মত কতকটা এই রকম।

কথাটা হয়ত আংশিক সত্য। কবির কাব্য প্রত্যক্ষভাবে ঠিক তাঁর জীবনের প্রতিবিম্ব বেশির ভাগ সময়ে হয় না। কিন্তু কবি আর তাঁর রচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়াও হতে পারে না। কবির বাইরের জীবন না হোক, তাঁর অন্তর্সত্তাই তাঁর লেখার উপাদান যোগায়।

দু-একজন কবি-লেখকের বেলায় অবশ্য সাধারণ নিয়ম পুরোপুরি খাটে না। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে খুশি হবার মত ব্যতিক্রমই সেখানে দেখা যায়। কবির কাব্য থেকে তাঁর যে ছবি মনের মধ্যে আঁকা হয় বাস্তবে তার বিপরীত কিছু দেখা যায় না।

দেশ-বিদেশের সাহিত্যে কাব্য আর কবির জীবনের বাহ্যিক সঙ্গতির এ রকম দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়। বেশি দূর না খুঁজেই ইংলণ্ডের বায়রণ আর ইতালীর দানুনৎসিওর নাম মনে পড়বে। লেখাও যেমন ব্যক্তিগত জীবনও এঁদের তেমনি উদ্দাম অস্থির বর্ণাঢ্য।

এঁদের মত কবি ও লেখকের বেলায় তাঁদের সৃষ্টি আর ব্যক্তি সত্তাকে আলাদা করে দেখা যায় না। মানুষ ও সাহিত্য স্রষ্টা একই সঙ্গে মিলিয়ে চিনতে হয়।

বাংলা দেশ একদিন কাব্য দিগন্তে নতুন এক কণ্ঠ-নির্ঘোষে চমকে উঠে উৎকর্ণ হয়েছিল।

মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ

আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস

মহাভয় আমি অভিশাপ পৃথ্বীর

আমি দুর্বার

আমি ভেঙে করি সব চুরমার

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল

আমি দলে যাই যত বন্ধন

যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল

আমি ঝঞ্ঝা আমি ঘূর্ণি
আমি পথের সমুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি
আমি নৃত্য পাগল ছন্দ
আমি আপনার তালে নেচে যাই
আমি মুক্ত জীবনানন্দ।

এ কবিতা কার লেখা হতে পারে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার সেদিন অন্ত ছিল না সত্যিই।

তার আগে মহাকবির কণ্ঠে আমরা অবশ্য শুনেছি,

চাব না পশ্চাতে মোরা
মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক।
গণিব না দিন ক্ষণ
করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক
মুহূর্তে করিব পান
মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি
খিন্ন শীর্ণ জীবনের
শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

শুনেছি,

বীণাতন্ত্রে হানো হানো
খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্ঝনা
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দয় ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর
আনন্দে আতঙ্কে মিশি
ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি

উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।

নতুন অজানা কবির কণ্ঠে বাংলা দেশ সেদিন যা শুনেছিল তার মধ্যে পূর্ববর্তী কবিতার সংযত সংহত শক্তির বদলে যে দুর্বার বাঁধভাঙা উন্মত্ততা ছিল তা রচয়িতার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে তীব্র কৌতূহলেরই সৃষ্টি করেছে।

বিদ্রোহের এই অশান্ত অস্থির বজ্রনির্ঘোষ কি নিরাপদ নীড় বিলাসী কোন নিরীহ কলমবাজের কাল্পনিক উচ্ছ্বাস?

শুধু ফাঁকা কথার ফুলকি?

সত্য মিথ্যায় মিলে অনেক রকম রটনাই সেদিন মুখে মুখে ফিরেছে।

সামান্য দু-চারটে সত্য খবর তার মধ্যে অবশ্য ছিল।

আমি তাই করি ভাই যখন চায় এ মন যা;
করি শত্রুর সাথে গলাগলি
ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা।
আমি উন্মাদ আমি ঝঞ্ঝা।

যাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছে তিনি বাংলা দেশের মুখোজ্জ্বল করা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাংলা সেনাদলের একজন হাবিলদার এটুকু তখন জানা গেছে। আরো জানা গেছে যে কবিতার মতই জীবন তাঁর নিরাপদ নীড়ের নিগড়ে বাঁধা নয়।

সারা জীবন পাহাড়-প্রমাণ বই লিখেও অনেকের ভাগ্যে যা হয় না, বিদ্রোহী কবিতার কবি সাহিত্যে আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই কিংবদন্তীর মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

এই কিংবদন্তীর মানুষের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার কথাটা ভাবলেই যেন তাঁর ব্যক্তিসত্তার একটা ইঙ্গিত পাই।

তারিখটা মনে নেই। কবি নজরুল তখন জেল থেকে বেরিয়ে হুগলীতে একটি বাসা নিয়ে আছেন। সমবয়সী দু'জন সাহিত্যব্রতী বন্ধুর সঙ্গে আমি আরেক স্বর্গত অগ্রজ-প্রতিম লেখক সুবোধ রায়ের বাড়ি নৈহাটিতে গিয়েছি কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সুযোগ হবে এমনি একটা আশ্বাস পেয়ে।

সে আশ্বাস মিথ্যা হয় নি। নজরুল ইসলামের দেখা সেদিন পেলাম। পেলাম তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের উপযুক্ত পরিবেশেই বলতে হয়। ঘরের মধ্যে চার দেয়ালের বেষ্টনীতে নয়, একেবারে খোলা আকাশের নিচে মুক্ত পথের ওপরে।

মনে আছে নৈহাটির গঙ্গার দিকে রাস্তা। ডান দিকে তার একটা লম্বা টানা উঁচু দেয়াল। কোনো কারখানারই হবে। এখনও সেটা বোধ হয় সেই রকমই আছে।

নজরুল হুগলী থেকে নৌকোয় পার হয়ে আসবেন আমরা সেই রাস্তা ধরে আগে থাকতে তাঁর সঙ্গে দেখবার জন্তে চলেছি। দুপুর বেলা, কিন্তু এইটুকু মনে আছে যে মেঘলা বলে রোদটা চড়া ছিল না। রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই বাসন্তী রঙের একটা ঝলক চমকে দিল সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ মধুর কণ্ঠের আকাশে আনন্দের তরঙ্গ তোলা এমন একটা প্রাণখোলা হাসি, যা আগে বা পরে আর কারুর কাছে শুনেছি বলে মনে করতে পারি না।

কিংবদন্তীর মানুষের প্রথম দেখা পাওয়াটাই চমক দেওয়া নয়, তাঁর পরের পরিচয় যা পেলাম তাও একেবারে অসামান্ত।

উৎসাহী প্রাণবন্ত মানুষ এর আগে আর দেখি নি এমন নয়, কিন্তু এ যেন সত্যিই প্রাণের বন্তাবেগ মূর্ত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত।

সেই প্রথম দিনেই মনে আছে নৈহাটিতে অগ্রজ বন্ধুর বাড়িতেই দুপুর থেকে গল্পের গানের আসর বসেছিল। সে আসর ভেঙেছিল এমন সময়ে যে রাত্রের ট্রেনে বাড়ি ফেরা আর সম্ভব হয় নি।

কবি নজরুল ইসলামের সান্নিধ্যই যে একটা অদ্ভুত ভিন্ন অভিজ্ঞতা, সেদিনই বুঝেছিলাম। চলায় ফেরায় কথায় গানে হাসিতে এই আশ্চর্য মানুষটি যেন দুরন্ত এক প্রাণ তরঙ্গ সারাক্ষণ ছড়িয়ে দেন চারিদিকে। আনন্দের বিদ্যুৎ-স্পন্দন অনুভব করা যায় তাঁর চার পাশের আকাশে বাতাসে।

কবি নজরুল যখন কবিতার পর কবিতায় গানের পর গানে বাংলা দেশের হৃদয় মন প্রাণ উদ্বেল করে তুলছেন, মানুষ নজরুল তখন খ্যাতির নির্জন সুমেরু শিখরে নিজেকে অনধিগম্য করে রাখেন নি। দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবিরাম অক্লান্ত তাঁর পরিক্রমা তখন চলছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ তখন যেমন উদ্দীপনা যোগাচ্ছে তেমনি ঝলসিত হয়ে উঠছে সমাজের গ্লানি কলঙ্কের. বিরুদ্ধে পরম নির্ভীকতায়। দেশের যেখান থেকে ডাক এসেছে সেখানেই তিনি সাড়া দিয়েছেন। কোথাও কোনো না কোনো আসর কি সভায় নজরুল ইসলাম উপস্থিত নেই এমন দিন তখন বোধহয় বিরল ছিল। তিনি সেদিন শুধু কি জ্ঞানী গুণী বিদগ্ধ উচ্চ কোটির মানুষের সমাবেশই অলংকৃত করেছেন? একেবারেই না। ও ধরনের ধনী-নির্ধন উচ্চ-নীচ বিচারই তাঁর ছিল না। শুধু একটু ভালবাসায় অনুরাগের আন্তরিকতার স্পর্শ থাকলেই কোনো

ম. ন. ঝা.—১৩

আহ্বান পারতপক্ষে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি। হারমোনিয়ম নিয়ে একবার বসিয়ে দিতে পারলে যে কোন জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি গানের নেশায় যেন হুঁস হারিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। রসদ শুধু পান আর চা। ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই তাইতেই তাঁর ঘুচে যেত।

কাছে থেকে নজরুল ইসলামকে দেখবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারাও তাঁর এ অসীম অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস কোথায় ভেবে অবাক হয়েছেন।

নজরুল ইসলামের বেলা জৈব রসায়নের সাধারণ নিয়ম যেন পাল্টে যায়। শেষ নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার আগে তাঁকে অসুস্থ হতে কখনো দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। শুধু অসুস্থতা থেকেই যে তিনি মুক্ত ছিলেন তা নয়, তাঁকে অসুখীও কখনো দেখা গেছে বলে স্মরণ করা কঠিন। হৃদয়ে কোনো বেদনার আঘাত কখনো তিনি অনুভব করেন নি। শোক দুঃখ হতাশা বলে কিছুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না এমন কথা নিশ্চয় বলব না, কিন্তু মনের ভেতর যাই থাক একটি উজ্জ্বল প্রসন্নতা সারাক্ষণ তাঁর মুখে লেগেই থাকত।

আর একটি আশ্চর্য বিশেষত্ব সেদিন তাঁর সঙ্গ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা হয়ত মনে করতে পারবেন। সে বিশেষত্ব তাঁর আত্ম-নিমগ্নতা। যেখানে অসামান্য জনপ্রিয়তার দরুন নিঃসঙ্গ হবার সুযোগ তিনি খুব কমই পেতেন—কিন্তু যে ধরনের জনতার মধ্যেই থাকুন না কেন, সমস্ত হৈচৈ হুল্লোড়ের মাঝে কোথায় যেন একটা তন্ময়তার মূল সুর তাঁর মনে ধরাই থাকত।

তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তির রহস্য হয়ত ওই তন্ময়তার মধ্যেই নিহিত।

জনগণের চারণ হিসাবেই নজরুলের প্রথম প্রতিষ্ঠা ও অক্ষয় খ্যাতি।

কিন্তু তিনি কি শুধুই জনতার মানুষ? তাঁর যা কিছু পরিচয় সবই কি প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে সংগ্রহ করবার?

না, তা নয়।

কাব্যে যেমন জীবনেও তেমনি প্রচণ্ড বজ্র নির্ঘোষের নেপথ্যে একটি নিভৃত হৃদয়ের করুণ কোমল সুর তাঁর মধ্যে চিরদিন বেজে এসেছে। চরিত্রের মধ্যে এই বিপরীতের সমন্বয়ের দরুনই বিদ্রোহী কবিতার প্রথম উদ্দাম ও প্রায় অসংলগ্ন উচ্ছ্বাসেও তিনি—

আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস
—আমি সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস
আমি মহাপ্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস

আমি কভু প্রশান্ত কভু অশান্ত
দারুণ স্বেচ্ছাচারী
আমি অরুণ খুনের তরুণ
আমি বিধির দর্পহারী

বলে আস্ফালনের পর

আমি উন্মন মন উদাসীর
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস
হা হুতাশ আমি হুতাশীর—

মত পঙ্‌ক্তির অপ্রত্যাশিত ও এক হিসেবে তাঁর ক্ষেত্রে অনিবার্য আক্ষেপের করুণতায় না নেমে পারেন নি।

ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর হৃদয়ের এমনি একটি একান্ত করুণা কোমল প্রকাশ দেখবার সুযোগ অনেকেরই হয়েছে।

জন-বন্দিত হয়ে নিজের মনের গোপন নির্জনতাটুকুও তিনি হারান নি, কবি ও মানুষ নজরুলের এইটিই বোধহয় সবচেয়ে বড় পরিচয়।

বাঙলাদেশ ও নজরুল

[একটি ঘটনার স্মৃতি]

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমি যে এককালে কবিতা লিখতুম, একথাটা আমার সাংবাদিক জীবনের ডামাডোলের জন্ত একেবারে চাপা পড়ে গেছে। তবু এদিক ওদিক দু'একজন এমন সমঝদারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁরা আমার যৌবন কালের কবিতা পড়েছেন এবং আমার 'শতাব্দীর সঙ্গীতের' (আমার সেরা কবিতাগুলির সঙ্কলন, কিম্বা আপাততঃ আমার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ) কিছু কিছু প্রশংসাও করে থাকেন। অর্থাৎ আমার সাহিত্য জীবনের সুরু হয়েছিল কবিতা দিয়ে এবং এটা কিছু নতুন কথা নয়। কেননা, আমাদের তারুণ্যের যুগে এমন ছেলে কম পাওয়া যেত যে দু'চার লাইন কবিতা কিম্বা কোন গল্প লেখে নি। হাল আমলের খুনোখুনি এবং বোমা পিস্তল সত্বেও তরুণ লেখকদের কবিতা লেখায় কোন ভাঁটা পড়ে নি। আবেগপ্রবণ বাঙালী জাতির এটা বৈশিষ্ট্য এবং এককালে বাঙলার বাইরেও একথা স্বীকার করা হতো যে, লেখাপড়ায় (সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে) বাঙালী বাবুরা ভারতবর্ষের সেরা জাত। অবশ্য সেই গৌরব রবি অনেকদিন আগেই অস্তমিত।

আমি গ্রামের ছেলে এবং গরীবের ঘরের ছেলে। আর পূর্ব্ববঙ্গে আমাদের যে গ্রামে বাড়ি ছিল, সেটাকে অজ পাড়াগাঁ বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হবে না। তখন আমাদের গ্রামে হাইস্কুল ছিল না, অতএব মাইল দুই আড়াই দূরে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু তার অনেক আগেই কাব্য-সরস্বতীর দুয়ারে আমি ধর্ণা দিতে সুরু করেছিলাম, তাঁর কাছে মনে মনে বর প্রার্থনাও করেছিলাম। সেই সময়টা ১৯২১, ১৯২২ ও ১৯২৩ সালের কথা, সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী জনজীবনে জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ সুরু হয়েছে। যে দূরবর্ত্তী গ্রামে সূর্য্যের আলো পর্যন্ত জলাজঙ্গলের ভিতর দিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করতো, সেখানে কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচণ্ড স্রোত অনায়াসে প্রবেশ করলো এবং আমাদের মত লক্ষ লক্ষ তরুণ হৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠলো। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলবার জন্ত সারা দেশ যেন বিদ্রোহের মুখে এসে দাঁড়ালো। অপূর্ব্ব উত্তেজনায় সমগ্র জাতীয় জীবন যেন থর থর করে কাঁপছিলো।...

ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটলো। "বলো বীর চির উন্নত মম শির"!—বিদ্রোহী কবির আবির্ভাব। রুদ্র দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে বাঙলার জাতীয় জীবনে এ কার আবির্ভাব ঘটলো? মহাযুদ্ধ ফেরত কাজী নজরুল ইসলাম। সমগ্র বাঙ্গালী জাতটাকে যেন ভেরী নিনাদে নতুন যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান জানালো। এই সুর, এই ছন্দ, এই আবেগ, এই ধ্বনি সম্পূর্ণ নতুন। সেই কবিতার বলিষ্ঠ আবেদন এবং তার উন্মাদিনী শক্তিকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই—সারা বাঙলা দেশের তরুণ সমাজ, সমগ্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যেন মুগ্ধ অভিভূত এবং উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। সেই যুগ সম্পর্কে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা সেদিনের বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের প্রচণ্ড প্রভাব এবং 'ধূমকেতু'র মত তাঁর বিস্ময়কর অভ্যুদয় কল্পনা করতেও পারবেন না। আমার মত অজস্র তরুণ মনে মনে সেই বিদ্রোহী কবির প্রেমে পড়ে গেল।

* * *

১৯২৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর ভাগ্যের সন্ধানে—অর্থাৎ কলেজে ভর্তি হওয়া যদি সম্ভব হয়, কিন্তু অগত্যা একটা চাকুরি—যদিও ছুটোই আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, তবু সেই দুরাশায় এলাম হুগলী-চুঁচুড়ায় এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখানে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমার সমবয়সী এবং কি এক সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সখ্যতা হয়ে গেল। প্রাণতোষ শহরের ছেলে, খুব চটপটে, স্মার্ট, আর আমি পূর্ব্ববঙ্গের পাড়াগাঁয়ের ছেলে, লাজুক এবং ভীরু। কিন্তু আমি হুগলী-চুঁচুড়া পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণতোষ আমায় বললেন:

'চলো না কাজীদার কাছে যাই?'

'কাজীদা? কাজীদা কে?'—আমি সহসা বুঝতে না পেরে প্রাণতোষকে জিগ্যেস করলুম।

প্রাণতোষ একটু গর্ব্বের সঙ্গেই জবাব দিল:

'আরে কী বোকা, কাজীদা—কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহী কবি নজরুল!'

আমি তো প্রাণতোষের কথা শুনে হতভম্ব। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বিখ্যাত লোকদের কথা শুধু বইতে পড়েছি, কিন্তু চাক্ষুষ তাঁদের দেখতে পাওয়া যায়, এমন ধারণা কখনও ছিল না। বিশেষতঃ বিদ্রোহী কবি নজরুল, যাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তায় তখন আমাদের তরুণ মনের তিন ভুবন আচ্ছন্ন। এমন লোককে দেখতে পাবো, এতো তিন জন্ম তপস্যার ফল! কিন্তু প্রাণতোষ শহুরে ছেলেদের

মত চালবাজি করছে না তো এবং আমার মত 'বাঙাল'কে বধ করার ফিকিরে নেই তো ?…

কিন্তু সমস্ত সংশয় কাটিয়ে প্রাণতোষের সঙ্গে সত্যি সত্যি চললুম। হুগলী শহরের একটা সাধারণ পল্লী, একটা সাধারণ দোতলা ছোট বাড়ির সামনে আমি ও প্রাণতোষ এসে দাঁড়ালাম। অপরিমিত কৌতূহলে আমি বাড়িটার দিকে তাকালাম। তখন সকালবেলা, তারিখটা মনে নেই, কোথাও নোট করেও রাখি নি। প্রাণতোষ একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলো—

'কাজীদা ? কাজীদা বাড়ি আছেন, আমি প্রাণতোষ ….'

কিছুক্ষণ বাদেই সিঁড়ি দিয়ে একজনকে নেমে আসতে দেখা গেল—ঝাঁকড়া কোকড়ানো চুল, ভারী গোল মুখ, অপূর্ব্ব দুটি আয়ত চোখ, প্রসন্ন বদন, সমগ্র মুখমণ্ডলে যেন একটা ঔজ্জ্বল্যের আভা। মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারলুম যিনি নেমে এলেন, তিনি স্বয়ং বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম।

প্রাণতোষ হঠাৎ কৌতুকের ভঙ্গিতে বিদ্রোহী কবিকে জিগ্যেস করলো—

বলুন তো কাজীদা, কাকে সঙ্গে এনেছি ?

বলা বাহুল্য যে, আমরা দু'জনে তখন ছেলেমানুষ, প্রশ্নটাও ছেলেমানুষের মত, কাজেই মুহূর্ত্তের জন্য আমি বোধহয় বিব্রত বোধ করলুম।

নজরুল ইসলাম সোজা আমার মুখের দিকে তাকালেন….কয়েক মুহূর্ত্ত… তারপর পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন—

'বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়' !

বিনা মেঘে হঠাৎ বজ্রাঘাতে কোন মানুষ না মরে যদি শুধু স্তম্ভিত হয়ে থাকতো, তা'হলে তার যে দশা হতো, আমার দশা তখন অনুরূপ। অপরিসীম বিস্ময়ে আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—বিদ্রোহী কবি কি কিছু মন্তর-টন্তরও জানে ?—নইলে এটা কিভাবে সম্ভব ? আমি একটা অজ্ঞাত অখ্যাত বালক মাত্র এবং পাড়াগাঁ থেকে সদ্য হুগলীতে আগত। আমার নাম কি করে জানলেন এবং চিনলেনই বা কি ভাবে ?….

অনেকক্ষণ এই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারলুম না।

পরে ওই রহস্যের উদ্ঘাটন হলো।

আগেই বলেছি আমার তখন কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল। বিদ্রোহী কবির খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার তরঙ্গ আমাদের মত দূরবর্ত্তী গ্রামের স্কুল ছাত্রদেরও প্লাবিত করলো। সেই সময়ের (১৯২৩) লেখা আমার 'উদ্বোধন' নামে একটি

'উদ্দীপনাময়ী' অর্থাৎ নজরুলের প্রভাবে উদ্দীপিত একটি কবিতা রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র "উদ্বোধন" মাসিক পত্রিকায় একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো।—জীবনের প্রথম কবিতা 'উদ্বোধনের' প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো, স্বভাবতই তা'তে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। 'উদ্বোধনের' সেই সংখ্যায় নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি নাতিদীর্ঘ উচ্ছ্বাসপূর্ণ এবং আবেগপূর্ণ আলোচনা ছিল। বোধহয় রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' কথাও সেই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছিল।

হুগলীর সেই বাড়িতে একতলায় তখন নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের ও তারুণ্যের আড্ডা। সেই আড্ডায় "উদ্বোধনের" সেই সংখ্যাটি নিয়ে তোলপাড়। প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমার কবিতা এবং আমার নাম ও রামকৃষ্ণ মিশনের কাগজ—এই দুইয়ের যোগাযোগে নজরুলের সেই আড্ডায় বেশ কিছুটা কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। সেই উপলক্ষে প্রাণতোষ বলে রেখেছিল যে, এই কবিতার লেখককে সে জানে, নিতান্তই স্কুলের ছাত্র মাত্র।

সুতরাং বিদ্রোহী কবি আমাকে দেখা মাত্রই চিনেছিলেন, যদিও ওভাবে চিনতে পারা কম শক্তির পরিচায়ক নয়।···

নজরুলের মত এমন প্রাণখোলা দিলদরিয়া মানুষ সাহিত্য জগতে খুব কমই আবির্ভূত হয়েছেন। এত সরল, এত উদার, অথচ বলিষ্ঠ ও মিষ্টি মানুষ আমি আর দ্বিতীয়টি দেখি নি। যে কয়েক মাস হুগলি-চুঁচুড়ায় ছিলাম, প্রায়ই বিদ্রোহী কবির আড্ডায় যেতাম। প্রতিদিন দেখেছি ছাত্রদের যুবকদের ভীড়—নজরুলের সেই প্রাণখোলা হাসি, উদাত্ত কণ্ঠ, আর রহস্যপ্রিয়তা। আমাকে যেন একেবারে আপন করে নিলেন—কিশোর তরুণ ছোট্ট ভাইটির মত। এত অন্তরঙ্গতা, এত ভালোবাসা সেদিন তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম যে, সারা জীবনেও সেটা ভোলবার নয়। স্বভাবতঃই যাঁরা সেই আড্ডায় আসতেন তাঁদের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ নজরুলকে কবিতার জন্য তাগাদা দিতেন। আর নজরুল আমার দিকে তাকিয়ে তাঁদের বলতেন—

"আরে, আমাকে তাগাদা দিচ্ছিস কেন? ওই যে বিবেকানন্দ রয়েছে। সুন্দর হাত, ভালো কবিতা লেখে, ওর কাছ থেকে কবিতা নে। ও যেন প্রভাতের শুকতারা—মর্নিং ষ্টার!"

এভাবে একজন অজ্ঞাত পরিচয় বালককে সাহিত্যের আড্ডায় পরিচিত করে তোলা কত বড় হৃদয়বত্তা, উদারতা ও ভালোবাসার পরিচয় সে কথা ভাবলে

কলকাতার বাধা ছুইয়ে আসে। 'মর্নিং ষ্টার' বা 'শুকতারা' বলে আমাকে যে বর্ণনা করতেন, তার মধ্যে বিদ্রোহী কবির আমার প্রতি কেবল গভীর অনুরাগ নয়, তাঁর কাব্যমণ্ডিত অনুভূতিরও ওটা অপূর্ব্ব প্রকাশ। যাঁর চিত্ত নির্মল এবং প্রসন্ন একমাত্র তাঁর পক্ষেই দিগন্তব্যাপী খ্যাতির অধিকারী একজন অসামান্য কবির পক্ষে সাহিত্য জগতের দ্বারদেশের বাইরে অপেক্ষমান একজন অজানা তরুণকে এভাবে বরণ করে নেওয়া সম্ভব। ··

জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বহু উর্দ্ধে উঠে নজরুল ইসলাম একমাত্র কবিরূপে যে ভাবে তরুণ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার কোন তুলনা নেই। তাঁর কাব্যে তাঁর সাধনায় এর বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু আমি সেই তরুণ বয়সে হুগলীর আড্ডায় দেখেছি কলেজের ছেলেরা দলে দলে আসতো, আর বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যেন কৃতার্থ হয়ে চলে যেতো।

আমি গ্রামের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। সুতরাং সেই দৃশ্যটা ব্যক্তিগত-ভাবে আমার কাছে অভাবনীয় এবং আশ্চর্য্য লাগতো। বিদ্রোহী কবি সে দিনের, বাঙলা দেশে সত্যি সত্যি বিদ্রোহের এক অপূর্ব্ব চিন্তাধারা এনেছিলেন।

কেবল কবিতায় নয়, গানে গানে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। "দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার"—আমাদের সেদিনের জাতীয় জীবনের যেন অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতের মত আলোড়ন এনেছিল।

কিন্তু এখানে আমি নজরুল ইসলামের কবিতা, গান ও সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য ও অবদান নিয়ে আলোচনা করতে বসি নি। যোগ্যতর ব্যক্তিরা সে আলোচনা করবেন। কিন্তু আমার সাহিত্য জীবনের বোধন লগ্নে বিদ্রোহী কবির প্রভাব ও স্মৃতি আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে এবং একথাও আমি ভুলতে পারি না যে, আজ যে বাঙলাদেশ বিদ্রোহীরূপে সারা পৃথিবীতে অদ্ভুত চাঞ্চল্য এনেছে, নজরুল ইসলাম সেই বিদ্রোহী বাঙলার চিরবিদ্রোহী কবি এবং সেই বাঙলাদেশের মাটিতেই আমারও জন্ম, কবিতার বীজও সেই মাটিতেই উপ্ত হয়েছিল।····

রবীন্দ্রনাথ কবি সার্ব্বভৌম, কবি-সম্রাট, সর্ব্বভূমির তিনি কবি, তাঁর কবিতার সাম্রাজ্য পৃথিবীব্যাপী। তিনি বহুদূর গগনের রবির মত, সর্ব্বত্র তিনি ভাস্বর—দূর দিগন্তব্যাপী তাঁর আলো। কিন্তু তিনি আমাদের নাগালের বাইরে, তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তিনি সম্রাট। কিন্তু নজরুল যেন যুবরাজ, রাজপুত্র—সেই রাজপুত্রকে আমরা ভালোবাসি, তিনি রূপকথার নায়ক, তিনি পক্ষীরাজের

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

পিঠে চড়ে ধাবমান, ঘুমন্ত রাজকন্যাকে তিনি ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে আসবেন —আমাদের ঘর ঘরে হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি বেজে উঠবে। বাঙলাদেশেও শঙ্খধ্বনি বাজবে, মেয়েরা হুলুধ্বনি দেবে, বধূরা প্রদীপ তুলে ধরবে—নতুন যুগের বিদ্রোহী এসেছে জয়মাল্য কণ্ঠে—একান্তরূপেই বাঙলাদেশের কবি, বাঙালীর কবি নজরুল ইসলাম—যেন নতুন বিদ্রোহের লোকনায়ক। নজরুলের বাঙলা অজেয়, অপরাজেয়—সেই বাঙালী সাময়িকভাবে মূর্চ্ছিত হতে পারে, কিন্তু মৃত নয়। পদ্মা মেঘনার তরঙ্গে নতুন অগ্নিবীণার ঝঙ্কার, অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ সেই রণভূমিতে একদিন স্তব্ধ হবে এবং বিদ্রোহীর চির উন্নত শির হিমালয় শৃঙ্গকে ভেদ করে উর্দ্ধাকাশে একদিন চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে দাঁড়াবে। নজরুল সেই আশ্চর্য বিদ্রোহের কবি এবং বাঙলাদেশ সেই কবিতার পাঠক।

নির্বাক নজরুল

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ছাত্রজীবনে নজরুলের গান আর কবিতায় আমরা মেতে উঠতাম। বড়ো হ'য়ে সভায় সভায় তাঁর সঙ্গী হয়েছি, বৈঠকে-আসরে তাঁর গান শুনেছি, গল্প শুনেছি। স্বাধীনতার আগে ও পরে তাঁর প্রতিবেশীও ছিলাম কয়েক বছর। একদার মুখর কবি ও সঙ্গীত-শিল্পীকে পাশে বসে দেখেছি, মূক-স্তব্ধ-ক্লান্ত এক বিমর্ষ নায়ককে। আমাদের কাছে নজরুল চিরকালই ঐক্যের প্রতীক। অনৈক্যের বেদনায় তিনি আজ নির্বাক।

১৯৩৮ সালের এক সঙ্গীতমুখর সান্ধ্য বৈঠকের কথা। 'অগ্নিবীণা'র কবি নজরুল তখন হরি ঘোষ স্ট্রীটের অধিবাসী। আমি তাঁর প্রতিবেশী। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর এক মাসিক সাহিত্যপত্রের কার্যালয়ে নজরুল একের পর এক গান গেয়ে চলেছেন—গজল, ভাটিয়ালি, স্বদেশী ও শ্যামাসঙ্গীত। আমরা সব নির্বাক বিমুগ্ধ শ্রোতা, সেই প্রাণমাতানো মুক্তকণ্ঠ আজ স্তব্ধ।

তারও পনেরো-ষোল বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র, উদ্বেলিত তরুণ সমাজ, কবি নজরুলের 'ধূমকেতু'র আকস্মিক আবির্ভাবে আমরা চমকিত। এক পয়সার সেই সাপ্তাহিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এক আশীর্বাণীতে আহ্বান জানিয়েছেন বিদ্রোহী কবিকে। তাতে কবিগুরু লিখেছেন—

'অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা
জাগিয়ে দে রে ধমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন।'

দেশের সেই মূক অর্ধ-চেতন মানুষদের জাগিয়ে দেবার জন্য কবি নজরুল কত্রা কি না করেছেন! নিজের সমস্ত চেতনাকে বিলিয়ে দিয়েই কি তিনি আজ লুপ্ত চেতনা? সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বাধীনতার জন্য নজরুল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সমাজের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে, সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। যা বিশ্বাস করতেন স্পষ্ট ভাষায় তা প্রকাশ করতে কখনও তিনি বিন্দুমাত্র

কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বিদ্রোহী কবি তাঁর সেই অকুণ্ঠ বিশ্বাসের কথাই প্রকাশ করেছেন 'ধূমকেতু'র একটি প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, 'বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ যদি করতে পারো, প্রলয় যদি আনতে পারো, তবে নিদ্রিত শিব জাগবে—কল্যাণ আসবেই'।

এমনি ভাষায় যাঁর লেখনী কথা বলে ইংরেজ শাসনে তাঁর পক্ষে কতোদিন আর বাইরে থাকা সম্ভব ? 'ধূমকেতু'র প্রথম শারদীয় সংখ্যার একটি কবিতার সত্য ভাষণে ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ যেন নড়ে উঠলো ? দশভুজা দুর্গার বন্দনায় কবি প্রশ্ন তুললেন—

'আর কতকাল রইবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গকে আজ জয় করেছে
অত্যাচারীর শক্তি-চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক,
বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা
আসবি কখন সর্বনাশী ?'

এই বিদ্রোহের আহ্বানে প্রমাদ গুনলো ইংরেজ সরকার। 'ধূমকেতু'র সমস্ত শারদীয় সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হলো। কবি নজরুল গ্রেপ্তার হলেন।

পরের বছর ৮ই জানুয়ারী ব্যাংকশাল কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী নজরুল উদাত্ত কণ্ঠে যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, সর্বদেশের সর্বকালের রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে তেমন নজীর খুব বেশী নেই। জবানবন্দীর এক স্থানে তিনি বলেছিলেন, '—আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমি জানি এবং দেখেছি আজ এই আসামীর পিছনে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক, সত্য-বিচারক হতে পারেন না। এমনি বিচার প্রহসন করে যেদিন খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পিছনে এসে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পান নি, তাঁর আর ভগবানের মধ্যে সম্রাট দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্রাটের ভয়ে বিচারকের বিবেক, দৃষ্টি অবাক হয়ে গেছলো।'

সেই জবানবন্দীরই আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'আমার বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হয় না। কেননা আমি আর এক বাঁশী নিয়ে বা তৈরী করে তাতে সেই সুর ফুঁ দিতে পারি। সুর আমার বাঁশীতে নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশীর সৃষ্টির কৌশলে।...দোষ আমারও নয়—দোষ তাঁর, যিনি আমার কণ্ঠে বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মতো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই।'

সেই 'মহাবিদ্রোহী'ই আজ এমন 'রণক্লান্ত' যে, তাঁর মুখে আর কোনো ভাষা নেই। অথচ তিনিই বলেছিলেন—

'আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে, রণিবে না—।'

আজও তো অত্যাচার অবিচারের অবসান ঘটে নি, আজও নজরুলের সাধের বাঙলার উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে কবি তো আর গর্জে ওঠে না, বাঙলার এ দুর্দিনেও কী করে তিনি এমন শান্ত সমাহিত ? এক এক সময় মনে হয়, এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। কবি হয়তো তাঁর ভগবানের কাছে এ প্রার্থনাই করেছিলেন, বিদীর্ণ বাংলা, বিভক্ত বাঙালীর বেদনাবোধকে যেন কখনো তাঁকে অনুভব করতে না হয়। তাঁর সেই প্রার্থনা আমরা শুনতে পাই নি, বুঝতে পারি নি—তাঁর স্বপ্নের ঐক্যবদ্ধ সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের বাঙলাকে আমরা খণ্ডিত করেছি, তাঁর সাধনার সমাধি ঘটিয়েছি। তাইতো কবি আজ বিস্ময়-স্তব্ধ।

দুই বাঙলার ঐক্যের প্রতীক হিসাবে বিদ্রোহী কবি নজরুল শুধুমাত্র দেহ ধারণ করেই আমাদের মধ্যে আজও বর্তমান। ওপার বাঙলায় স্বাধীন বাঙলাদেশের পতাকা উড়ছে পাকিস্তানী নির্যাতনকে উপেক্ষা করে। বাউল নজরুল বাঙালীর স্বাধীনতায় তৃপ্ত হবেন, হয়তো আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবেন। নজরুলকে আমরা সেভাবেই দেখেছি—বাউল নজরুল :

শান্ত সৌম্য কোন বিবাগী
কোন সে বাউল কি তাঁর নাম,
বীণায় যাহার আগুন জ্বলে
সে ধূমকেতু কি পূর্ণকাম ?

কাব্যে গানে সুরের দোলায়
তুফান বয়ে আনলো যে,
তাঁর কথা এই বাঙলা দেশে
কেমন করে ভুলবে কে ?
আজ যুঝি যে মুক্ত হাওয়ায়,
তাতেই কি তাঁর একটু দান ?
কবি শুধু কবিই তো নন,
স্রষ্টা মানুষ পুরুষ প্রাণ।

পূর্ববাংলায় নজরুল

হাসান মুরশিদ

দীর্ঘ সাতশো বছরের মুসলিম শাসনকালে ভারতবর্ষীয় সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনের অথবা প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের যে পরিবর্তন সাধিত হয় নি, ইংরেজ রাজত্বের অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে তার সূচনা লক্ষ্য করা সম্ভব। রামমোহন, ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত এবং বিদ্যাসাগরেই শুধু পরিবর্তিত মূল্য-বোধের প্রতিফলন ঘটে নি, গোঁড়াদের প্রতিভূ রাধাকান্ত দেবের মধ্যেও পরিবর্তনের স্বাক্ষর অভ্রান্ত। নতুন যুগে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করার পথ হলো বিদ্যা এবং বিত্ত। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে হিন্দুদের একটা বড়ো অংশ সেই বিদ্যা ও বিত্ত লাভ করে নতুন একটি অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলেন এবং সাধারণ উচ্চবর্ণ হিন্দুরা ও অন্যান্যদের পথ ধরে একটি মধ্যবিত্ত সমাজ নির্মাণ করেন। অপর পক্ষে তৎকালীন বাঙালি মুসলমানরা প্রথমত ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতাবশত এবং পরে সুযোগসুবিধার অভাবে নতুন যুগের প্রতি-যোগিতায় অনেকখানি পিছিয়ে পড়েন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিয়মানুসারে অতঃপর হিন্দুদের অগ্রগতি ও মুসলমানদের পশ্চাদ্‌গতি সমানুপাতিকভাগে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছে হিন্দু-মুসলমানের এই বৈষম্য এতো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যে, স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানরা এক বিপুল হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং বিদ্বিষ্ট হয়েছেন হিন্দুদের প্রতি। তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ, তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন আপনাদের নির্মোকে এবং সান্ত্বনা খুঁজেছেন আপনাদের তথাকথিত গৌরবোজ্জ্বল অতীতের স্মৃতির মধ্যে, দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেছেন আরব-ইরানের মরুভূমির দিকে। এই হীনমন্যতার অপর পিঠে লক্ষ্য করা যায়, হিন্দুদের সুপিরিঅরিটি কমপ্লেক্স। কিন্তু হিন্দুরাও আবার ইংরেজদের তুলনায় হীনমন্যতায় ভুগতেন। তাই সেই পথে রেনেসাঁর নাম নিয়ে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে বোধের জন্ম হয়, তা আসলে অতীতের পুনরুজ্জীবন এবং ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা। সেই কারণে রাজনারায়ণ বসুর মতো লিবারেল মানুষও 'বৃদ্ধ হিন্দু'র হয়ে যে স্বপ্ন দেখেন, তা মুসলমানবর্জিত প্রাচীন ভারতের। দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্র, বালগঙ্গাধর তিলক সকলেই ব্রাহ্মণ্য গৌরবের পুনরুজ্জীবন কামনা করেছেন। এমন কি, ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেও

যে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করি, সেখানে মুসলমানদের স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ, যদি আদৌ থাকে। হিন্দু মেলা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং কংগ্রেস গুরুতে সংক্ষেপে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান ছিলো। এই ভাবধারার উল্টোকোটিতে আবার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতীফ, আমীর আলী, ইসমাইল হোসেন সিরাজীদের দেখতে পাই। এঁদের ক্ষোভ ছিলো প্রথমে ইংরেজ ও পরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে। ইংরেজরা যখন কৌশলে এঁদের কিছু অন্যায় সুযোগসুবিধা দান করে আপনাদের দলে টেনে নেন, তখন বিদ্বেষটা পুরোপুরি গিয়ে পড়লো হিন্দুদের ওপর। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যজাত হীনমন্যতার ফলে যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা জন্ম নেয়, তা-ই মুসলিম লীগের উদ্ভব কিংবা বঙ্গভঙ্গকে অনিবার্য করে তুলেছিলো। সে সময়ে বাস্তবিকভাবে ধর্মভিত্তিক একটি জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়েছিলো, যদিও তার গোড়ায় ছিলো হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই বৈষম্যের অবসানে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা-বোধের কী দশা হবে, সেটা তখনকার নেতারা সম্ভবত ভেবে দেখেন নি।

কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তারা দাবি করেছিলেন যে, জাতীয়তার প্রধান শর্ত ধর্ম এবং ধর্মের ভিন্নতা জাতীয়তার পার্থক্য ঘটাতে বাধ্য। এই দাবির ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো এবং জন্ম হয়েছিলো পাকিস্তান নামক একটি কিম্ভূত রাষ্ট্রের। কিম্ভূত, কেননা, দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানে তার দুটি অংশ অবস্থিত, দুটি অংশের ভাষা আলাদা, আলাদা পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি-রুজি, খাদ্যপানীয়—সংক্ষেপে সংস্কৃতি। ধর্মের ঐক্য ব্যতীত পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের কার্যত কোনো সাদৃশ্য নেই। ইংরেজ আমলের হিন্দু-মুসলিম বৈষম্যের মুখে, দৃঢ়তর কোনো বন্ধনের অভাবে, এই সাম্প্রদায়িক বোধই তাৎক্ষণিক একটি জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করেছিলো এবং দুটি বিসদৃশ জাতি একটি পতাকার নীচে সমবেত হয়েছিলো। ফ্রান্স যেমন আলজেরিয়াকে অথবা পর্তুগাল যেমন গোয়াকে আপন দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে দাবি করেছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেও তেমনি একটি অস্থায়ী যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

কিন্তু স্বাধীনতার পরে বর্ধিত অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা লাভ করে এবং হিন্দুদের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পেয়ে, পূর্ববাংলার মুসলমানদের হিন্দুবিদ্বেষ ক্রমশ দূরীভূত হয়েছে। অপর পক্ষে, তাঁরা দেখলেন প্রতি পদে তাঁরা পশ্চিমী মুসলমানদের কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার নয়, রীতিমতো শোষণের সম্মুখীন হচ্ছেন। এই সর্বাত্মক শোষণের মুখে অতঃপর বাঙালি মুসলমানরা বুঝলেন ইসলামের নামে

যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, তা সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে পারে না। এবং এই ধর্মীয় মোহভঙ্গের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি তাঁরা কোনো প্রকার মৈত্রী বোধ করার পরিবর্তে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এমনি করে পূর্ব বাংলা থেকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে দূরীভূত হতে থাকে।

অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে একদিন বাঙালিরা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার গভীর যোগসূত্র সম্পর্কে সচেতন হবেন এ প্রায় অনিবার্য ছিলো। কেননা, সে যোগ বহু শতাব্দীর, সে যোগ ভাষার, সাহিত্যের, পোশাকপরিচ্ছদের, শিক্ষাদীক্ষার, রুচিপ্রকৃতির—এক কথায় মনের এবং সংস্কৃতির। অমিল কেবল ধর্মীয় আচারের। মতানৈক্য এবং পরিণামে একটা সংঘর্ষ ঘটাতে সে অমিলটুকু সময়বিশেষে হয়তো যথেষ্ট হতে পারে; কিন্তু আধুনিক যুগে জীবনযুদ্ধে মানুষ যখন একান্ত বিপর্যস্ত, ধর্মের প্রকোপ তখন প্রতিদিন ক্ষীয়মাণ। বর্তমান সমাজে বরং অর্থ নৈতিক সাম্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে সুনিশ্চিত করে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের এ হেন যোগসূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তাদের মূলধন ও প্রচারের বিষয় হলো পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় ঐক্য এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ধর্মীয় অসঙ্গতি। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই এই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখতে পাই সরকারি কার্যকলাপে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে।

এই নীতি অনুসারে একদিকে সরকারি মনোযোগ নিবদ্ধ হলো বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি। রোমান হরফের প্রবর্তনের প্রস্তাব করে, আরবি-ফারসি শব্দের আমদানি করে হিন্দু বাংলাকে সবুজীকরণের চেষ্টা করে এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দান করে সরকার বাংলা ভাষাকে প্রথমে অস্বীকার ও পরে ধ্বংস করতে চাইলেন। অপর পক্ষে, সাংস্কৃতিক জীবনে অব্যাহতভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচারকে এবং ভারতের সঙ্গে ধর্মীয় অনৈক্যকে প্রভূত গুরুত্ব দান করে তাঁরা চাইলেন পাকিস্তানের উভয়াংশের দুর্বল আত্মীয়তাকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী করতে। প্রকৃত পক্ষে, এই পরিবেশে, সাম্প্রদায়িক প্রচার সাহিত্যকে অকটোপাশের মতো চারিদিক থেকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। সরকারি নিয়ন্ত্রণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে পঠনপাঠন আরম্ভ হয় সরকারি সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি হলো তার গাইডলাইন। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য, যে-সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো, পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পরে তা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও প্রবলরূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরাও হীনমন্যতাবশত

আপনাদের তথাকথিত গৌরবোজ্জ্বল অতীতে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর দৈন্যকে ঢাকতে চেয়েছেন আপনাদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি নাম বাদ দিয়ে তাঁরা বরং বারংবার আলাওল, গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, দৌলত কাজী প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করেছেন। এবং এঁদেরকে বড়ো করে দেখতে চেয়েছেন। সরকার এই প্রবণতাকে আপনার প্রচারকার্যে ব্যবহার করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন। সরকারি দালালরা তাই চাইলেন বাংলা সাহিত্য থেকে ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী সকল হিন্দু নামকে সুপরিকল্পিতভাবে মুছে ফেলতে। ধর্মের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নামকে চাপা দেওয়ার জন্যে তাঁরা নজরুলকে নতুন স্বরূপে উপস্থাপিত করলেন। বঙ্কিমের স্থান নিলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁরা আশা করেছিলেন ধর্মের আফিম মিশিয়ে নজরুল অথবা মশাররফ হোসেনকে পরিবেশন করতে পারলে ইসলামী রাষ্ট্রে তাঁরা জনপ্রিয় না হয়ে পারেন না। সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের মাপকাঠি হিসাবে এঁরা খাড়া করলেন ধর্মকে। সুতরাং নজরুলের যে পরিচয় পূর্ববঙ্গে বিধৃত হলো, তা যতটা সমন্বয়ধর্মী কবি হিসেবে, তার চেয়ে ঢের বেশি ইসলামের ধ্বজাধারীরূপে। কিন্তু তা নজরুলের প্রকৃত পরিচয় নয়। অতএব বলা যেতে পারে, এক খণ্ডিত, বিকৃত ও সংস্কৃত নজরুল পূর্ব বাংলায় প্রচারিত।

যে কবির একমাত্র পরিচয় ছিলো বিদ্রোহী বলে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। সক্রিয় জীবনের শেষ এক যুগে তাঁর পরিচয় প্রধানত গীতরচয়িতা হিসেবে। তখন তাঁর প্রতিভা একান্তভাবেই ক্ষয়িষ্ণু। রবীন্দ্রমুক্তির যে পথ তিনি প্রদর্শন করেছিলেন অথবা মানবিকতার যে বলিষ্ঠ বাণী তিনি উচ্চারণ করেছিলেন—কবির সে যৌবনের ঋতু ১৯৩০-এর পূর্বেই সমাপ্ত হয়। সেই সঙ্গে তাঁর প্রোজ্জ্বল খ্যাতির শিখাও সম্ভবত ম্লান হতে থাকে। ১৯৪০-এর পর তাঁর পাঠক সংখ্যা কি নিতান্ত নগণ্য ছিলো না? বোধ হয় প্রাপ্যের চেয়েও ন্যূন সম্মান তিনি পেয়েছেন পঞ্চম দশকে। তারপর ষষ্ঠ দশকে পূর্ববঙ্গে নজরুল চর্চা সহসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এমন কি, হয়তো প্রাপ্যের চেয়ে বেশি। কিন্তু এবার নজরুল যেরূপে চিত্রিত হলেন সে তাঁর আপন স্বরূপ নয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে নজরুলের ঋণ নানাখাতে। নজরুলের ভাষা, কবিতার ছন্দ, গানের আঙ্গিক এবং সুর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। বিদ্রোহমূলক কবিতার বক্তব্যের বলিষ্ঠতার জন্যে এ প্রভাব হয়তো আপাতদৃষ্টিতে

চোখে পড়ে না; কিন্তু প্রেমের কবিতা ও গানে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নজরুলও, শেষ পর্যন্ত, সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন অগ্রজের এই ঋণকে। পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক কারণে যেহেতু দেখানো আবশ্যক হলো যে, রবীন্দ্রনাথ ছোটো, সেহেতু তাঁর বিকল্প হিসেবেই যেন নজরুলকে—নজরুলের ইসলামী অংশটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো করে দেখাতে হলো। এমন কি তুলনা করে দেখানো হলো, রবীন্দ্রনাথ ধনীর দুলাল বলে, বড়ো কবি হতে পেরেছেন (যেন বড়ো কবি হওয়ার ঐ একটিমাত্র শর্ত), আর নজরুলের সময় কেটেছে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেই। (গ্রামোফোন কোম্পানীতে চাকুরিকালে নজরুলের নেপালী দারোয়ান আর গাড়ি কি একটা বিশেষ কালে তাঁর প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাক্ষ্য নয়?—তখন কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ রচিত হয় নি।) সাংস্কৃতিক দালালরা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ অতো দিন বেঁচেছিলেন বলেই অতো এবং অতো ভালো লিখতে পেরেছিলেন আর অল্প বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিলো বলেই নজরুল রবীন্দ্রনাথের মতো অথবা তাঁর চেয়ে বড়ো হতে পারলেন না। (নজরুল অসুস্থ হন ৪৩ বছর বয়সে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ ৩০ বছর বয়সের আগে লেখা।) দালালদের মতে নজরুল নোবেল প্রাইজ পান নি, তার কারণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। (যেন ইংরেজরা নোবেল প্রাইজ দিয়ে থাকেন।) আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইংরেজঘেঁষা।

এই সমস্ত প্রচার নানাভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের অন্তরে দৃঢ়মূল করবার জন্যে সরকারের সকল প্রচারযন্ত্র অবিরাম প্রযত্ন করেছে। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে এই মিথ্যাগুলো শিশুদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। (ওখানে টেক্সট্-বুক কমিটির সম্পাদিত একটি মাত্র গ্রন্থই সব ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হয়।) এ সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথ কার্যত অনুপস্থিত। কোনো হিন্দু নাম নেই, সে কথা ঠিক নয়, হয়তো হরগোবিন্দ পোদ্দারের 'কায়েদে আজম' নামক একটি কবিতা আছে; হয়তো অমূল্যরতন কর্মকারের 'ঈদের চাঁদ' বলে অন্য একটি কবিতা আছে। কিন্তু মাইকেল, সত্যেন দত্ত, জীবনানন্দ, মোহিতলাল, সুধীন্দ্রনাথ সযত্নে বর্জিত, পাছে ওঁদের প্রাপ্য সম্মান পাঠকরা স্বীকার করে বসেন। টেক্সটবুক কমিটি ছাড়া সরকারী বেতার ও টেলিভিশন, বাংলা অ্যাকাডেমি, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, নজরুল অ্যাকাডেমি, ইসলামিক অ্যাকাডেমি, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পাকিস্তান কাউনসিল, এডুকেশন বোর্ড প্রভৃতি সকল সংস্থাই অনুরূপ প্রচারের ন্যূনাধিক অংশীদার হয়েছেন। সহজেই অনুমেয়, এ জাতীয় পরিবেশে, নজরুলের যে পরিচয় ও-বাংলায় স্পষ্ট তা নিতান্তই বিকৃত ও খণ্ডিত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে পাকিস্তানের শাসকবর্গের আচরণ বিরোধীতামূলক পূর্বেই সে কথা বলা হয়েছে। অথচ নজরুলের নামে ঢাকা ও করাচিতে দুটি অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হঠাৎ এই বাঙালি কবিকে এতখানি সম্মান দান অকারণ অথবা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। শাসকবর্গ একটি মুসলিম নামকে গৌরবোজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথ নামক একটি অত্যুজ্জ্বল নামকে মুছে ফেলার জন্যে। নজরুল অ্যাকাডেমির কার্যকলাপ বিশ্লেষিত হলেও দেখা যাবে প্রচার ছাড়া অন্য কোনো মহদুদ্দেশ্য এর নেই। নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড আর নজরুল সম্পর্কিত গ্রন্থাদি প্রকাশ করেছেন বাংলা অ্যাকাডেমি। নজরুল সম্পর্কে গবেষণাও পরিচালিত হচ্ছে বাংলা অ্যাকাডেমির দায়িত্বে। অতএব নজরুল অ্যাকাডেমির হাতে থাকলো এক প্রচারের কাজ। একই ধরনের প্রচারকার্যের ভার অর্পিত ছিলো সরকারি বেতার ও টেলিভিশনের ওপর। বারবার যে নজরুল গীতিগুলো প্রচারিত হয়েছে এ সংস্থা দুটির মাধ্যমে, নজরুল আড়াই হাজারের বেশি গান লিখলেও তার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। ইসলামী ও দেশপ্রেমমূলক কয়েকটি গান ছাড়া অন্যান্য গান অপাংক্তেয় ছিলো এ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের কাছে। এমন কি এ গানগুলোর বেলায়ও খোদার ওপর খোদকারি করা হয়েছে—গানের ভাষা ও সুরে খুশিমতন পরিবর্তন করা হয়েছে।

বস্তুত উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত নজরুলের একটি ক্ষুদ্র অংশই উপস্থাপিত করেছেন সরকারি দালালরা, প্রধান অংশই বর্জিত হয়েছে। কয়েকটি বিখ্যাত বিদ্রোহমূলক কবিতা ব্যতীত, যে কবিতা ও গানগুলি কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পেয়েছে, ইসলামিভাব সেগুলোর সামান্য লক্ষণ। যে কবিতায় হিন্দুপুরাণের উল্লেখ আছে সরাসরি সেগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। এমন কি, যে শব্দগুলো প্রধানত হিন্দু সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলোর বিকল্প শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতা ও গানে। 'জয়গানে ভগবানে তুষি বর মাগো রে' এ পঙ্‌ক্তি পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো ভিন্নরূপে—'জয়গানে রহমানে তুষি বর মাগো রে।' অথবা 'সজীব করিব মহাশ্মশান'-এর সংস্কৃত রূপ হলো 'সজীব করিব গোরস্তান'। কিন্তু 'ভগবান বুকে এঁকে দিব পদচিহ্ন'—পরিবর্তিত হয়ে 'রহমান বুকে এঁকে দিব পদচিহ্ন' হয়নি। বলা বাহুল্য, এরূপ বিকৃত ও সংস্কৃত নজরুল কখনোই তাঁর যথার্থ সম্মান লাভ করতে পারেন না। এমন কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহৃত বলে নজরুল সম্বন্ধে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়াও ওখানকার বিদগ্ধজনের মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য। যে

আপাতত উচ্চ আসনে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত, কালের উজান স্রোত বইতে শুরু করলে, অসম্ভব নয়, তা হয়তো বিধ্বস্ত হবে। সেটা কবির পক্ষে যেমন দুর্ভাগ্যের কারণ হবে, তেমনি দুর্ভাগ্যের কারণ হবে পাঠকের কাছে। কিন্তু মিথ্যা দিয়ে রচিত হলে, প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব বাংলায় এই প্রতিক্রিয়া, মনে হয় ইতিমধ্যে সূচিত হয়েছে।

বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে নজরুল কাফের ফতোয়া লাভ করেছিলেন কট্টর মুসলিম সমাজের কাছ থেকে। অথচ সেই সমাজের প্রতিভূ আক্রাম খাঁরা ষষ্ঠ দশকে সরকারি নীতি অনুসারে নজরুলকে স্বীকার করলেন ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী হিসেবে। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থে সুফী জুলফিকার হায়দার এই মিথ্যাকে ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি কবিজীবনের শেষ দিকের আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁর দারিদ্র্য এবং তাঁর প্রতি অবহেলার করুণ কাহিনী যেমন মর্মস্পর্শীরূপে বিবৃত করেছেন, সেই সঙ্গে অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন। নজরুল আপন গৃহে 'আল্লাহ' অথবা 'পানি'র পরিবর্তে 'ভগবান' অথবা 'জল' বলতেন; তাঁর বাড়িতে নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক হতো কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে; তাঁর স্ত্রী নামে ও কাজে হিন্দু ছিলেন; তাঁর পুত্রদের খাৎনা হয় নি; তাঁর পুত্ররা কালীবাড়ির সামনে দিয়ে যাবার কালে দেবীকে যুক্তকরে প্রণাম করতেন; নজরুল শাস্ত্রানুসারে যোগসাধনা করতেন; তিনি নামে মুসলমান ও কার্যত হিন্দু ছিলেন প্রভৃতি তথ্য নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়ের সঙ্গে অপরিহার্যরূপে যুক্ত নয়, তথাপি লেখক সযত্নে সেগুলো পরিবেশন করেছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, পাকিস্তানি অপপ্রচারে বিরক্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে একজন 'ধর্মপ্রাণ' মুসলিম সাহিত্যিক তাঁর জন্য তথ্যগুলো উদঘাটিত করে নজরুলকে তাঁর আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অপপ্রচারের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই প্রয়াসে লক্ষ্যযোগ্য।

সরাসরি এরূপ কিঞ্চিৎ স্থূলতার পরিচয় না দিয়েও, ও-বাংলার কয়েকজন সাহিত্যিক নজরুলের যথার্থ মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন বিশেষত সপ্তম দশকে—যখন থেকে পূর্ব বাংলার সমাজে অসাম্প্রদায়িক একটি মুক্তবুদ্ধির জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উৎসাহও এই পর্যায়েই প্রকাশ পেয়েছে। মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন এই সাহিত্যিকগণ লক্ষ্য করেছিলেন শাসকবর্গের হাতে পড়ে নজরুল ব্যবহৃত হচ্ছেন সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার হিসেবে। তাঁর সাহিত্যের প্রকৃত চরিত্র বিশ্লেষণ করে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, নজরুল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং জাতীয়তাবাদী

যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদ হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত জাতীয়তাবাদ। এ জন্যে ১৯০৫ সাল থেকে মুসলিম লীগ সক্রিয় থাকলেও নজরুল সযত্নে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন এ প্রতিষ্ঠান থেকে। ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরও নজরুল প্রায় আড়াই বছর একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সক্রিয় জীবনযাপন করেছেন, কিন্তু পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি তাঁর সমর্থন কখনো প্রকাশ পায় নি। মনোজীবনে তিনি ছিলেন একান্তভাবেই অসাম্প্রদায়িক। এমন কি, ধর্মীয় কবিতা ও গানের অজস্রতা তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক সত্তাকে বিকৃত ও বিলুপ্ত করে না। কিন্তু পূর্ব বাংলার "সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাতে পড়ে নজরুল ইসলাম ধর্মের বাহক এবং সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের অন্যতম প্রতিনিধি! · · সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এই নজরুল সাহিত্য-চর্চা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং তা সর্বতোভাবে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত।"

আহমদ শরীফ বহু প্রবন্ধে নজরুল সাহিত্যের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন। নজরুলের ধর্মীয় চেতনা, বিদ্রোহ ও জাতীয়তাবাদের যথার্থ বৈশিষ্ট্য তাঁর আলোচনার বিষয়। "নজরুলের সত্যিকার চিত্র জনসাধারণ ও সংস্কৃতিকর্মীদের সামনে উপস্থিত করাই" ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।

বদরুদ্দীন উমর ও আহমদ শরীফের মতো আরো কয়েকজন প্রাবন্ধিক নজরুল বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী পত্র-পত্রিকায় স্তুতির পরিবর্তে নজরুল বিশ্লেষণের এই মুক্তবুদ্ধির স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত 'নজরুল ইসলাম' গ্রন্থখানি। কয়েকজন সাহিত্যিকের নজরুল সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন এই প্রথম সম্মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। আহমদ শরীফ, আলী আনোয়ার, আনিসুজ্জামান, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, গোলাম মুরশিদ প্রমুখ প্রাবন্ধিকের রচনায় নজরুলের সীমাবদ্ধতা এবং ঔদার্য উভয়ই বিস্তৃতভাবে প্রকাশ পেলো এই গ্রন্থে।

আহমদ শরীফ নজরুলের বিদ্রোহের সত্যিকার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখান নজরুলের বিদ্রোহ প্রকৃত অর্থে সাম্যবাদী বিদ্রোহ নয়, নিপীড়িত মানুষের জন্যে সহানুভূতি ও দরদ তাঁর এ-জাতীয় কবিতার মূলধন। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের নয়, বরং ধর্মীয় আদর্শে এক শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য।

আলী আনোয়ারের আলোচনার বিষয় ছিল নজরুলের প্রেম। তাঁর প্রেম ও বিদ্রোহ যে একই তীব্র অনুভূতির এপিঠ-ওপিঠ এবং তাঁর প্রেম যে নানা মানুষী দুর্বলতার দ্বারা অভিভূত লেখক তা-ই নিপুণভাবে বিশ্লেষণ ও বিচার করেছেন।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম নজরুলের সমন্বয়ধর্মী মনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। ধর্মীয় চেতনা তথা নজরুলের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চেতনায় হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্য যে আশ্চর্যজনকভাবে সংশ্লেষিত, বর্তমান প্রাবন্ধিক অনেকগুলো সুন্দর দৃষ্টান্তের সাহায্যে সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গোলাম মুরশিদের দীর্ঘ প্রবন্ধের নাম 'নজরুলজীবন ও সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রভাব'। সাংস্কৃতিক দালালরা পূর্ব বাংলায় নজরুলকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা থেকে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, পূর্বসূরীদের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কাছে নজরুলের কোন ঋণ নেই। মহাশূন্য থেকে পদার্থ ও দীপ্তি নিয়ে যেন তিনি অকস্মাৎ বাংলা সাহিত্যগগনে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের আবাল্য অপরিসীম ভক্তি এবং তাঁর রচনার প্রতি অশেষ আগ্রহ ও শ্রদ্ধা, নজরুলের মনের যে ভিত্তি রচনা করেছিলো তা একান্তভাবেই রবীন্দ্র-প্রভাবিত। ১৯২২ সালের পর থেকে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে রচিত বিদ্রোহমূলক কবিতায় যদিচ রবীন্দ্রকণ্ঠ অনুচ্চ, তথাপি তাঁর প্রেমের কবিতা ও গানে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রপ্রভাব সুস্পষ্ট। তাৎক্ষণিক বিদ্রোহের কাল অপগত হওয়ার পরই নজরুল যেন স্বেচ্ছায় রবিকিরণে আচ্ছন্ন হয়েছেন। এই নিষ্প্রভতা তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র, এমন কি গদ্য রচনায় লক্ষ্য করা সম্ভব। স্বকীয়তা খুঁজে পাবার আগে প্রথম দিকের গানের সুরে পর্যন্ত রবীন্দ্র ঋণ প্রত্যক্ষ।

নজরুলকে মূলধন করে যে পাপচক্র রচিত হয়েছিলো ধীরে ধীরে তা ভেঙে যাচ্ছে দেখে স্বভাবতই নজরুল ব্যবসায়ী এবং শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হলেন। 'নজরুল অ্যাকাডেমি পত্রিকা'য় প্রতিবাদের তীব্র ঝড় উঠলো এই গ্রন্থ ও প্রাবন্ধিকদের নিয়ে। কিন্তু তবু সত্যকে চিরদিন আচ্ছন্ন করে রাখবে প্রোপাগাণ্ডার জাল দিয়ে এমন সাধ্য কার! তাই নজরুলকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ঠেকিয়ে রাখার সংঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা ব্যর্থ হলো। বাস্তবিক পক্ষে, সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্মানের আসন লাভ করলেন, নজরুলও তাঁর প্রকৃত মূল্য লাভ করলেন। সে মূল্য সাম্প্রদায়িকতার মোহমাখা নয়।

বিতর্ক ও পাল্টা আক্রমণ শুধু নয়, নজরুলকে নিয়ে ও-বাংলায় অনেকগুলো গবেষণামূলক ও গঠনমূলক কাজ হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

নজরুলের যাবতীয় রচনা একত্রিত করে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। প্রস্তাবিত চার খণ্ডের মধ্যে এযাবৎ তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। নজরুলের সকল রচনার একটি তালিকা প্রণয়ন করে এবং এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে রফিকুল ইসলাম 'নজরুল নির্দেশিকা' প্রকাশ করেছেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন প্রণয়ন করেছেন একটি নজরুল-কনকরডেনস (আংশিক)। ফিরোজা বেগমের সম্পাদনায় নজরুলের সকল গানের স্বরলিপি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন বাংলা অ্যাকাডেমি। এ পর্যন্ত তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক গবেষক নজরুলের ওপর গবেষণা করছেন বাংলা অ্যাকাডেমির প.রিচালনায়।

সুতরাং বলা যেতে পারে উচ্ছ্বাস ও প্রচার ব্যতীত নজরুলসাহিত্য ও সঙ্গীতকে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে তার একটি স্থায়ী আসন নির্মাণ ও তাঁর সম্পর্কে মোহমুক্ত একটি মূল্যায়নের প্রয়াস, বিলম্ব হলেও নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু করেছেন ও-বাংলার মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা। সাধারণ শিক্ষিতরা যাঁরা একদিন নজরুলকে বড়ো করে দেখতে ভালোবাসতেন, তাঁদেরও চিন্তার বিবর্তন ঘটেছে।

নজরুলকাব্যের স্বরূপ ও আধুনিকতা

সুশীলকুমার গুপ্ত

কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ আসনের অধিকারী। তিনি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক রচনায় স্থান বিশেষে কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখলেও কাব্যের ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভা সবচেয়ে বেশি স্ফূর্তি লাভ করেছে। জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে বিংশ শতাব্দীর বাঙলা কাব্যের জগতে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। আধুনিক জটিল মানসিকতার যুগে রচিত জটিল কাব্যের সঙ্গে পরিচিত কোন কোন উন্নাসিক ব্যক্তি হয়তো কাব্যের সরল লোকপ্রিয়তাকে তার দুর্বলতা ব'লে মন্তব্য করতে পারেন, কিন্তু সাধারণের হৃদয়গ্রাহ্য হওয়া যে কাব্যের একটা মহৎ গুণ, এ কথা অস্বীকার করা যায় কি? কবিত্বশক্তিতে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হ'য়েও নজরুল যে সবচেয়ে লোকবল্লভ কবি হ'তে সক্ষম হয়েছেন এটাই তাঁর একটা বড় কৃতিত্ব ব'লে অবশ্যই বিবেচিত হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাসূর্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে আরোহণ ক'রে বিশ্বব্যাপী আলোর প্লাবন এনেছিল, তখন অনেক কবিই নিশ্চিন্তে সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক এই দারুণ সংকটের মুহূর্তে ধূমকেতুর মূর্তিতে নজরুলের আবির্ভাব বাঙলা কাব্যে নূতন স্বর ও সুর যোজনা করলে। রবীন্দ্রপ্রভাবকে বহুলাংশে স্বীকার ক'রেও তাঁর কাব্যে এক নূতন যুগের নিশ্চিত পদধ্বনি শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ উত্তরাধিকারকে সাগ্রহে গ্রহণ ক'রেও তিনি তা থেকে স্বাতন্ত্র্য খুঁজতে প্রয়াসী হলেন। বস্তুত রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রথম দিকে তিনিই সবচেয়ে সক্ষম কবিকর্মী। তাঁর অনমনীয় বিদ্রোহ পরবর্তী কবিদের অনেককেই নিজেদের কাব্যজগৎ গ'ড়ে তুলতে প্রেরণা যুগিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, কাব্যরীতির চেয়ে কাব্যভাবনার ক্ষেত্রেই নজরুলের স্বকীয়তা বেশি পরিস্ফুট হয়েছে এবং এই দিক দিয়েই তাঁর প্রভাব পরবর্তীদের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়।

নজরুল-কাব্যে তিনটি সুস্পষ্ট ধারার অস্তিত্ব লক্ষণীয়। তাঁর 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'জিঞ্জির',

'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলিতে দেশপ্রেম, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর বিদ্রোহী মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে তাঁর প্রেমভাবনা রূপ লাভ করেছে। 'চিত্তনামা' ও 'মরু-ভাস্কর' জীবনীমূলক গ্রন্থ। এগুলি ছাড়া নজরুল 'কাব্য আমপারা', 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' ও 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম' নামে তিনটি অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর শিশু কবিতার সংখ্যাও কম নয়।* উপর্যুক্ত ভাবধারাগুলির মধ্যে বিদ্রোহীভাবেই নজরুলের বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, শুধু ধ্বংসের জন্যেই তাঁর বিদ্রোহ নয়, সৃষ্টির জন্যেই তাঁর বিদ্রোহ এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ধ্বংস করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি ব্যক্তিগত পত্রে নজরুল লিখেছেন: "নূতন ক'রে গড়তে চাই বলেই ত ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নূতন ক'রে গড়ার আশাতেই ত যত শীঘ্র পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি।" (নজরুল-পত্রাবলী। কলিকাতা, ১৯৭০। পৃঃ ৬১)। প্রবল অহমিকা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধই তাঁকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে। এই বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রলালিত দার্শনিক আনন্দানুভূতি, অতীন্দ্রিয় প্রেমবোধ, ঈশ্বর-সর্বস্বতা প্রভৃতির বিরোধিতায়। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ নজরুলের পূর্বগামী হ'লেও জীবনের দুঃখকষ্টের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবানুভূতির গুণে তাঁর বিদ্রোহ অনেক বেশি ব্যাপক, প্রদীপ্ত ও অব্যর্থ।

বাঙলা কাব্যে নবযুগের প্রকৃত সূচনা হল নজরুলের 'অগ্নি-বীণা' [প্রথম প্রকাশ—কার্তিক ১৩২৯ সাল (১৯২২)] কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। এই গ্রন্থের বিখ্যাত কবিতাগুলি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা। 'অগ্নি-বীণায়' যে ঝংকার শোনা গেল তা স্তব্ধ হ'ল তখন যখন নজরুলের কণ্ঠ ব্যাধির জন্যে নির্বাক হ'য়ে গেল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে। অনেক কবির তুলনায় তাঁর এই বাইশ বছরের প্রকৃত কাব্যজীবন সীমিত হ'লেও প্রাণোচ্ছলতা, পৌরুষ ও ব্যাপ্তিতে তা সত্যই অপূর্বসুন্দর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত কালের পটভূমিকায় নজরুলকাব্য প্রসারিত। এই সময়কার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা, সংকট ও আন্দোলন তাঁর কাব্যে সার্থক রূপ লাভ করেছে।

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা'র উপর রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র লক্ষণীয় প্রভাব থাকলেও প্রচণ্ড অহমিকা, দুর্দান্ত পৌরুষ, সমাজচেতনা, বাস্তব

নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্তে এর বৈশিষ্ট্য অবশ্যস্বীকার্য। বাঙলা কাব্যে সত্যকার পালাবদলের ঘণ্টা বাজল তখনই যখন বলিষ্ঠ দ্বিধাহীন ও আবেগোন্মত্ত কণ্ঠে শোনা গেল :

"বল বীর—
বল উন্নত মম শির,
শির নেহারি' আমারি নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর !"

(বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা)

কিংবা

"পঞ্জর মম খর্পরে জ্বলে নিদারুণ যেই বৈশ্বানর
শোন্ রে মর, শোন্ অমর !—
সে যে তোদের ঐ বিশ্বপিতার চিতা।
এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে, হে সৃষ্টি জান কি তা ?
কি বল ? কি বল ? ফের বল ভাই আমি শয়তান-মিতা !
হো হো ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালায়েছি বুকে চিতা।"

(ধূমকেতু : অগ্নি-বীণা)

এই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উদ্দীপ্ত, আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন, ধ্রুববিদ্রোহী ও সৃষ্টির জন্তে ধ্বংসকারী মানুষের ঘোষণা। এই সময় দেবতার জায়গায় মানবতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব'লে নজরুল ব'লে উঠেছেন :

" 'নাই দানব
নাই অসুর—
চাই নে সুর;—
চাই মানব !'—

বরাভয়-বাণী ঐ রে কা'র
শুনি, নহে হৈ হৈ এবার!"

(আগমনী : অগ্নি-বীণা)

প্রবল মানবতাবোধের জন্যে নজরুল বহুল পরিমাণে শোষিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত জনসমাজের দুঃখবেদনা অনুভব করতে সমর্থ হয়েছেন। কোনো সুদৃঢ় আস্তিক্যবোধে তিনি মানবের দুর্দশা, অন্যায় ও লাঞ্ছনার অবসান ঘটাবার আগ্রহে ভগবানের কাছে আবেদন করেই নিজের কর্তব্য শেষ করেন নি, তিনি নিজের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে বিদ্রোহীর বেশে নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবানের কাছে তিনি মুক্তিযুদ্ধের জন্যে শক্তি কামনা করেছেন। বিদ্রোহের এই অপরূপ বলিষ্ঠতা নজরুলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি :

"তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিব ভোগ,
এই পৃথিবীর নাড়ী সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ।
তাজা ফুলে ফলে অঞ্জলি পুরে
বেড়ায় ধরণী প্রতি ঘরে ঘুরে,
কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান ?
আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ—
এতদিনে ভগবান!"

(ফরিয়াদ : সর্বহারা)

কিংবা

"বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান
তোমার ধরার দুঃখ কেন
আমায় নিত্য কাঁদায় হেন ?
বিশৃঙ্খল সৃষ্টি তোমার, তাই তো কাঁদে আমার প্রাণ!
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান।"

(চিরবিদ্রোহী : শেষ সওগাত)

যেখানেই অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার, সেইখানেই নজরুলের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ কখনও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রেমানুভূতিতে, আবার কখনও বিরাট বিশ্বের পটভূমিকায় সমগ্র মানবজাতির বিষয়ে এক অসামান্য আত্মীয়তা-

বোধের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর স্বদেশ তথা বিশ্বপ্রেমমূলক কাব্য নিপীড়িত জনসমাজের মুক্তিযুদ্ধের এক শক্তিশালী অস্ত্র হবার মর্যাদা লাভ করেছে। নজরুল এক পত্রে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার সম্পর্কে বলেছেন: "আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে,—যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা-সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।" (নজরুল-পত্রাবলী। কলিকাতা, ১৩৭০। পৃঃ ৫১)।

নজরুলের বিদ্রোহের এক বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাম্যবাদী চিন্তায়। তাঁর সাম্যবাদের বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলাই ঠিক। বস্তুত নজরুলের সাম্যবাদ তাঁর হৃদয়লব্ধ বস্তু। এই সাম্যবাদের মূলে আছে এক সুস্থ সবল ও উজ্জ্বল মানবপ্রেম। তিনি সর্বপ্রকার কৃত্রিম ভেদাভেদ, অসঙ্গতি ও কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়ে জগতে সাম্যপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে গড়ে না উঠলেও তাঁর সাম্যবাদে যে সমাজচেতনতা, সংস্কারমুক্তিবাসনা ও অভেদদৃষ্টি আছে তা সত্যই বিস্ময়কর। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর সাম্যবাদে নাস্তিকতা অনুপস্থিত। কুসংস্কারাবদ্ধ ও বৈষম্যজর্জর মানবসমাজের মধ্যে আন্তরিকভাবে ব্যথিত হ'য়ে তিনি ঘোষণা করেছেন:

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি"

[সাম্যবাদী (মানুষ): সর্বহারা]

নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব থাকলেও তা বাস্তববোধ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অপেক্ষাকৃত অনেক তীক্ষ্ণ, তীব্র ও উজ্জ্বল।

মানবিক প্রেমের ক্ষেত্রে নজরুলের উপর গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং বিশেষ ক'রে মোহিতলালের প্রভাব অনুভূত হয়। তাঁর প্রেম দেহকেন্দ্রিক হ'লেও তা দেহাতীতের ক্রন্দনে মুখর। তাঁর দেহাত্মক প্রেমের মধ্যে যে ভোগাকাঙ্ক্ষা, স্পর্শব্যাকুলতা ও রসমদিরতা পাওয়া যায় তার বিচিত্রতা অনস্বীকার্য এবং এই দিক দিয়েই তিনি 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' গোষ্ঠীর একাংশকে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর প্রেমে বৈষ্ণবকাব্য এবং বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাবে ইন্দ্রিয়াতীতের কামনা থাকলেও সাধারণভাবে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রাকৃত ও অপাররূপ।

নজরুলের বিদ্রোহের মূলে মানবিক প্রেমকেও উপলব্ধি করা যায়। প্রেমকে পাওয়ার জন্যেই তাঁর প্রবল বিদ্রোহ জেগে ওঠে। কবিরাণী তাঁর প্রেমের অমৃত-রূপময়ী মানসী। তাঁর সংস্পর্শেই কবির কবিসত্তার উন্মোচন ঘটে, তাঁর বাঁশিতে সুর সংযোজিত হয় এবং তাঁর বাণী তো কবিরাণীরই জয়মাল্য। তাঁর আবেগময় অথচ নিশ্চিত কণ্ঠে শোনা যায়:

"আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমার মাঝে আসি'
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি,
আমার পূজার যা আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি।
আমার বাণী জয়মাল্য, রাণি! তোমার সবি॥
তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি॥"

(কবি-রাণী: দোলন-চাঁপা)

প্রেমের বিচিত্র রূপের মধ্যে অশ্রুকোমল রূপই কবিকে বেশি আকর্ষণ করেছে। তাই প্রেমিকার অশ্রু দেখে তাকে উদ্দেশ্য ক'রে বিদ্রোহী কবি দ্বিধাহীন চিত্তে ব'লে উঠেছেন:

"ওগো জীবন-দেবী।
আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল,
আজ বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল!
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে,
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পূরে
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে।"

(বিজয়িনী: ছায়ানট)

নজরুলের কবিসত্তা মূলত বিদ্রোহী ও প্রেমিক হলেও অনেক সময় তাঁর সৃষ্টিতে নানা বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ ঘটেছে। এই জন্যে অনেকে তাঁর কাব্যে শৈথিল্য ও অসংলগ্নতা প্রত্যক্ষ ক'রে বিরূপ মন্তব্য ক'রে থাকেন। নজরুল অবশ্য স্বীকার করেছেন: "দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই

যুবে," কিংবা "কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কি বুঝি তার কিছু?" (আমার কৈফিয়ৎ : সর্বহারা)। কিন্তু সৃষ্টির জগতে কোনো প্রতিভাই যা খুশি তাই করতে পারে না। সেই জন্তে তাঁর আপাতবৈপরীত্যপূর্ণ আচরণের মধ্যে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঐক্য থাকতে বাধ্য। নজরুলের জীবনের মতোই তাঁর কাব্য বিচিত্র। তিনি কখনও ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, আবার কখনও শয়তান-মিতা হ'য়ে ভগবানের ধ্বংস ঘটাতে চেয়েছেন। তিনি একই সঙ্গে বৈষ্ণবকীর্তন, শাক্তসংগীত ও ইসলামগীতি লিখতে পেরেছেন। তিনি নিজেকে চিরবিদ্রোহী ব'লে ঘোষণা ক'রেও আবার কবে শান্ত হবেন তা স্পষ্টকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব যে, নজরুলের মধ্যে এই সব আপাতবৈপরীত্য একটি পরম ঐক্য লাভ করেছে এবং এই ঐক্যের মূলে রয়েছে লীলাবাদের বিষয়ে তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস। এই লীলাবাদ একদিক দিয়ে কিন্তু তাঁর পক্ষে মারাত্মক হয়েছে। এর সাহায্যে তিনি অজস্র বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'লেও এতে তিনি এতই মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছেন যে, তাঁর সৃষ্টির বহিরঙ্গ নির্মাণে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাযথভাবে যত্নবান হ'তে পারেন নি। তাই নজরুলের কাব্যদেহরচনায় মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক ত্রুটি চোখে পড়ে।

বাঙলা কাব্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতার ভিতর দিয়ে নূতন দিগন্ত উন্মোচনের ব্যাপারে নজরুল অন্যতম নেতার ভূমিকা গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর যা ঋণ তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করতে তিনি কখনো দ্বিধা করেন নি। 'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অশীতিবার্ষিকী জন্মোৎসবে 'অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি' শীর্ষক যে কবিতাটি তিনি রচনা করেন তার এক জায়গায় তিনি তাঁর বিদ্রোহের মর্মস্থলে 'অশান্ত রোদন'কে স্বীকার ক'রে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তার প্রেরণার উৎস বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর উক্তি :

> "দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ
> অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি।
> একা তুমি জানিতে, হে কবি মহাঋষি,
> তোমারি বিদ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু!"

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদেই যে নজরুলের কবিজীবনের রূপান্তর ঘটেছে এ কথাও তিনি স্পষ্টকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন :

> "অগ্নি-গিরি গিরি-মল্লিকার ফুলে ফুলে
> ছেয়ে গেছে! জুড়ায়েছে সব দাহ জ্বালা!

আমার হাতের সেই খর তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি !
...   .
অভিনন্দনের মদ চন্দনিত মধু
হইয়াছে, হে সুন্দর, তব আশীর্বাদে !"

'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ (সাপ্তাহিক আত্মশক্তি, ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৭)-এও নজরুল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা থেকে বিশ্বকবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতে হয়। নজরুল লিখেছেন :

"বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা ক'রে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে ; যেমন ক'রে ভক্ত তার ইষ্টদেবকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে।....

দূরে গিয়ে বসলে সস্নেহে কাছে ডেকে বসিয়েছেন। মনে হয়েছে, আমার পূজা সার্থক হল, আমি বর পেয়ে গেলাম।"

নজরুলের কাব্য পাঠ করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি স্বভাবকবি ব'লে তাঁর কাব্যে প্রজ্ঞার চেয়ে আবেগের স্থান বেশি। এই জন্যে তাঁর কাব্য অনেক জায়গায় পৌনঃপুনিকতায় আক্রান্ত হয়েছে, কখনো আবার তা সরল ও স্থূল আবেদনের সৃষ্টি করেছে। বহুলাংশে তিনি হৃদয়-নির্ভর ব'লেই তাঁর কাব্যে ত্রুটির পরিমাণ এতো বেশি। আবার তাঁর কাব্যের অব্যর্থ আবেদনের মূলেও রয়েছে এই হৃদয়নির্ভরতাজনিত অফুরন্ত প্রাণোচ্ছলতা। প্রাণধর্মের প্রাবল্যে কোথাও কোথাও তাঁর কাব্যে বিষয়বস্তু ও প্রকরণে শৃঙ্খলা না মানলেও সমগ্রভাবে তাতে উদ্দীপ্ত ও চমৎকৃত না হ'য়ে উপায় নেই। তাঁর কাব্য কোনো কোনো জায়গায় আলোর চেয়ে বেশি তাপ বিকিরণ করলেও তাঁর প্রবল আন্তরিকতা আমাদের দুর্বারভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর কাব্যের পৌরুষ ও সংগ্রামশীলতাই তাঁকে অসাধারণ জনপ্রিয় ক'রে তুলেছে। তিনি যখন বলেন, "রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা / তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,/ বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে !/ অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে !" তখন মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কবিচরিত্র বিদ্যুৎরেখায় ফুটে ওঠে এবং তিনি পাঠককে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলেন।

নজরুল কাব্যের মূল্যায়নে তার আধুনিকতা সম্পর্কে প্রায়ই প্রশ্ন তোলা হয়।

এই আধুনিকতা বিচার করবার আগে 'আধুনিক' কথাটিকে একটু স্পষ্ট ক'রে নেওয়া দরকার। প্রত্যেক যুগেরই আধুনিকতা স্বতন্ত্র। আসল কথা হচ্ছে মানুষের স্থায়িভাবগুলি প্রত্যেক যুগেরই কাব্যসৃষ্টির মুখ্য উপাদান। কিন্তু প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব কতকগুলি সঞ্চারীভাব থাকে। যুগের এই সঞ্চারীভাবগুলি যখন স্থায়িভাবকে গাঢ় ও উজ্জ্বল ক'রে কাব্যসৃষ্টিতে সমর্থ হয়, তখনই তা আধুনিক হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কবিতাকে শুধু যুগেরই সামগ্রী হ'লে হয় না, যুগকে অতিক্রম ক'রে চিরকালের রসলোকে তার উত্তরণ ঘটা চাই। শুধু সাময়িকতার প্রয়োজন মেটানোই বড় কথা নয়, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে স্থায়িত্ব। এই আধুনিকতা কবিমানসের যথার্থ লক্ষণ হওয়া দরকার এবং তা কবির সৃষ্টির অঙ্গ হ'য়ে না দাঁড়ালে নয়। F. R. Leavis লিখেছেন: "All that we can fairly ask of the poet is that he shall show himself to have been fully alive in our time. The evidence will be in the very texture of his poetry." (F. R. Leavis, *New Bearings in English Poetry*; new edition, reprinted. London, 1954. p. 24)। যুগভাবের মধ্যে রাজনীতিকতাবই কবিকে সাধারণের কাছে সহজে পরিচিত ক'রে তোলে। কিন্তু এই লোকপ্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রে কবিকে যুগের মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে রাখতে চায়। কবির কাব্য তখন যুগের চাহিদা মিটিয়েই নিঃশেষ হ'য়ে যায়, যুগকে উত্তীর্ণ হওয়ার স্পর্ধা তার আর থাকে না।

আধুনিকতার যে আলোচনা করা হল তা থেকে এ কথা অবশ্যই স্পষ্ট হবে যে, নজরুল নিঃসন্দেহে আধুনিক কবি। তাঁর কাব্য প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনানৈরাশ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছে। তদানীন্তন রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর কাব্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সে যুগের উজ্জ্বল ও অন্তরঙ্গ ভাষ্য হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় —অতিরিক্ত যুগচেতনতা তাঁকে যে পরিমাণে সাময়িকতাকে আশ্রয় ক'রে লোকপ্রিয় কবিতা রচনায় উৎসাহ দিয়েছে, সেই পরিমাণে যুগকে অতিক্রম ক'রে যুগোত্তীর্ণ কাব্যসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে নি। সময়ই যে কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক এ কথা নজরুল জানতেন। একটি পত্রে তিনি লিখেছেন: "বাংলা সাহিত্যে আমার স্থান সম্বন্ধে আমি কোনদিন চিন্তা করি নি। এর জন্ম লোভ নেই আমার। সময়ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমালোচক। যদি উপযুক্ত হই, একটা ছালা-টালা পাব হয়ত।" (নজরুল-পত্রাবলী। কলিকাতা, ১৯৭০। পৃঃ ২১)।

রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে যে আধুনিক কবিতার সূত্রপাত তার ধারা এখনও পর্যন্ত কমবেশি প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। যে দুটি দিক দিয়ে নজরুল আধুনিক কালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সে দুটি হল রাজনীতিক চেতনা ও প্রেম-ভাবনা। তাঁর কাব্যের স্থায়িভাব রতি বা প্রেম। এই প্রেমই কখনো রাজনীতিক চেতনায় মানবপ্রেমের রূপ পরিগ্রহ ক'রে সর্বহারা, অত্যাচারিত ও শোষিত জনসমাজের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে তার মুক্তির জন্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, আবার কখনও তা নরনারীর হৃদয়সম্পর্কের চিরন্তন রহস্য উদ্ঘাটন ও রস সম্ভোগে উন্মুখ। কখনো তিনি প্রবল ও প্রদীপ্ত বিদ্রোহে ঘোষণা করেছেন :

'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।

মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত !"

(বিদ্রোহী : অগ্নিবীণা)

কোনো সময় দেহাত্মক প্রেমের নিবিড় কামনায় তাঁকে বলতে শোনা যায় :

"প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাকো তুমি,
চিনেছি তোমায়
যাহারে বাসিব ভালো—সে-ই তুমি,
ধরা দেবে তায় !
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম—
সে শরাব-লোহু।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায় !"

(অ-নামিকা : সিন্ধু-হিন্দোল)

দেহাত্মক প্রেমের ক্ষেত্রে নজরুল কোনো বিশেষ নূতনত্ব দেখাতে পারেন নি। দেহগত প্রেমের বিচিত্র বর্ণরাগ ও লীলায় তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ হ'লেও আজিকের দৈত্তে অনেক ক্ষেত্রেই তা কালোত্তীর্ণ হবার গুণবঞ্চিত। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নজরুলের প্রেমের মধ্যে যে বিষণ্ণতা, নৈরাশ্য ও কাতরতা ছিল তা 'কল্লোল'যুগের বিশিষ্ট কবিমণ্ডলীর মানসিকতায় সশ্রদ্ধতার সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। এটা কম গৌরবের কথা নয়।

দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় নজরুলের প্রচণ্ড বিদ্রোহ একদিন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর অনেক কবিতাই, যেমন 'বিদ্রোহী', 'প্রলয়োল্লাস', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'বন্দীবন্দনা', 'শিকলপরার গান', 'ভাঙার গান', 'জাগরণী', 'সাম্যবাদী', 'ছাত্রদলের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরের গান', 'জাগরতূর্য', 'শ্রমিক মজুর', 'অগ্রপথিক', 'চল্ চল্ চল্' প্রভৃতি সেই সময় জাতির মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার হ'য়ে উঠেছিল। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরেও তাঁর অনেক কবিতারই আবেদন কমে যায় নি। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীনের ভারত আক্রমণের সময় তাঁর বহ্নিদীপ্ত অনেক কবিতাকেই জাতি জড়ত্ব ও শৈথিল্য ঘুচিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বোধিত হবার জন্যে স্মরণ করেছে। বস্তুত যতদিন একের উপর অপরের শোষণ, অত্যাচার ও আক্রমণ থাকবে ততদিন নজরুলের অগ্নিক্ষরা, জ্বালাময় ও বিদ্রোহব্যঞ্জক কবিতার আবেদন ব্যর্থ হবার নয়।

বর্তমানে বাঙলাদেশে জঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মুক্তিকামী মানুষের যে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে তাতেও নজরুলের সাহিত্য প্রেরণা যোগাচ্ছে সন্দেহ নেই। নজরুল বাঙলা দেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাঁর কাব্য থেকে জাতি নূতন ভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করছে।

বাঙলা সাহিত্যে স্বাদেশিক কবিতা ও গানের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারাতেই নজরুল তাঁর বিখ্যাত স্বদেশাত্মক কবিতা ও গান রচনা করেছেন। এই ধারার মধ্যে বিশেষ ক'রে মনে পড়ে রামনিধি গুপ্তের 'নানান দেশে নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা'; অতুলপ্রসাদ সেনের 'আমরি বাংলা ভাষা মোদের গরব মোদের আশা'; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম্, সুজলাং সুফলাং, মলয়জ শীতলাম্ শস্যশ্যামলাং মাতরম্'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' ও 'বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে ভগবান'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গ আমার, জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ' ও 'ধন-ধান্যপুষ্পে

ভরা আমাদের এ বসুন্ধরা'; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল?'; জীবনানন্দ দাশের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে যাই না আর' প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি বাঙলা দেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই ধারারই উপস্থিতি রয়েছে নজরুলের স্বদেশমূলক কবিতা ও গানে। এই প্রসঙ্গে আমি নজরুলের দুটি গান, যা কাব্য হিসাবেও অনবদ্য, তাদের উল্লেখ করতে চাই। নজরুলের দেশভক্তির অনুপম প্রকাশ ঘটেছে 'বন-গীতি' সংগীতগ্রন্থের ১৬ সংখ্যক গানে। এর প্রথম স্তবকঃ

"নমঃ নমঃ নমো বাঙলা দেশ মম
চির-মনোরম চির-মধুর।
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর॥"

বাঙলা মায়ের অপূর্বসুন্দর রূপটি প্রেমের আশ্চর্য আন্তরিকতায় ফুটে উঠেছে নজরুলের 'সুর-সাকী' সংগীতগ্রন্থের ৬৭ সংখ্যক গানেও। এর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি:

"আমার শ্যামলা বরণ বাঙলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয় রে আয়।
গিরি-দরী-বনে-মাঠে-প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মাকে
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ্ বাজায়॥"

এই প্রসঙ্গে 'গুলবাগিচা' সংগীতগ্রন্থের ৭৩ সংখ্যক গানটি 'আমার দেশের মাটি/ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি' স্মরণ করা যেতে পারে।

নজরুল অনুভব করেছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের* মধ্যে পরিপূর্ণ মৈত্রী ছাড়া বাংলা তথা ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি তাঁর বহু কবিতা ও গানে এই মৈত্রীর উপর জোর দিয়েছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন: "আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী; তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।" (নজরুল-পত্রাবলী। পৃঃ ৬৪)। হিন্দু-মুসলমানের

মৈত্রীবিষয়ক গানের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে 'সুর-সাকী' সংগীতগ্রন্থের 'হিন্দু মুসলমান দুটি ভাই ভারতের দুই আঁখিতারা' ও 'মোরা একবৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মোসলমান'। এই প্রসঙ্গে 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের 'হিন্দু-মুস্লিম যুদ্ধ' কবিতা, 'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থের 'মন্দির ও মস্জিদ' ও 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধ দুটি স্মরণীয়।

নজরুল তাঁর 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রবন্ধগ্রন্থের 'স্বাগত' প্রবন্ধে বাঙলা দেশ সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা বর্তমান যুদ্ধদীর্ণ বাঙলা দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না কি ? তিনি লিখেছিলেন : "দেখেছ, কি ভীষণ ধূমকুণ্ডলী উঠেছে বাঙলার আকাশ-বাতাস ছেয়ে। বল ঋষি, "বাঙলার মাটি বাঙলার জল, বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে ভগবান।" এস ঋত্বিক, উচ্চারণ কর শবসাধনার মন্ত্র। এই শবের মাঝে শিব জাগাতে হবে। পারবে ?—তবে এস। এই নাও মড়া, এই ধর নর-কঙ্কাল—স্তূপে স্তূপে সাজানো। আর কি চাও ঋষি ? ঐ দেখ শৃগাল, ঐ দেখ কুকুর—ঐ দেখ শকুন—মড়ার পচা মাংস নিয়ে টানাটানি খাওয়া-খাওয়ি করছিল। জ্যান্ত মানুষের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল।"

নজরুল কখনো বাঙলার মৃত্যুহীনতা ও যৌবনশক্তিতে বিশ্বাস হারান নি। তাই তিনি তাঁর 'আমি সৈনিক' প্রবন্ধ (দুর্দিনের যাত্রী)-এ বলে উঠেছেন : "ওরে আমার ভারতের সেরা, আগুন খেলার সোনার বাঙলা ! কোথায় কোন্ অগ্নি-গিরির তলে তোর বুকের অগ্নি-সিন্ধু নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ল ? কোন্ অলস-করা করুণার দেবতার বাঁশীর সুরে সুরে তোর উত্তাল অগ্নি-তরঙ্গমালা স্তব্ধ নিথর হ'য়ে পড়ল ? কোথায় ভীমের জন্মদাতা পবন ? ফুঁ দাও, ফুঁ দাও এই নিবন্ত অগ্নি-সিন্ধুতে, আবার এর তরঙ্গে তরঙ্গে নিযুত নাগ-নাগিনীর নাগ-হিন্দোলা উলসিয়া উঠুক।"

'শেষ সওগাত' কাব্যগ্রন্থের 'আগ্নেয়গিরি বাংলার যৌবন' কবিতায় নজরুল বলেছেন যে, বাংলার যৌবন আগ্নেয়গিরির মতো ঘুমন্ত ব'লেই তাকে শোষিত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হ'তে হচ্ছে। কিন্তু তিনি জানেন বাঙলার এ অমর যৌবন আবার জেগে উঠে সমস্ত অত্যাচার, দাসত্ব ও লাঞ্ছনার অবসান ঘটাবে। তিনি দীপ্তস্বরে ঘোষণা করেছেন :

"কৈ রে কৈ রে স্বৈরাচারীরা বৈরী এ বাংলার ?
দৈত্য দেখেছ দুর্জ্জের, দেখনিক প্রবলের মার !

দেখেছ বাঙালী দাস, দেখনিক বাংলার যৌবন,
অগ্নিগিরির বক্ষে বেঁধেছ বক তব ভবন!
হের, হের, কুণ্ডলী-পাক খুলি আগ্নের অজগর
বিশাল জিহ্বা মেলিয়া নামিছে ক্রোধ নেত্র প্রখর।
....
ঊর্ধ্বে উঠেছে ক্রুদ্ধ হইয়া অদেখা আকাশ ঘেরি;
তোমাদের শিরে পড়িবে আগুন, নাই বেশী আর দেরী!
তোমাদের মন্ত্রের এই যত যন্ত্রণা-কারাগার,
এই যৌবনবহ্নি করিবে পুড়াইয়া ছারখার।"

নজরুলের এই স্বদেশপ্রেম ঐতিহ্যাশ্রয়ী হ'লেও তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জন্য তার মধ্যে যে আন্তরিকতা ও বাস্তবিকতা উপস্থিত তা বিশেষভাবে আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে।

নজরুলের আধুনিকতা বা যুগধর্মিতা যতটা ভাবের দিক দিয়ে ততটা আঙ্গিকের দিক দিয়ে নয়। আবেগনির্ভর স্বভাবকবি হওয়ার ফলে তাঁর কাব্য নব নব বৈচিত্র্য সৃষ্টি ক'রে পরিপক্কতার অভ্রান্ত লক্ষণ দেখাতে পারে নি। কবি হিসাবে পরিপক্কতা হচ্ছে তাঁর যুগানুযায়ী নূতন আবেগের অভিজ্ঞতাকে যৌবনসুলভ আবেগের তীব্রতা দিয়ে রূপায়িত করার ভিতর দিয়ে সমগ্র মানুষ হিসাবে পরিপক্ক হ'য়ে ওঠা। টি. এস. এলিয়টের ভাষায়: "....maturing as a poet means maturing as the whole man, experiencing new emotions appropriate to one's age, and with the same intensity as the emotions of youth." (*The Poetry of W. B. Yeats*, 1940)। নজরুলের স্বভাবকবিত্ব অনেক জায়গায় শেষ পর্যন্ত কোন পরিণতি পায় নি এবং সেই কারণে তাঁর অনেক কবিতাই যুগকে অতিক্রম করতে গিয়ে ব্যর্থতা বরণ করেছে। কিন্তু বিদ্রোহে ও দেহাত্মক প্রেমে যেখানে তিনি যুগের হ'য়েও যুগকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন সেখানে তিনি আধুনিক ও এখনকার কালেও আধুনিক এবং এইখানেই তাঁর কাব্যের প্রাণশক্তির সবচেয়ে বড় জয় ও সার্থকতা।

বাংলাদেশ ও নজরুল—নানা সূত্র

। বাঁধন সেনগুপ্ত

বর্তমানে প্রতিবেশী 'বাংলাদেশে'র অভ্যন্তরে যে মুক্তিযুদ্ধ চলেছে তার মূলে রয়েছে অসাম্প্রদায়িক মননের অপ্রতিরোধ্য জাতীয়তাবোধ এবং বাংলাভাষার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ। বস্তুত, সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জনগণের বিশেষ ক'রে যুব ও তরুণ সম্প্রদায়ের মুক্ত জাগ্রত মানসিকতাই এই নব জাগরণের জন্যে দায়ী। অবশ্য আজ আর কোন সন্দেহ নেই যে, দ্বি-জাতি তত্ত্ব বা 'থিওরি'র বাস্তবে ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক অসাম্য ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের বিলুপ্তি এই আন্দোলনকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু আমরা যদি অতীতের দিকে একটু দৃষ্টিকে ফেরাই তা'হলে বুঝতে পারবো যে, এই মানসিকতার মূলে প্রথম থেকেই কাজ করেছিলেন আশ্চর্য এক মানুষ যিনি এই শুভবোধের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, অর্থাৎ দুই বাংলার রাখী-বন্ধনের কারিগর স্বয়ং কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ শফিক—রফিক—জব্বার—বরকতের আত্মত্যাগের মধ্যেই যে এই আন্দোলনের প্রারম্ভিক সূচনা তাতে সন্দেহ নেই। বরং আজকের এই অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ প্রধানতঃ তারই অন্যতম ফলশ্রুতি। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে এই নবলব্ধ চেতনার বীজটি অঙ্কুরিত হয়েছিল বিংশ-শতকের গোড়ার দিকে। তৎকালীন রাজশক্তির প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের প্রয়াস ব্যর্থ হবার মূলেও প্রধানতঃ এই চেতনার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে অন্যতম একটি ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সর্বোপরি ঐতিহাসিক দিক থেকেও এর ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সাহিত্যগত ঐক্যের বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আবদ্ধ হয়েছিলেন তখন থেকেই। এবং বাংলাভাষাই ছিল সেই ঐক্যের মাধ্যম। তাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্য তখন থেকেই বাঙালী মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল অংশের কাছে সমাদৃত হতে থাকে। স্বভাবতঃই সাহিত্য-বিষয়ক চিন্তার মিলনে বাঁধা পড়েছিলেন সেদিনের প্রগতিবাদী বাঙালী মুসলমান সমাজ। তাঁদের উদ্যোগেই ১৯২৬ সালের উনিশে জানুয়ারি ঢাকায় একটি মুসলিম সাহিত্য সমাজ গড়ে ওঠে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ মুসলিম শিক্ষক ও ছাত্র মিলে সেটিকে

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং নজরুল ছিলেন সেই সাহিত্য সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও মনীষা।

ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রচনার প্রাচুর্যে নজরুল সে সময় তরুণ সম্প্রদায়ের মানসে পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে, বাঙালী মুসলমান সমাজ সেদিন ছিলেন তাঁরই আদর্শে উজ্জীবিত। তাই ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশনে নজরুল বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নজরুলও যথারীতি সে অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন ও দুটি গান গেয়েছিলেন। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯২৮ সালের মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশনটিও তিনিই উদ্বোধন করেছিলেন 'চল্ চল্ চল্ / উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি গেয়ে।

এই মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবুল হোসেন, আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন, মৌলভী আবদুর রশীদ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকেরই সাহিত্য প্রীতি ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও গভীর। ফলে উত্তরকালে এরা অনেকেই সাহিত্য সেবার মাধ্যমে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

নবগঠিত সেই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল, 'চিন্তা চর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাজ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন, পুরাতন সর্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগসাধন।' ফলে নজরুল সহজেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বহুবাঞ্ছিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সপক্ষে নজরুল সে সময় অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে লিখেছিলেন, "বাংলা-সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে ও বাদ দিলে বাংলাভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরাজী সাহিত্য হ'তে গ্রীক পুরানের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাঙলা-সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্যপ্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী..."।

আশ্চর্যই বটে! কেননা, কেবলমাত্র বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত সংস্কৃতি আজ গড়ে উঠেছে ওদেশে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় এই ইংগিত নজরুলের চোখে তখন থেকেই ধরা পড়েছিল।

সার্বিক গণচেতনার সম্মিলিত প্রয়াসের মিলনকেন্দ্র তাই ওপার বাংলা। ওই বাংলার সঙ্গে নজরুলের চিরকালই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্যে তিনি সেখানে গিয়েছেন, থেকেছেন এবং জনগণমানসের হৃদয় জয় করে এসেছেন। সেখানকার অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার তিনি সাক্ষী। কেননা, সে-সব ক্ষেত্রে তিনি কার্যতঃ অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ওই বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ ও মধুর।

সর্বপ্রথম মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে ১৯১৪ সালে আসানসোলের রুটির দোকান ছেড়ে প্রধানতঃ লেখাপড়া শেখার লোভেই নজরুল ময়মনসিংহ যান। ময়মনসিংহের দারোগা কাজী রফিজুল্লাহ্ নজরুলকে আসানসোল থেকে নিয়ে গিয়ে সেখানকার কাজীর সিমলা গ্রামে থাকা-খাওয়া ও পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে নজরুলকে দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল। দরিরামপুর স্কুলটি ছিল কাজীর সিমলা গ্রাম থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে। ফলে স্কুলে আসা-যাওয়া করতে নজরুলের খুবই কষ্ট হোতো। গড়ে দিনে দশ-বারো মাইল হেঁটে পড়াশুনা চালানো অসম্ভব ভেবে পনেরো বছরের বালক নজরুল বছরখানেক বাদেই পালিয়ে আসেন সেখান থেকে।

১৯২০ সালে নজরুলের করাচীস্থ ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী ব্যাটেলিয়ান ভেঙে যাওয়ায় নজরুলকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। থাকতেন মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে। বছরখানেক পরে কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ একদিন উধাও হলেন। সঙ্গী আলী আকবর খানের সঙ্গে গিয়ে পৌঁছোলেন কুমিল্লায়। পরে আলী আকবরের দেশে অর্থাৎ কুমিল্লার দৌলতপুরে। প্রথম কুমিল্লা কান্দীর পাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে উঠেছিলেন। যাই হোক দৌলতপুরে আলী আকবরের বিধবা বোনের কন্যা অর্থাৎ আলী আকবরের ভাগিনেয়ী নার্গিস বেগমের (সৈয়দা খাতুন) সঙ্গে নজরুল পরিচিত হন। সুন্দরী সেই কন্যা নার্গিসের সঙ্গে পরে নজরুলের বিবাহ স্থির হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে মনান্তরের ফলে বিবাহের রাত্রেই সেই বিবাহ বাসর ত্যাগ করে বরের বেশেই ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে কান্দীর পাড়ে হেঁটে চলে আসেন নজরুল। আলী আকবরের ছলচাতুরীই এর জন্যে দায়ী ছিল। অতঃপর মুজফ্‌ফর আহমেদ গিয়ে নিঃসম্বল নজরুলকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। কলকাতায় এসে সে সময় ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটের বাড়িতে থাকাকালীন অবস্থায় কবি জসীমউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

১৯২১ সালে ঐ ঘটনার পরে কয়েকমাস বাদে দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে নজরুল আবার কুমিল্লায় ইন্দ্রকুমারের বাড়িতে গিয়েছিলেন। যাবার আগে প্রায় তিন-চার শ' টাকার নতুন কাপড়-চোপড় কিনে নজরুল সেগুলো কান্দীর পাড়ে সেনগুপ্ত পরিবারে পাঠিয়েছিলেন। সেগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন ইন্দ্রকুমারের পুত্র শ্রীমান বীরেনের পরিচিত ষোলো-সতেরো বছরের একটি ছেলে। সেই ছেলেটি নজরুল-নার্গিস প্রস্তাবিত বিবাহ রাত্রে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ি পাহারা দিয়েছিল। কুমিল্লায় গিয়ে নজরুল অন্যান্য অনেকের মতো ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের স্ত্রী বিরজাসুন্দরী দেবীকে 'মা' বলে ডাকতেন। ফলে সে পরিবারে নজরুল সকলেরই অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় কুমিল্লায় শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন ও চিকিৎসক উমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রধানতঃ এঁদের ও কুমিল্লার তরুণ সম্প্রদায়ের অনুরোধে তিনি এই সময় 'ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও পুরবাসী' গানটি রচনা করেন এবং শ্রীশৈলেশ সেন (অধ্যাপক) ও উপরোক্ত ডাঃ চক্রবর্তীর সাথে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে নজরুল কুমিল্লার রাস্তায় রাস্তায় গানটি গেয়ে বেড়িয়েছিলেন। এই গানটি রচনার পেছনেও একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জের পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস্ সেই সময়ে এদেশে পরিভ্রমণে এসেছিলেন। জনসাধারণের মনে তখন ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনকে কেউ স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই গানটি তখন প্রতিবাদ স্বরূপ নজরুলকে দিয়ে লেখানো হয়। অবশ্য গাইবার সময় কড়া ব্রিটিশ আইনের গা বাঁচাবার জন্যে 'আসিছে তাদেরই রাজকুমার' শব্দগুলি বাদ দিতে উদ্যোক্তারা বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সময় এই গান শুনে কুমিল্লার আপামর জনসাধারণ দেশপ্রেমে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নজরুল পুনরায় কান্দীর পাড়ে গেলেন। সেনগুপ্ত পরিবারে এই সময় একটানা তিন-চার মাস কাটিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক রুশ-বিপ্লবকে উপলক্ষ্য করে এই সময়েই নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি লিখেছিলেন। ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন সেনগুপ্ত পরিবারে থাকাকালীন অবস্থায় ইন্দ্রকুমারের পরলোকগত ভ্রাতার একমাত্র কন্যা প্রমীলা (আশালতা) ওরফে দুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই প্রমীলাও নজরুল-নার্গিস প্রস্তাবিত বিবাহ বাসরে নজরুলের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। সে-সময় তাঁর বয়স ছিল তেরো-বৎসর। প্রমীলার পিতা ছিলেন রাজবাড়ির কর্মচারী। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ

মইফুয়ার 'কেওতা' গ্রাম নিবাসী প্রমীলার পিতা কার্যোপলক্ষে কান্দীর পাড়ে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। প্রমীলার পিতার ছিল দুই-স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী ঢাকায় এখনও বেঁচে আছেন। শেষ বয়সে গিরিবালা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। গিরিবালার প্রথম সন্তান প্রমীলার জন্মের পরই তিনি পরলোক গমন করেন। নজরুল সম্ভবতঃ এই অসহায় পরিবারের মধ্যে সব কিছু ভুলে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী পুষ্ট তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে একটি কবিতা প্রকাশের অভিযোগে নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। এ কবিতাটি প্রথমে আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন অন্যতম স্বত্বাধিকারী মৃণালকান্তি ঘোষের অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্য লেখা হয়েছিল। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত কবিতাটি নজরুল 'ধূমকেতু'তেই প্রকাশ করেন। যাই হোক, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়ানোর উদ্দেশ্যে নজরুল বিহারের সমস্তিপুর হয়ে কুমিল্লায় গিয়ে উপস্থিত হন। কুমিল্লায় যাবার আগে প্রখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (বা এম. এন. রায়) মুজফ্‌ফর আহমদের কাছে চিঠি লিখে নজরুলকে রাশিয়ায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নজরুল রাশিয়ায় যেতে রাজী হলেন না। এদিকে কুমিল্লায় পৌঁছেই পরদিন কুমিল্লা রেজেষ্ট্রী অফিসে গিয়েছিলেন ধূমকেতুর স্বত্ব হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিরজাসুন্দরীর নামে তা হস্তান্তর করার পরই তিনি সেইখানেই গ্রেপ্তার হন। সেখান থেকে তাঁকে বন্দী করে কড়া পুলিশ পাহারায় কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এবং ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী ইংরেজের তথাকথিত বিচারে এক বৎসরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সেই প্রথম এই দেশে একজন কবি কেবলমাত্র কবিতা লেখার অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

১৯২৩ সালের পনেরোই ডিসেম্বর নজরুল কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। কারাগারের নিয়মানুযায়ী তাঁর মেয়াদ থেকে একমাস ছাড় বা 'রেমিশন' হয়েছিল। যাই হোক, মুক্তির পর তিনি কুমিল্লায় কান্দীর পাড়ে চলে যান। কিন্তু এবার আর বেশীদিন সেখানে কাটালেন না। কেননা প্রমীলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে সেনগুপ্ত পরিবারে ক্রমশঃ অশান্তি বেড়ে উঠেছিল। অগত্যা নজরুল প্রমীলা ও গিরিবালা দেবীকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কুমিল্লা থেকে স্বয়ং বিরজাসুন্দরী দেবী কলকাতায় এঁদের ফিরিয়ে নিতে এসে ব্যর্থ হন।

মাস ছয়েক পরে ১৯২৪ সালে ৬ নং হাজী লেনে (বেনেপুকুর, কলিকাতা) জনাব মঈনুদ্দীন হোসেনের পৌরোহিত্যে নজরুল-প্রমীলার বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের পর নজরুল আর কুমিল্লার কান্দীর পাড়ে যাননি।

রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও প্রগতিশীল আন্দোলন উপলক্ষ্যে এর পর নজরুলকে বহুবার ওই বাংলায় যেতে হয়েছিল।

১৯২৪ সালের দোসরা জুন নজরুল পাবনায় গেলেন নিখিল বঙ্গ প্রাদেশিক (কংগ্রেস) সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে। মওলানা আক্রাম খাঁ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিরাজগঞ্জের সেই সভায় কাজীর সঙ্গী ছিলেন হুগলীর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। নজরুল ছিলেন প্রধান অতিথি। সভায় উদ্বোধনী সংগীতটি তিনিই পরিবেশন করেছিলেন। সিরাজগঞ্জে মোট দিন সাতেকের অবস্থানকালে তিনি থাকতেন আসাদুল্লা সিরাজীর বাড়িতে। সিরাজগঞ্জের সাধারণ মানুষ সেদিন এই বিদ্রোহী কবিকে পেয়ে গভীর অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভায় রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে নজরুল সঙ্গী প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ফরিদপুরে গিয়েছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। নজরুল ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি উদ্বোধন সঙ্গীতও নিজেই গেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল ফরিদপুর টাউন লাইব্রেরীর মাঠে। দিন পনেরো ফরিদপুরে থাকাকালীন অবস্থায় নজরুল অতিথি ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত কংগ্রেসী ব্যবহারজীবী দীনেশ সেনের বাড়িতে। বর্তমানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্র-পরিচালক শ্রীমৃনাল সেন তাঁরই পুত্র। এই সময় একবার কবি জসীমউদ্দীনের বাড়িতেও নজরুল গিয়েছিলেন। ফরিদপুরে নজরুল অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় তাঁকে নিয়ে ভীষণ মেতে উঠেছিলেন।

ফলে সেই বছরেই নজরুল আবার ফরিদপুরে গেলেন। সেটি ছিল ফরিদপুর ঈশান কলেজের মাঠে অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য সম্মেলন'। ছাত্ররাই ছিলেন এর উদ্যোক্তা। সাতদিন ছাত্রদের সঙ্গে পুরাপুরি মেতে ছিলেন। হাসি, গান আর আবৃত্তিতে মাতোয়ারা এই কয়টি দিন অতিথি ছিলেন মেধাবী ছাত্র হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে।

ফিরে এসেও আর একবার নজরুলকে বছর দুই বাদে ফরিদপুরে 'ছাত্র সম্মেলন' উপলক্ষ্যে যেতে হয়েছিল। প্রথমে দীনেশ সেন ও পরে লাল মিঞার বাড়িতে অতিথি হয়ে প্রায় এক মাস কাটিয়ে এসেছিলেন তিনি। আসলে,

ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় তাঁকে ছাড়তে চাইছিলেন না। সেবারেও একবার অলীদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কথা ছিল কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু নজরুল ফিরে এলেন কলকাতায়।

১৯২৭ সালে নজরুল ঢাকায় গেলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করার জন্যে। কাজী মোতাহার হোসেন কলকাতা থেকে তাঁকে নিয়ে যান। মুজফ্ফর আহমদকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি না যাওয়ায় নজরুল একাই ঢাকায় যান। ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে নজরুলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক হিসেবে। গেয়েছিলেন স্ব-রচিত "খোশ আমদেদ" (শুভাগমন) যার প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল,—

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী।
তালি-বন ঝুমরি বাজায়, গায় "মোবারক-বাদ" কোয়েলা।
শবেব রাত আজ উজালা গো, আঙিনায় জ্বলল দীপালী ॥
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি ॥
দখিনের হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতী ॥
উলসি' উপচে প'ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি ॥

এই গানটি মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিকী পত্রিকা "শিখা"র প্রথম বর্ষ প্রথম সংস্করণে (চৈত্র, ১৩৩৩, ইং ১৯২৭ পৃঃ ১) প্রকাশিত হয়। সেবার ঢাকায় দু'দিন থেকে নজরুল ফিরে আসেন। ঢাকায় থাকার সময়ে গণিতজ্ঞ কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন।

ঠিক তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯২৬ সালেও নজরুল একবার সেন্ট্রাল এসেম্বলীর মুসলিম সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী হিসেবে ঢাকায় গিয়েছিলেন। অবশ্য সেই নির্বাচনে নজরুল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এমন কি তাঁর জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়। আসলে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের থেকে পাওয়া কংগ্রেস তহবিলের বরাদ্দ মাত্র তিনশত টাকা সম্বল নিয়ে সেদিন ধনী মুসলমান জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটাই কেমন আশ্চর্য মনে হয়। নির্বাচনী প্রচারের বদলে তিনি তখন ঢাকায় গান গেয়ে গেয়ে বেড়িয়েছেন। এমন কি সর্দার জমীরুদ্দীনের (জমীরুদ্দীন খাঁর) বাড়িতে বসে নির্বাচনের আগের দিন গান গেয়ে কাটিয়েছেন নজরুল। ফলে যেমনটি হওয়া স্বাভাবিক নির্বাচনে ঠিক তেমনটি হয়েছিল।

১৯২৮ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশনেও নজরুল যোগদান করেছিলেন। 'বিবিধ কারণে তখন এই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ ছাড়া আগেই বলেছি যে, মুসলমান বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রগতিবাদী আন্দোলন সুরু হয়েছিল এই সমাজকে কেন্দ্র করেই। ফলে পুরোপুরি মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত এই সংগঠন মূলতঃ সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়া মুক্ত ছিল। তার প্রমাণ মেলে এর প্রথম সম্পাদক কাজী আবুল হোসেনের ভাষায় ঃ

"শ্রীমান আবদুল কাদের প্রমুখ আমাদের কতিপয় নবীন সাহিত্যপ্রাণ বন্ধু মিলে গত বৎসর ১৯শে জানুয়ারি শ্রদ্ধাস্পদ মৌঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের পৌরোহিত্যে এই সাহিত্য সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার ২১ দিন পরে এই শিশু সমাজের জাতক্রিয়ার পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন কুলীন ব্রাহ্মণ—আমাদের চুল পাকা, নবীন গল্পনিপুণ শ্রদ্ধেয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।"

এ ছাড়া এই সংগঠনের 'প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তা চর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাজ্ঞা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন, পুরাতন সর্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন' ছাড়াও এই সমাজ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। এই সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি বলেছিলেন, "কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরান ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবন থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়েই হিন্দু-মুসলমানের চেনা পরিচয় হবে। চেনা হলেই ভাব হবে।"

শুধু তাই নয় 'এই সমাজের সত্যিকার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী হিসেবে হিন্দু-মুসলিমের এক জাতীয়তার বাণী প্রচার করা, প্রাচীন ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে মুসলমানদের "মুক্ত" করে তাদের মধ্যে আধুনিক সমাজ এবং জ্ঞান চেতনা জাগ্রত করা, তাদের দৃষ্টি ধর্মবোধ-দ্বারা অনুপ্রাণিত সমাজ থেকে সরিয়ে এনে আধুনিক সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে নিবদ্ধ করা।' ফলে, নজরুলের

পক্ষে অতি সহজেই এদের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব ছিল। এই আগ্রহের ফলে দ্বিতীয়বারের অধিবেশনে এসে নজরুল সভাপতি মোতাহার হোসেনের গৃহে প্রায় আড়াই মাস অবস্থান করেছিলেন।

এই আড়াই মাসে নজরুলের জীবনে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমতঃ, অঙ্কে পারদর্শিনী ছাত্রী মিস্ ফজিলতুন্নেসার সঙ্গে তাঁর প্রেম জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এ ছাড়া, ঢাকায় রানু সোম (প্রতিভা বসু) ও উমা মৈত্রকে (নোটন, অধ্যাপক সুরেন মৈত্রের মেয়ে) পেয়েছিলেন ছাত্রী হিসেবে। ঢাকার যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তিনি যথেষ্ট সমাদর ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে ঢাকার বিখ্যাত হাকিম নওয়াব সলিমুল্লাহর খাস হাকিম, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং বাংলার প্রথম যুগের ইতিহাস গবেষক হাকিম হবিবুর রহমান খান আখুনজাদা তাঁর ছাদে বিরাট মজলিশের ব্যবস্থা করেছিলেন নজরুলকে নিয়ে। সেদিন বহু সঙ্গীতজ্ঞের উপস্থিতিতে নজরুল গজল ও ইসলামী গান গেয়েছিলেন।

এই সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রিকার কর্ণধার বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ হয়। এঁরা দু'জনেই ছিলেন নজরুলের ভক্ত। তখনকার স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, নজরুল ইস্লাম ঢাকায় এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর মাতিয়ে তুলেছেন। সেবার ঢাকায় খুব হৈ-চৈ করে কাটিয়ে এসে কলকাতায় ফিরলেন। ফিরে নতুন একটি মুখের দেখা পেলেন। নবজাত সে শিশুর নাম বুলবুল। নজরুলের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সন্তান এই বুলবুল জন্মাবার পর মাত্র বছর চারেক বাদে 'বসন্ত' রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটির পক্ষ থেকে কবিকে সম্বর্দ্ধনার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই সম্বর্দ্ধনা সভায় নজরুল যোগদান করেন এবং তাঁকে সম্মানসূচক মানপত্র দান করা হয়। সেই সময় হবিবুল্লাহ বাহার ও তাঁর বোন নাহার নজরুলের অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে পড়েন। এঁদের বাড়িতেই নজরুল উঠেছিলেন অতিথি হয়ে। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করেছিল। কর্ণফুলী বিষয়ক কবিতা ও 'চক্রবাক' সে সময়েরই ফসল। নাহার ও বাহারদের বাড়িটি ছিল সুপুরী গাছের সারি দিয়ে ঘেরা। কবি সে সব প্রাণ ভরে উপভোগ করেছিলেন। সে সময়ে লেখা 'চক্রবাক'-এর কবিতাগুলি নজরুলের প্রথম শ্রেণীর কাব্যরসান্বিত বলে আজও বিবেচিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সে-সব কবিতার

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। চট্টগ্রামে থাকার সময় 'সিন্ধু-হিন্দোলের' কবিতাগুলিও নজরুল প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। প্রাণরসে ভরপুর নজরুল সে-সময় তরুণ সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন তখন চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র। তাঁদের নিয়ে নোয়াখালি জেলার সন্দ্বীপে সেই সময় একদিন বেড়িয়ে এলেন। দেখে এলেন বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের একমাত্র কন্যাকে। পরবর্তীকালে আবদুল কাদিরের সঙ্গে সেই কন্যার বিবাহ হয়েছে।

দিনাজপুরেও কবি একবার গিয়েছিলেন একটি সভায় যোগদান করতে। অতিথি হিসেবে থেকেছিলেন জনাব হাবিবুর রহমানের বাড়িতে।

এরপর, রংপুরে এসে কবি কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। তখন রংপুরের তামাক নিয়ে অনেক সরস কবিতা ও গান তিনি লিখেছিলেন।

কুচবিহারেও ছাত্রদের 'মিলাদ' উপলক্ষ্যে গায়ক আব্বাসউদ্দীন আমন্ত্রণ করে নজরুলকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আব্বাসউদ্দীনের গান শুনে নজরুল তাঁকে কলকাতায় গান গাইতে আসার জন্যে পরামর্শ দেন। ছাত্ররা সে সময় নজরুলকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিল। কুচবিহার লোকসংগীতের দেশ। কুচবিহারের 'ভাওয়াইয়া' গান শুনে মুগ্ধ কবি পরবর্তীকালে অনুরূপ ঢঙে অনেক গান রচনা করেছিলেন।

১৯২৯ সালে কবি আবার চট্টগ্রামে আমন্ত্রিত হলেন 'চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করার জন্যে। চট্টগ্রামের মধুর স্মৃতি, পাহাড়ী সৌন্দর্য, শাম্পান বাওয়া ইত্যাদির লোভে সহজেই নজরুল চট্টগ্রামে যেতে রাজী হয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে সম্বর্দ্ধনার উত্তরে কবি বলেছিলেন; "আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছি—এবং আপনাদের মারফতে বাঙলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে— যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম ধর্ম বলে' ইসলাম বলে' চীৎকার করবেন না।"

১৯৩২ সালে নজরুল পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুব সম্মেলনে' যোগদান করতে গিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালের পর পাবনায় সেই তাঁর দ্বিতীয় পদার্পণ। ৫ই এবং ৬ই নভেম্বরের দু-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে নজরুল মুসলিম তরুণ সমাজকে আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবার আহ্বান

জানিয়েছিলেন। পাবনার এই অধিবেশনে কবির সঙ্গী ছিলেন জনাব আসাদুল্লা সিরাজী ও জুলফিকার হায়দর সাহেব।

নজরুল শেষবার ঢাকায় গিয়েছিলেন ১৯৪০ সালের ১২ই ডিসেম্বর। অতিথি ছিলেন তৎকালীন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রোগ্রাম এ্যাসিষ্ট্যান্ট (মিউজিক) সুনীলকুমার বসুর (৭ নং বনগ্রাম, ঠাটারীবাজার, ঢাকা) বাড়িতে। এর আগের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্র চালু হয়। ফলে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের এক বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৪০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্রে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। নজরুল তাঁর গায়ক-গায়িকার দল নিয়ে সেই অনুষ্ঠানে 'পদ্মারে ঢেউ রে' শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠানটি পরিবেশন করেন। নজরুল ছাড়া আর যাঁরা সেদিন ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শৈল দেবী, চিত্ত রায়, সুপ্রভা সরকার ইত্যাদি শিল্পীরা। প্রায় তিন সপ্তাহ সেখানে কাটিয়ে নজরুল কলকাতায় ফিরে এলেন।

দু'এক জনের মতে নজরুল আর একবার নাকি ঢাকায় সাহিত্যের এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার কোনো সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসলে, ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা থেকে ফেরার পর তিনি ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

যাই হোক, বিভিন্ন সময়ে ওপার বাংলায় নজরুলের উপস্থিতি দেখে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সেই বাংলার সঙ্গে তাঁর অন্তরের ঘনিষ্ঠতা কত নিবিড় ছিল। প্রকৃতির শ্যামল স্নিগ্ধতা, সাধারণ মানুষের সারল্যবোধ ও তাঁর নিজের প্রতি সে দেশের মানুষের আকর্ষণ তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। সেইজন্যে সুযোগ পেলেই বারবার সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। কেবলমাত্র সৃষ্টির নেশায় নয়, মানবিকতাবোধপ্রসূত আকর্ষণে, তারুণ্যের দুর্মর আহ্বানে, সর্বোপরি সেই নবজাগ্রত চেতনাবোধের সার্বিক রূপায়ণে তাঁর অদম্য আগ্রহের ফলেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল। আসলে মনুষ্যত্বের জয়গানে মুখর এই কবির মানবিকতায় ছিল অন্তহীন উৎসাহ। আর ঠিক সেইজন্যেই তিনি অক্লেশে চট্টগ্রামে সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বলতে পারেন,—

"আমাদের Next door neighbourএর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে, আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতামাতিরও অবসান হবে সেইদিন, যেদিন

হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে Competition হবে, সে Competition হবে Cultured মনের Chivalrous Competition—Sports-man like Competition."

একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারি যে আজ ওপারের মুক্তিপাগল বাংলাদেশ নজরুলের আকাঙ্ক্ষিত সেই 'কালচারড' মন নিয়ে আমাদের দিকে সৌভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, নজরুল আজ বেঁচে থেকেও কেবলমাত্র দর্শক হয়েই রইলেন।• এই মুহূর্তে এর চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডী আর কী হতে পারে ?

বাংলাদেশ ও নজরুল—নানা সূত্র।

নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা

আতাউর রহমান

কবি-জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে অবসান পর্যন্ত নজরুল ইসলাম মনে-প্রাণে বিপ্লব ও বিদ্রোহ কামনা করেছেন। বিদ্রোহ ও বিপ্লব ব্যতীত স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভ সম্ভব নয়, এরকম ধারণা নজরুলের জীবন-দর্শনের অন্তর্গত। অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয়-শিখা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবি বার বার আহ্বান করেছেন প্রলয়ের দেবতাকে। কবি বলেন, "দেশের নেতা, অপনেতা, হবু নেতা সকলে যখন বড় বড় দূরবীন লাগাইয়া স্বরাজের উদয়-তারা খুঁজিতেছিলেন তখন আমার উপরে শিব-ঠাকুরের আদেশ হইল এই আনন্দ রজনীকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিতে।····· আমার ভয় ছিল না, আমার পিছনে ছিলেন বিপুল প্রমথ বাহিনীসহ দেবাদিদেব প্রলয়-নাথ।"[১] এই পর্যায়ে কবি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উচ্চকণ্ঠ প্রবক্তা। অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর বাণী উদ্বেলিত লাভার মত উদ্গারিত হয়েছে। অগ্নি-বীণার যুগে 'স্বাধীনতা'র আকাঙ্ক্ষায় কবি বিদ্রোহী। তাঁর এই বিদ্রোহ অনেকাংশে নৈরাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, সন্দেহ নেই।

১৯২২ সালে নজরুলের সারথ্যে প্রকাশিত হল ধূমকেতু পত্রিকা। এ পত্রিকা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেদিন। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল ধূমকেতু পত্রিকা; এবং দাবী করেছিল পূর্ণ স্বাধীনতা।

"সর্ব প্রথম, ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেন না, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী ক'রে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুঁটুলি বেঁধে সাগর-

১. নজরুল চরিত-মানস, ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত

যারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয় নি এখনো। আমাদেরো, এই প্রার্থনা করবে, ভিক্ষে করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।"[২]

ধূমকেতুর এই সংগ্রাম ঘোষণা তদানীন্তনকালের বিপ্লবীদের উদ্দীপ্ত করেছিল। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার এই ঘোষণায় সত্যকার সমাজ-সচেতন মানুষ সমাজ-সমস্যার পূর্ণ সমাধান খুঁজে পায় নি। ঠিক এমনি প্রশ্ন-কাতরতা নিয়ে কবির বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে ধূমকেতুর সারথি নজরুলকে একটি পত্র উক্ত পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি বলেন, "আমাদের দেশের জনমণ্ডলীর প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে, তোমার লেখাতেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বড় দুঃখ যে, তুমি তাদের বিষয় পরিষ্কার করে আজো কিছু বলনি। নির্যাতিত জনসাধারণ বলতে আমি আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকদিগকেই বুঝি। এরা ছাড়া আর সবাই নির্যাতনকারী, নির্যাতিত নয়। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ কাগজেই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা লিখছে, আর কাঁদুনিও তারা গাইছে তাদের আপনাদেরই জন্য। ......দেশের দাসত্বের নিগড়কে সুদৃঢ় করার জন্য যতটা দায়ী জমিদার ও ধনী লোকেরা তার চাইতে এতটুকু কম দায়ী নয়, এই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা। আমাদের মরা-বাঁচা সমুহ নির্ভর করছে কৃষক ও শ্রমিকদের উপর।"[৩]

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের ঘটনা। কবির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ শ্রমিক আন্দোলনে লিপ্ত এবং ভারত উপমহাদেশে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের কার্যে ব্যাপৃত। তখনকার দিনে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংস্থার মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর থেকেই বামপন্থীরা শ্রমিক কৃষকদিগকে সংগঠিত করে তাদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী সংগ্রামের প্রেরণা জাগাবার চেষ্টা করেছেন। ঠিক এমনি উদ্দেশ্য নিয়ে,—"১৯২৫ সালের শেষ দিকে কলকাতায় একটি পার্টি গঠিত হয়। নজরুল ইসলাম, শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, কুতবুদ্দিন আহমদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন এই পার্টি গড়ার কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পার্টির নাম প্রথমে ছিল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির

[২] রুদ্রমঙ্গল, নজরুল-ইসলাম (নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

[৩] কাজী নজরুল প্রসঙ্গে স্মৃতিকথা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

('ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের) অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি। (The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress) এই পার্টির মুখপত্র "লাঙল" পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।"[৪]

'লাঙল' পত্রিকা নজরুল ইসলামের পরিচালনাধীনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বরে। বিদ্রোহী কবি পত্রিকায় ঘোষণা করলেন,—

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান
গাহি সাম্যের গান!

নজরুল ইসলামের 'সাম্যের গান'কে মার্কসের সাম্যবাদের সঙ্গে জড়িত করতে সমালোচকেরা একটু দ্বিধায় পড়েছেন। কাজী ওদুদ সাহেব বলেন, এই 'অপূর্ব আত্মবোধ কবিকে দুর্দমনীয় বেগে আকর্ষণ করলে সাম্যবাদের দিকে। তখন থেকেই তিনি হলেন সাম্যবাদের কবি ও প্রচারক। তাঁর বন্ধু কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের প্রভাবের কথা এ সম্পর্কে স্মরণীয়। কিন্তু এ বিষয়েও যেন আমাদের ভুল না হয় যে, তাঁ'র সাম্যবাদের গুরু মার্কস নন, বরং ভারতীয় সুফী ঋষি অথবা উভয়েই।"[৫]

নজরুলের সাম্য কেন মার্কসীয় সাম্য নয়, একথা বুঝতে হলে, মার্কসীয় সাম্যবাদের স্বরূপ জানা প্রয়োজন। মার্কস-প্রচারিত সাম্যবাদ কতকগুলি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রগুলি হলো—শ্রেণী সংগ্রাম, ধন সঞ্চয় ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

মনুষ্যসমাজকে কার্ল মার্কস, ধনী ও নির্ধন, মালিক ও শ্রমিক, দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো বা সাম্যবাদের ইশ্‌তেহারের শুরুতেই মার্কস শ্রেণী সংগ্রামের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। "The history of all hitherto existing society is the history of class struggles."[৬] মার্কস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'-এ দেখিয়েছেন মানব সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার বিরাট অসমতা। ধনিক ও শ্রমিক এই দুটি শ্রেণী পরস্পরবিরোধী

৪ কাজী নজরুল প্রসঙ্গে স্মৃতিকথা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

৫. কবি নজরুল-সংস্কৃতি পরিষদ (কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত

৬. The Communist Manifesto by Karl Marx and F. Engels

স্বার্থের প্রতিভূ। তাই তাদের মধ্যে সংঘাত ও সংগ্রাম অনিবার্য। মার্কসের মতে, ধনবাদ "সমাজ বিকাশের অপ্রতিরোধ্য পরিণতি এবং তা সমাজ বিবর্তনের ধারায় একটি অস্থায়ী স্তর। সামন্তবাদের মতো ধনবাদও একদিন পরাজিত ও বিলুপ্ত হবে।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পত্তি নিচয় জমা হ'তে থাকে। "ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিসত্ব শ্রেণীবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ। ব্যক্তিসত্বের এই শ্রেণী-গত রূপই এই সমাজের ধনোৎপাদন প্রণালীর মূল নিয়ন্তা,.... ধনতন্ত্রের স্বধর্ম উৎপাদিকা সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীর উত্তরোত্তর সংখ্যা-সংকোচ। তার এই বৈশিষ্ট্যই কালে তার ধ্বংসের কারণ হয়, এবং উত্তর ধনতান্ত্রিক যুগে অধিকার-চ্যুত জনগণের মধ্য হতে অধিকারের পুনঃ প্রসারণ ঘটে। প্রাচীন সমাজ যখন নতুন সমাজকে জন্ম দেয়, তখন শক্তি হয় ধাত্রী। এ শক্তি অর্থ-নৈতিক।"[৭]

অর্থনীতিই, মার্কসের মতে, সমাজ ব্যবস্থার মূল শক্তি। মানুষের ধর্ম, নীতি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আইন-কানুন যুগে যুগে আর্থিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত। সামাজিক অন্যায়-অবিচারের মূল কারণ সম্পত্তির উপর ব্যক্তির অধিকার। মার্কস দেখিয়েছেন, মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে সমাজ-সম্পদের সিংহ ভাগ কেন্দ্রীভূত হয়। সমাজ বিবর্তনের ধারায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধীরে ধীরে নির্বিত্ত ও নিঃস্ব শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই সমাজ সংকটের মধ্যে ধনবাদের মৃত্যু-ঘণ্টা ধ্বনিত হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও আয়ু ফুরিয়ে আসে। মার্কসের ভাষায় The knell of Capitalist private property sounds.

মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করলে নজরুলের সাম্যবাদ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায় না। তাঁর সাহিত্যে প্রথম থেকেই নির্যাতিত মানুষের দুঃখ ও বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে। 'লাঙল' পত্রিকার পরিচালক নজরুল সচেতন সাম্যবাদী। এই পর্যায়ে কবি নিপিড়ীত-শোষিত শ্রেণীর কথা বলেছেন একটা বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। একজন অনুরাগী পাঠকের পত্রোত্তরে কবি লিখেছেন, "...আপনি কি আমার বর্তমান লেখাগুলো পড়েছেন? আমি জানি না—লেখা প্রাণহীন হচ্ছে কিনা। ....আমার লেখার উদ্দামতা হয়ত কমে আসছে—তার কারণ আমার সুরের পরিবর্তন হয়েছে। আপনি কি

৭. চতুরঙ্গ, (ত্রৈমাসিক পত্রিকা), তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৫০, হুমায়ুন কবির সম্পাদিত

আমার "সাম্যবাদী" পড়েছেন? ....আমি আমার মনের কুঞ্জে আমার বংশী-বাদকের বিদায় পদধ্বনি আজও শুনতে পাই নি। তবে তার নবীনতর সুর শুনেছি। সেই সুরের আভাস আমার "সাম্যবাদী"তে পাবেন।"[৮]

নজরুলের কাব্যের এই "নবীনতর সুর" অবশ্যই সাম্যের সুর। তাঁর 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কাব্যের ভাবসত্য মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বহু লক্ষণ বহন করছে। 'সর্বহারা' শব্দটি ইংরাজী Proletariat বা Have-nots শব্দের বাংলা অনুবাদ। কাজেই 'সাম্যের গান' রচনার সময় নজরুলের মনে মার্কসীয় বা রুশীয় সাম্যবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্ব-ইতিহাসের সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন বলেই নিজেকে তাঁর সমসাময়িককালের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত করেছিলেন। শ্রমিকের গান, ধীবরদের গান, কৃষাণের গান, রাজা-প্রজা, চোর-ডাকাত, কুলি-মজুর, ফরিয়াদ এবং চাষার গান, শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র (প্রলয় শিখা), প্রভৃতি কবিতা সমাজব্যবস্থার আর্থিক অসাম্যকে ভিত্তি ক'রেই রচিত। এছাড়া অসংখ্য কবিতায়, গানে, গদ্য রচনায় তিনি নির্বিত্ত ও নিঃস্ব শ্রেণীর দুঃখদুর্দশার প্রতিকারার্থে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর কবিতা, গান ও গদ্য ভাষণকে অনেক ক্ষেত্রে মার্কসের 'সাম্যবাদী ইশ্‌তেহারের' প্রতিধ্বনি ব'লে মনে হয়। নজরুলের সাহিত্যের সর্বত্রই শ্রেণীসচেতনতা এবং সাম্যের চেতনা নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেওয়া গেল:

(আজ) চারিদিক হ'তে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত,
(ও ভাই) জোঁকের মতন শুষছে রক্ত কাড়ছে থালার ভাত।
(মোর) বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইক' আমার হাত।
(আজ) সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল॥

(কৃষাণের গান : সর্বহারা)

যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা,
রাজা-উজির মারছে মজা,
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দল্‌বি রে আয় মজুর দল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।

(শ্রমিকের গান : সর্বহারা)

৮ আনওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্র: নজরুল রচনা-সম্ভার, আবদুল কাদির

রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইঁটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছে খল কল্‌ও'লা মানুষ-পেষানো কল,
আখ্‌ পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল।

(চোর-ডাকাত : সাম্যবাদী)

উদ্ধৃত কাব্যাংশে কবি নগ্ন ভাষায় ধনিক বণিকদের শোষণ পদ্ধতির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। শ্রেণী সংগ্রামের মূল ভাব নজরুল কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই।

কার্ল মার্কস বর্তমান যুগের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থাকে দাসত্ব ব্যবস্থার পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন। Not only are they slaves of the bourgeoisie class, and of the bourgeoisie state, they are daily and hourly enslaved by the machine ; by the overlooker, and above all, by the individual bourgeoisie manufacturer himself.[১] মার্কস শুধু ধনবাদী শোষণকে বিজ্ঞানসিদ্ধ উপায়ে বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হন নি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও ঘৃণার সঙ্গে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। অনেক স্থানে তাঁর রচনা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ধনবাদী শোষণ মার্কসের দৃষ্টিতে "naked, shameless, direct, brutal exploitation" (নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ, পাশবিক শোষণ)।

কেবল কবিতায় নয়, উপন্যাস এবং নাটকেও নজরুল শোষণ ও নির্যাতনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন নির্মমভাবে। মৃত্যু-ক্ষুধার প্যাঁকালে পরিবারের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনের যে ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা যেমনি বাস্তব তেমনি মর্মান্তিক।

নজরুল বলেন, "....রেল ষ্টীমার, বিদ্যুৎ গাড়ী, কল কারখানা একটির পর একটি করিয়া মানুষের আরামের নিমিত্ত সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এই নিমিত্ত বায়ু, বিদ্যুৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মানুষ পশু পক্ষী, অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য-পশুর দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইতে লাগিল। কেহ ধর্মের নামে, কেহবা সমাজ, শান্তি শৃঙ্খলার নামে কোটি কোটি জীবনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে লাগিল।... লক্ষ লোকের অন্ন-সংস্থাপনের সর্বনাশ করিয়া চারি পাঁচশত লোক ধনী হইলেন এবং বিলাস ব্যসনে অর্থ ব্যয় করিলেন।" (ধূমকেতু)

১. Roads to Freedom by Bertrand Russell থেকে উদ্ধৃত

ধনবাদী যুগের শোষণ-যন্ত্রের কবলে প'ড়ে মানুষ যে স্বাধীনতা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেলছে, কবি নজরুল তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছেন। ধনবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সুরম্য ইমারতের ভিত্তিমূলে আছে বহু মানুষের রক্ত ও অশ্রু। মার্কস বলেন, "উপনিবেশ ব্যবস্থা পৃথিবীতে পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত।" অন্যত্র তিনি বলেন, "মূলধনের যখন আবির্ভাব হয়, তখন তার আপাদমস্তক, প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।"

সাম্রাজ্যবাদকে নজরুল বহু স্থানে 'জলদস্যু' ও 'ডাকাত' ব'লে ভর্ৎসনা করেছেন।

পরের মুলুক লুট করে খায়
ডাকাত তারা ডাকাত।....

(কামাল পাশা : অগ্নি-বীণা)

চোর-ডাকাত ও কুলি-মজুর কবিতায় নজরুল ধনতান্ত্রিক শোষণ প্রথাকে যে ভাবে তুলে ধরেছেন তাতে মার্কসীয় অর্থনীতির কথা মনে আসা অস্বাভাবিক নয়। চোর-ডাকাত কবিতাটি সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক শোষণ ও অন্যায়ের নির্ভুল প্রতিচ্ছবি।

বিচারক। তব ধর্মদণ্ড ধর,
ছোটদের সব চুরি ক'রে আজ বড়রা হয়েছে বড়।
যারা যত বড় ডাকাত-দস্যু জো'চ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছে খল কল্‌ও'লা মানুষ পেষাণো কল,
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল।....

পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়
নাচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকী, গাহে যক্ষের জয়।
অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল কিছু,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।

(চোর-ডাকাত : সাম্যবাদী)

মার্কস্ মূলধনের গায়ে দেখেছেন "রক্ত আর ক্লেদ", নজরুলও দেখেছেন ধনী প্রাসাদে শ্রমিকের রক্ত :

....তোমার অট্টালিকা

কার খুনে রাঙা ?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা !

(কুলি-মজুর (সাম্যবাদী) : সর্বহারা)

শ্রমিককে 'বেতন দেওয়া' যে ফাঁকিবাজির নামান্তর, মার্কসের মতো নজরুল তা স্বীকার করেন। নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে শ্রমিককে খাটিয়ে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে ধনিকের মুনাফা।

বেতন দিয়াছ ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল !

কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল ?

(কুলি-মজুর (সাম্যবাদী) : সর্বহারা)

শ্রমিকের রক্তক্ষয়ী শ্রমের উপরই গড়ে উঠেছে রেল, ষ্টীমার, কল কারখানা, ধনিক সম্প্রদায়ের গগনচুম্বী মিনার। আজকের মূলধন দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন এবং দাস-ব্যবসায়ের উপর গড়ে উঠেছে, এটা ঐতিহাসিক সত্য। "Wealth had gradually been accumulating in England since sixteenth century from piracy, plunder and slave-trading from colonies in America and trading-posts in India."[১০]

নির্যাতিত মানুষের বেদনাকে কাব্যায়িত করার মূলে নজরুলের মনে বৈপ্লবিক ইচ্ছা সক্রিয় ছিল। নিঃস্ব, নির্বিত্ত মানুষকে তিনি বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর এই সংগ্রাম ছিল ক্লান্তিহীন। কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে মার্কস বলেন, "They openly declare their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling class tremble at a communists revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries unite."[১১] সর্বহারা কাব্যের প্রথম গানেই কবি বিশ্বের নির্যাতিত মানুষকে

১০. A Political And Cultural History of Modern Europe by Carlton J. H. Hayes

১১. The Communist Manifesto by Marx Engels

মায়ার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে প্রলয় পারাবার পার হওয়ার জন্য "নায়ে পাল তুলে" দিতে বলেছেন :

মাঝি রে, তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল্,
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
প্রলয়-পথিক চ'ল্‌বি ফিরি
দ'ল্‌বি পাহাড় কানন গিরি
হাঁকছে বাদল, ঘিরি' ঘিরি'
নাচ্‌ছে সিন্ধুজল।
চল্ রে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল্। (সর্বহারা)

সর্বহারা শ্রমিকদের সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছেন কবি উদাত্ত ভাষায়—

ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয়রে ধ্বংস-সাথী।
ধর হাতিয়ার সামনে প্রলয় রাতি রে।
আয় আলোক স্ব'নের যাত্রীরা আয়
আঁধার নায়ে চড়বি চল।
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

(শ্রমিকের গান : সর্বহারা)

কার্ল মার্কস বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীকে ধর্ম ও জাতিভেদের উর্ধ্বে একটি নতুন মানব সংঘরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নজরুল মানসে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বোধের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। তাই তিনি বলেছেন,

নির্যাতিতের জাতি নাই জানি মোরা মজলুম ভাই
জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই।
বকাসুরে আর বকিতে দিব না ঠাসিয়া ধরিব টুঁটি
এই ভেদ জ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন রুটি।

(ঈদের চাঁদ; নবযুগ, ঈদ সংখ্যা, ১৯৪২)

কুলি-মজুর কবিতাতেও তিনি বিশ্বের মানব শ্রেণীকে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের পতাকাতলে আহ্বান জানিয়েছেন :

সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি
এক মোহানায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশী।

(কুলি-মজুর (সাম্যবাদী) : সর্বহারা)

নজরুলের পরিকল্পিত সাম্যরাজ্যে সব মানুষ সমান, তাদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য নেই, ধর্মীয় ব্যবধান নেই, বর্ণের বিভেদ নেই।

গাহি সাম্যের গান—
বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে মুখে মুখে তাজা প্রাণ।
বন্ধু, এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র ধনী,
হেথা পায় নাক' কেহ ক্ষুদ ঘাঁটা, কেহ দুধ-সর-ননী।
অশ্ব-চরণে, মোটর চাকায় প্রণমে না হেথা কেহ,
ঘৃণা জাগে নাক' সাদাদের মনে দেখে হেথা কালো-দেহ।
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গির্জ্জা ঘর,
নাইকো পাইক-বরকন্দাজ, নাই পুলিশের ডর।
এই সে স্বর্গ এই সে বেহেশ্‌ত্‌, এখানে বিভেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাত রেখে মিলিয়াছি ভাই ভাই।
নাইকো এখানে ধর্মের ভেদ, শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।

(সাম্য : সর্বহারা)

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সাম্যবাদী কবির কল্পিত এই পৃথিবী কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ থেকে দূরে নয়। পাইক-পুলিশহীন সমাজ মার্কসীয় সরকারহীন রাষ্ট্র সমাজের সমার্থক। এই পৃথিবীর শাসনভার কবির মতে তাদেরই হাতে থাকবে যাদের শ্রমে গড়ে ওঠে সভ্যতা সুরম্য প্রাসাদ। কবির এই চিন্তাধারা মার্কস-নির্দেশিত শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্যকে সমর্থন করে।

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,

তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান—
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

... ...

সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।

(কুলি-মজুর (সাম্যবাদী): সর্বহারা)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলা দেশে সমাজ-তান্ত্রিক চেতনা নজরুল পূর্ববর্তী কোন কোন সাহিত্যিক ও কবির মধ্যে দেখা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় সমাজ-চিন্তা ও দর্শনের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন। রুশো, কোঁৎ (Comte), মিল প্রমুখ দার্শনিকের চিন্তাধারা ও আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর রচিত 'সাম্য' তথা বাংলা দেশের কৃষকের অবস্থা এবং ব্যঙ্গ রূপক প্রবন্ধ 'বিড়ালে' যে চিন্তা-ভাবনা দেখা যায়, তা ইউরোপীয় সমাজবিপ্লবের ফলশ্রুতি। বঙ্কিমচন্দ্র ফরাসী বিপ্লবের তাৎপর্য এবং গণ-অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বাক্যবল তথা নৈতিক শিক্ষা সমাজের অন্যায় অবিচার নিরসনে ব্যর্থ হলে, বাহুবলের প্রয়োজন আছে; এই ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছিলেন। সামাজিক অসাম্য-অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সত্যেন দত্ত মুখর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য সম্পর্কে তাঁর চেতনা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। সত্যেন দত্তের পর সামাজিক অবিচার ও অসাম্যের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ নির্ণয়ে যথার্থভাবে নিয়োজিত বলেই নজরুল নতুন যুগের পথিকৃৎ।

ইউরোপে লা-মার্সাই এর পর সৃষ্টি হয়েছে লা-ইন্টার ন্যাশনাল। প্রথমটি জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ, দ্বিতীয়টি সাম্যবাদী চেতনার। এ দেশেও বন্দে মাতরম্,[12] সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা, আর জন-গণ-মন অধিনায়কের পর প্রয়োজন ছিল লা-ইন্টার ন্যাশনালের নতুন 'পতিয়েরে'র, যিনি বলতে পারেন, 'জাগরে কিষাণ সব ত গেছে কিসের বা আর ভয়,' বলতে পারেন 'ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল। ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল'। বলা বাহুল্য, নজরুল ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি, সেই সংগীতের বিদ্রোহী আবেগ তাঁর কবিতা ও গানে গানে ছড়িয়ে দিয়েছেন অজস্রভাবে।

১২. গানটি পৌত্তলিকতা-দুষ্ট; জাতীয় সংগীতের অযোগ্য। ,,

নজরুলের সাম্যবাদী চেতনা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক না হলেও মানবেতিহাসের বিপ্লবী প্রয়াস সম্পর্কে জাগ্রত ছিল। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা শক্তি সংগ্রহ করেছে ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের ঐতিহ্য এবং শেলী, হুইটম্যান, গোর্কির সাহিত্য থেকে। স্বাধীনতা প্রীতি ও বিপ্লবী আবেগের সমন্বয়ে তিনি শেলীর যথার্থ উত্তর-সুরী, এবং শওকত ওসমানের ভাষায় 'গোর্কির মানসপুত্র'। নজরুলের স্বাধীনতা-বোধ রুশোর মতই সাম্যবাদের সমার্থক।[১৩] তাঁর সাম্যবাদকে যাঁরা কবির কল্পনা বলে উড়িয়ে দেন, তাঁরা ভুলে যান যে, কল্পনামূলক সাম্যবাদ না এলে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের উদ্ভব হতো না। রজনী পাম দত্তের ভাষায় "Communism did not spring into existence ready-made from the inspiration of a genius[১৪] এবং এই উক্তির সমর্থন পাই বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কসের বক্তব্যেও The Jacobin of 1793 has become the communist of today.[১৫] ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে যা ছিল স্বপ্ন, পাক-ভারতে তা বিংশ শতাব্দীতেও স্বপ্নাতীত। কাজেই নজরুলের কবি-কল্পনাকে অবাস্তব বলবার পূর্বে, এখানকার সমাজ-বিকাশের স্তরটিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা দরকার। ইউরোপে যে যুক্তিবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতা সামন্ত যুগের বিশ্বাস ও সংস্কারকে সমাধিস্থ করেছে, যে জাতীয়-গণতান্ত্রিক চেতনা ধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছে, এই উপমহাদেশে আজও তা সম্ভব হয় নি। তাই নজরুল যখন লেখেন—

রবি-শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশ বহে
'এই দিবা রাতি আকাশ বাতাস নহে একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল,
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
সু-স্নিগ্ধ মাটি, সুধা সম জল, পাখীর কণ্ঠে গান,—
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর ফরমান—'
ভগবান! ভগবান!
(ফরিয়াদ : সর্বহারা)

১৩. "Liberty is the nominal goal of Rousseau's thought but in fact it is equality that he values, and that he seeks to secure at the expense of liberty." History of Western Philosophy by Bertrand Russell

১৪-১৫. The International by R. Palm Dutt

তখন তাঁর সাম্য চেতনার প্রতি বিদ্রুপের হাসি না হেসে স্মরণ করতে বলি ইউরোপের উনিশ শতকের সাম্যবাদী ঘোষণা :

"We declare that the earth with all its natural productions is the common property of all." এবং "Nature has given to every man an equal right to the enjoyment of all goods."[১৬]

বিপ্লব প্রসঙ্গে নজরুল বহু জায়গায় ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। মানব-সভ্যতার আধুনিক পর্যায়ে ঐ দুটি বৈপ্লবিক ঘটনা জনশক্তির বিরাট বিজয় ও অগ্রগতিরূপে খ্যাত। দুটি বিপ্লবের মধ্যে কেবল সময়গতই নয়, চরিত্রগত পার্থক্য আছে। কিন্তু কবির প্রয়োজন বৈপ্লবিক প্রেরণার, তাই ঐ দুটি বিপ্লবকে নজরুল একই সঙ্গে উল্লেখ করে কোন যুক্তি-বিরুদ্ধ কাজ করেন নি। মনে রাখা দরকার যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিচার করতে গিয়ে নজরুল যে সময়ে শ্রেণীসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন সে সময় এ দেশের সাহিত্য পূর্ণভাবে ভাববাদী চেতনায় আচ্ছন্ন। বর্তমান বিশ্বসাহিত্যকে তিনি 'স্বপন বিহারী' ও 'মাটির দুলাল' এ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বুঝতে কষ্ট হয় না যে নজরুলের সাহিত্যে এই শ্রেণী-করণ সমাজ ব্যবস্থার আর্থিক কাঠামো ভিত্তিক। তাঁর মতে "দুদিকেই বড় বড় রথী মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি Dreamers—স্বপ্নচারী, আর এক দিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্ণাড শ', বেনাভ্যান্তে প্রভৃতি।" এঁদের মধ্যে রুশ সাহিত্যিক গোর্কির উপর নজরুলের শ্রদ্ধা অপরিসীম। তিনি বলেছেন "গোর্কির পরে যে সব কবি লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কিনা, তা আজও বলা দুষ্কর।" আমরা জানি রুশিয়ার বিপ্লব সংগঠনে গোর্কির সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নজরুলের মতে রুশ সাহিত্যে দস্তয়ভস্কি সৃষ্টি করেছেন "বেদনার মহাপ্লাবন।" "টলষ্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহা প্লাবনে।"

"তারপর এলো এই মহা প্লাবনের উপর তুফানের মত—ভয়াবহ সাইক্লোনের মত বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। ... দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস যে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে লুকায়িত শত্রুকে দংশন করলে। জয়ে গেল, জারের রাজ্য গেল—ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি

১৬. The International by R. Palm Dutt

শাবলের ঘায়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংস-ক্লান্ত পরশুরামের মত গোর্কি আজ ক্লান্ত, শ্রান্ত—তুরন্ত বা নব রামের আবির্ভাবে বিতাড়িত .... কার্ল মার্কসের ইকনমিক্সের অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অন্নলক্ষী হয়ে উঠেছে।" বিপ্লবোত্তর রুশীয়ার তুর্নামই যখন শোনা যেতো বেশী, তখন ঐ দেশের প্রতি নজরুলের এই মনোভাব নিঃসন্দেহে মার্কসীয় সাম্যবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচায়ক।

তত্ত্বগত দিক থেকে নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় নৈরাজ্যিক চেতনার প্রকাশ খুব স্পষ্ট। বিপ্লবী যুগে ইউরোপে যেসব চিন্তানায়ক সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তাঁদের অনেকের চিন্তায় নৈরাজ্যবাদী লক্ষণ দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রুধুঁ। গডউইন প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নজরুল যে আইন-কানুনকে সহ্য করতে পারেন নি তা প্রকৃত পক্ষে নৈরাজ্যবাদী স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। "আমি সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছি। কারণ ইহা একটি সংবিধান।" নৈরাজ্যবাদী প্রুধ্যুর এই উক্তির হুবহু প্রতিধ্বনি পাই :

'আমি মানি না ক' কোনো আইন'

অথবা 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'

অথবা "স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে নিজেই রাজা বা সবাই রাজা। আমি কারুর অধীন নাই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই"—নজরুলের এইসব মন্তব্যে।

শিষ্টাচার ও নীতিবোধ সম্পর্কে প্রুধ্যুর ধারণা নজরুলের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে মিলে যায়। শুধু প্রুধ্যুই কেন, ইউরোপের বিপ্লবযুগের চিন্তানায়কেরা প্রায় সবাই সামন্তবাদী রীতিনীতির মূল্য বিচার করতে গিয়ে অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। প্রচলিত নৈতিকতার প্রতি আস্থা ছিল না বলেই নজরুল পাপ, বারাঙ্গনা, মিথ্যাবাদী, ধূমকেতু প্রভৃতি কবিতা রচনা করতে পেরেছেন।

সমাজব্যবস্থার আইন ও রীতিনীতির মুখোশ তিনি এমনভাবে খুলে দিয়েছেন, যাতে তার মূল ভিত্তি নড়ে উঠেছে।

(ক) আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক সত্য বলিলে বন্দী হই,

(খ) জনগণ হল যুদ্ধে বিজয়ী রাজার গাহিল জয়।

(গ) সন্তান সম যারা পালে জমি তারা জমিদার নয়।

এই সব কাব্যবচনে সমাজজীবনের অসংগতি ও অসাম্য প্রকটিত হয়েছে অসাধারণ ভাবে। নজরুল কাব্যের সর্বত্র বন্ধন ও অধীনতাকে অস্বীকার করার

বাসনা ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠেছে অবাধ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। জীবন ও জগতের সব ক্ষেত্রেই তিনি 'পদ্ধতির শিকল'[১৭] ভাঙতে চেয়েছেন। তাঁর জীবনের ব্রতই "নিষেধ-জগতে"[১৮] বিদ্রোহ সৃষ্টি করা।

কার্ল মার্কসের কাল উনবিংশ শতাব্দী—পরিবেশ নবোদিত ধনতন্ত্রবাদী ইউরোপ। ফরাসী বিপ্লবের পর সেখানে গণতান্ত্রিক চেতনা ও বিজ্ঞান বুদ্ধি প্রসার লাভ করে। ফলে ধর্মীয় প্রত্যয়গুলি সেখানে শিথিল হ'তে থাকে। স্বেচ্ছাতন্ত্রের কারাগার ভাঙলো, যাজকতন্ত্রের মহিমা ধূলিসাৎ হলো। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বুলি সেদিন জনগণের যথার্থ দাবী পূরণ করতে পারে নি। ফরাসী বিপ্লবের এক নেতার মুখে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল বিপ্লবের অসাফল্যের দিক। "ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দু'টো ভাত একটু নুন" কবির এই উক্তির সমর্থন পাই বিপ্লবী কর্মীর ঘোষণায়—

Freedom is only a delusion if one class is able to stary another, if the rich man through his monopoly has power of life and death over the poor····It is the bourgeoisie who have enriched themselves out of the revolution for four years.[১৯] এ অসাফল্যের অতৃপ্তি ইউরোপকে যখন ধূমায়িত করছিল, দিনের পর দিন সর্বহারা শ্রেণীকে নিঃস্বতার অতলে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, তখনি মার্কসের কণ্ঠে সাম্যবাদের ইশ্‌তেহার ধ্বনিত হয়েছিল। মার্কসের সমস্ত চিন্তা ও চেতনা সমাজের আর্থিক কাঠামোর স্বরূপ বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হয়েছে। ইউরোপের কাল ও পরিবেশ তাঁকে বস্তুবাদী চিন্তাধারার সুযোগ দিয়েছে। তিনি ধর্ম, জাতীয়তা প্রভৃতি বিষয়কে বুর্জোয়াদের শোষণ জাল ব'লে রেহাই পেয়েছেন। কিন্তু নজরুল ইসলাম মূলতঃ কবি। তদুপরি ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থার আধা সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় তাঁর মানস লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত। এখানে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক চেতনাস্বাতন্ত্র্য এবং আর্থিক চেতনা অপেক্ষা প্রবল। তাই

১৭. সাহারায় এরা ধুঁকে মরে—তবু পরে না শিকল পদ্ধতির

(শাত-ইল-আরব : অগ্নি-বীণা)

১৮. তোমার বিশ্বের নীহারিকা লোকে নিতি নব নব গ্রহ,
জন্ম লভিয়া নিষেধ-জগতে জাগায়েছে বিদ্রোহ।

(মিস্টার এম. রহমান : জিঞ্জির)

১৯. The International by R. Palm Dutt

সামাজিক বিভেদ দূর করার জন্য নজরুল ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করেছেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সর্ব প্রকার সমাজ-সংস্কার প্রয়াস মূলতঃ যুক্তিশীল ধর্মপ্রবণতার ছকে বাঁধা। নজরুলের এই যুক্তিশীল ধর্মপ্রবণতাকে কাজী আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার ভারতীয় সূফী সাধক ও ঋষিদের শিক্ষাজাত বলতে চেয়েছেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, মধ্য যুগের সূফী ও ঋষিগণ ছিলেন নির্বিরোধ, পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন। তাঁদের সাধনা ও চিন্তাধারা ঈশ্বর, পরকাল, আত্মা, অদৃষ্ট প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আজো পাক-ভারতীয় সূফী ও ঋষিদের উত্তরাধিকারিগণ মানুষের সামাজিক সমস্যা নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করতে অক্ষম। বিবেকানন্দ, গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবর্গ যাঁদের প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, তাঁরা কেউ ধর্মনিরপেক্ষভাবে সমাজ ও রাজনীতির কথা চিন্তা করতে পারেন নি। ভারতীয় মানসিকতার এই জটিল চারিত্র্য লক্ষ্য করেই জনৈক লেখক বলেছেন....in India more than any other country we have always to notice those movements which spring directly out of the religious spirit of the people. One writer has even said that Indians are incorrigibly religious.[২০]

এমনি এক দেশে নজরুলের আবির্ভাব। তবু তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে, জাতীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে বহু ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আক্রমণ চালিয়েছেন। নজরুলের কাব্যে যে সাম্যবাদ, গণতান্ত্রিকতা, মানবতাবোধ, উদার মানসিকতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মদ্রোহিতা দেখি, তা মধ্য যুগের ভারতীয় সূফী, ঋষি এবং সমাজ সংস্কারকেরা কল্পনাও করতে পারেন না এবং সহ্যও করতে পারেন না। শুধু মধ্য যুগই বলি কেন, এ যুগের ধার্মিকেরাও তাঁর বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ এনেছেন এবং তাঁকে শয়তান ও কাফের বলে নিন্দা করেছেন।

ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয় সংস্কারের প্রতি নজরুলের এলোপাতাড়ি আক্রমণ অল্পদিনের মধ্যেই দিক পরিবর্তন করলো। হয়ত অভিজ্ঞতা তাঁকে বুঝিয়ে দিল ধর্মান্ধ মানুষ হঠাৎ বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারে না। তাই তিনি

২০. The Rise and Growth of the Congress in India by C. F. Andrews and Girija Mukherjee

ধর্মীয় সংস্কারকে আঘাত করেও ধর্ম ও মুক্তির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। ধর্মের উদার ব্যাখ্যা রচনা করে তিনি সংস্কারাচ্ছ জনচিত্ত আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। বহু ধর্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারত উপমহাদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মোহাম্মদ প্রভৃতি নবী অবতারকে একাসনে বসিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা ধর্মীয় ঐতিহ্য তাঁর কাব্যে বিপ্লবী তাৎপর্য লাভ করেছে। পুঁথি রচয়িতাদের অন্ধ বিশ্বাস ও অলস ভক্তি প্রবণতাকে অতিক্রম করে হিন্দু-মুসলিমের ঐতিহ্যে তিনি আধুনিক সমাজ-সচেতনতা আরোপ করে সত্যিকার বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে হজরত মোহাম্মদ বিদ্রোহী সাম্যবাদী, খালেদ বিশ্বের মজলুম মানুষের সেনাপতি, খলিফা ওমর সাম্য, সুবিচার ও মানবতার প্রতীক, শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী কংস কক্ষে কংস হন্তা, সব্যসাচী দুঃসাহসী—যৌবন-ধর্মের প্রতীক। ঐতিহ্য ও পুরাণের যুগোপযোগী এই রূপায়ণ নজরুল-কাব্যে বিপ্লবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে এবং সে বিপ্লব সাম্যবাদের কামনায় উদ্দীপ্ত।

কার্ল মার্কস্ এবং তাঁর অনুসারীদের দৃষ্টিতে ধর্ম প্রগতি-বিরোধী। কিন্তু তাঁদের এ সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত এ-কথা কে বলবে? বিশেষতঃ ধর্মের নৈতিক শিক্ষা মানুষের কাছে চিরকালের জন্য ধ্যেয় এবং শ্রদ্ধেয় সম্পদ। কিন্তু ধর্ম যেখানে সত্যিকার প্রগতির বাধা সেখানে নজরুলও মার্কসীয়দের মত বিপ্লবী ভাষায় বলেন,—

কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম নেশা
ধ্বংস করেছি ধর্ম-যাজকী পেশা,
ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ,
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত,
এক মানবের একই রক্ত মেশা।
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।

(প্রলয় শিখা : বিংশ শতাব্দী)

ভারতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত জাতীয়তা হিন্দু-জাতীয়তার নামান্তর। ভারতীয় রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কখনই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে নি। নজরুল এই সংকীর্ণ পরিবেশ ও সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে আপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন। তাঁর কবিতার আবেদন যাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তজ্জন্য

তিনি একই সঙ্গে আল্লাহ্-ঈশ্বর, মসজিদ-মন্দির-গীর্জা, মোহাম্মদ-কৃষ্ণ, খালেদ-অর্জুন, কোরান-বেদ-বাইবেল প্রভৃতি রূপক উপমা ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম। এ সম্পর্কে কবি নিজে বলেছেন, "এঁরা কি মনে করেন হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তাহলে মুসলমান কবি দিয়ে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি কোন কালেই সম্ভব হবে না—জৈগুন বিবির পুঁথি ছাড়া।....বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু-দেবদেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাঁদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কুঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাঁদের সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই।"

নজরুলের সাম্যবাদ কেবলমাত্র তাঁর কাব্যের অলঙ্কার কিংবা রাজনীতির স্লোগান মাত্র ছিল না। ভারত উপমহাদেশে চরম সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেও তিনি অবিচলিত অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। নিজেকে তিনি সর্বদাই জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যে অনন্য ও অদ্বিতীয়। তিনি বলেন, "কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেনি কাফের, আমি বলি, ও দুটোর কিছুই নয়।" শুধু ধর্মীয় কেন, ভৌগোলিক জাতীয়তাও তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশের এই সমাজের নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই আমি কবি।" একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে নজরুল সর্বত্রই মানুষকে ধর্ম ও জাতীয়তার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তাঁর নিজের জীবনে হিন্দু নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ তাঁর অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের নামকরণেও সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। সমাজ জীবনে সাম্য ও উদারতা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। ধ্যান-মগ্ন নজরুল-মানসেও এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা লক্ষ্য করি। ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত-জয়ন্তী উৎসবে কবি তাঁর জীবনের লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করলেন। "হিন্দু-

মুসলমানের দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব—অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মত জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্ম-জীবনে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।"

নজরুলের এ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী শুধু কার্ল মার্কসকেই নয়, সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় সক্রেটিসকে যিনি বলেছিলেন, "I am not an Athenian or a Greek, but a citizen of the world."[২১] আরও স্মরণ করিয়ে দেয় টমাস পেনের উক্তি, "My country is the world, and my religion to do good."[২২]

মার্কস ইতিহাসকে দেখেছেন শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টি দিয়ে। নজরুল সে দর্শন অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তিনি আরও একটি সংগ্রাম লক্ষ্য করেছেন মানব-সমাজের অগ্রগতিতে। সে সংগ্রাম মুক্তি ও বন্ধনে এবং কবির মতে এই সংগ্রাম অশেষ। মহাকালের পথ "দুর্গম কাঁটাভরা"। সে পথে কল্যাণ অভিসারী পথিক যুগে যুগে মৃত্যুকে বরণ করে,—কিন্তু শৃঙ্খলের বিভীষিকার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। কবি নজরুল বলেন, "এই ত মানবাত্মার সত্য শাশ্বত পথ।" দুরন্ত পথিক মুক্ত দেশের উদ্বোধন বাঁশির সুর ধরিয়া চলে। মুক্তির অভিযানে বাধা দেয় শৃঙ্খল। সে বলে, "আমি শৃঙ্খল। তুমি যা-ই বল, তোমাকে হত্যা করাই আমার ব্রত, মুক্তিকে বন্ধন দেওয়াই আমার লক্ষ্য।" তার উত্তরে দুরন্ত পথিক বলে, "মারো,—বাঁধো, কিন্তু আমাকে মারবে না; আমার ত মৃত্যু নাই। আমি আবার আসব।" (দুরন্ত পথিক : রিক্তের বেদন)

মুক্তি ও বন্ধনের সংগ্রামে দুরন্ত পথিক প্রাণ দেয়। আবার নতুন যাত্রী আসে। এমনি করে সংগ্রাম চলে যুগে যুগে মানব সভ্যতার ইতিহাসের এ একটি অনিবার্য ধারা। এ সত্য দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে স্বীকার করে, স্বীকার করে এলিয়ট-কথিত দর্শন—

> The world turns and the world changes.
> But one thing does not change...
> The perpetual struggle of good and evil.[২৩]

২১-২২. The International by R. Palm Dutt
২৩. Selected Poems by T. S. Eliot

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেন, "তাঁর নিকট সাম্যবাদ একটা দূরবস্থিত আদর্শ, ভাব—একটা দুর্গম অভিযানের শেষ, একটা সংগ্রামের অবসান। ....এ আদর্শের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়া আবেগ-রঞ্জিত, মোহ-নীল। এ তাঁর যৌবনস্বপ্নেরই পরিণতি। কিন্তু, গভীর ইতিহাসবোধ অথবা সমাজ প্রবাহের আন্তরিক উপলব্ধি থেকে যে নজরুল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা কোন মতেই বলা যায় না।" (কবি নজরুল)

'দূরবস্থিত আদর্শ' বা 'আবেগ-রঞ্জিত' বলেই নজরুলের সাম্যবাদ মার্কসের সাম্যের বিরোধী নয়। কোন নীতি বা তত্ত্ব কবিতা হ'তে পারে না। নজরুলের মতে, "ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে। কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না।....কোন ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে ব'লে বিশ্বাস করি না।"

অবশ্য একথা সত্য যে, মার্কসবাদ তাঁর জীবন-দর্শন হয়ে ওঠে নি। মার্কস নির্দেশিত সামাজিক সমতা নজরুল মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বের ছকে ফেলে কবিতা করেন নি তিনি। 'দূরবস্থিত আদর্শ' ব'লে সাম্যবাদ মানুষের কাছে এত আকর্ষণীয়। নজরুলের সাম্যবাদের প্রেরণা গভীর ইতিহাস-বোধ থেকে উদ্ভূত কিনা সে প্রশ্ন এখানে তুলতে চাই না। কিন্তু তাতে আন্তরিক উপলব্ধি নেই, এমন উক্তি কবির প্রতি অবজ্ঞা-প্রসূত। এ রকম হঠোক্তির উত্তরে বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্যের আশ্রয় নিয়ে বলতে চাই, "আজকাল যে সাম্যের বাণী লোকের মুখে মুখে বুলিতে পরিণত হয়েছে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই তার প্রথম উদ্‌গাতা। রাজনীতিকে তিনি এড়িয়ে চলেন নি, তার মধ্যে নিজেকে হারিয়েও ফেলেন নি—তা থেকে বের করেছেন সুরঝঙ্কার এবং সেটাই তো কবির কাজ। এখনকার রাজনৈতিক আড্ডায় শুধু এই জন্য তাঁর সম্মান হ'তে পারতো, সেটা হয়নি এই কারণে যে, প্রগতিশীল পরিভাষায় নজরুলের কবিতা রোমান্টিক। বিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা—এ সমস্ত জিনিসকে যাঁরা রোমান্টিক বলে এক পাশে সরিয়ে রাখেন, তাঁদের পক্ষে সাহিত্য-চর্চা নিতান্তই অবৈধ।[২৪]

২৪. কবিতা, (ত্রৈমাসিক পত্রিকা), নজরুল সংখ্যা ১৩৫১, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

বাঙালী কবি নজরুল

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার অসংখ্য বাঙালীর অনমনীয় সংগ্রামের ঐতিহাসিক সাফল্যের মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে নজরুলকে। মনে পড়ছে এ জন্তে, মানসিকভাবে বেঁচে থাকলে এই ঐতিহাসিক ঘটনায় সবচেয়ে বেশি, সকল বাঙালীর চেয়ে বেশি, খুশি হতেন তিনি। বেদনাদায়কভাবে তাঁর কথা আরও মনে পড়ছে এ জন্তে, যে-শোষণমুক্ত সমাজ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও আদর্শ, তারই বাস্তব রূপ বাংলাদেশ নামক নবজাতক রাষ্ট্রকে সর্বাগ্রে বরণ করার অসামান্য আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন।

নজরুলকে আমি 'বাঙালী কবি' বলে চিহ্নিত করতে চাই। এবং আরেকটু এগিয়ে তাঁকে 'খাঁটি বাঙালী কবি' ব'লে নন্দিত করি। 'বাঙালী' হতে পারা অগৌরবের নয়, বরং যথেষ্ট কৃতিত্বের; ইংরেজ যদি 'ইংরেজ' হতে পারে, ফরাসী যদি 'ফরাসী' হতে পারে, বাঙালী তাহলে 'বাঙালী' হতে লজ্জিত হবে কেন? দেশের মাটির পরে মাথা না ঠেকালে যখন বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচলের স্পর্শ মেলে না, বাংলার কবিকে তখন সর্বাগ্রে 'বাঙালী কবি' হতে হবে, সময়-সুযোগ মতো ও ক্ষমতা অনুসারে পরে বিশ্বকবি হলে চলবে।

প্রত্যেক জাতিরই কিছু চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কিছু কুললক্ষণ থাকে। বাঙালীরও আছে। আমার মতে, ভাবপ্রবণতা, ধর্মীয় ঔদার্য ও চিত্তের সরসতা বাঙালী জাতির চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্যসমৃদ্ধ করেছে। এই তিন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে আত্মগর্ব বা আত্মতুষ্টির সংযোজনায় বাঙালী চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আরও দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

বাঙালীর পুরাবৃত্ত এবং বাঙালী সম্পর্কে ভিন্‌দেশীদের উক্তিতে অন্তত আমার মতের সমর্থন মিলবে। তথ্যবাহুল্যে যাবো না, দু-চারটি সমর্থক তথ্যের উদ্ধৃতিতে আপাতত তুষ্ট থাকব। অষ্টম শতাব্দীর কাশ্মীর নরপতি ললিতাদিত্যের প্রতিশ্রুতিতে নির্ভরশীল হয়ে গৌড়ের রাজা কাশ্মীরে গেলে নিহত হন; কাশ্মীররাজের বিশ্বাসঘাতকতায় ও নৃশংসতায় বাঙালী সে-দিন নীরব থাকে নি,

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও অল্প সংখ্যক বাঙালী সৈন্য সেদিন কাশ্মীরের মাটিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কোন বাঙালী লেখক নন, কাশ্মীরের ঐতিহাসিক-শিরোমণি কল্হন এই শৌর্যের ও আত্মত্যাগের এই অপূর্ব ঘটনার সপ্রশংস উল্লেখ ক'রে গেছেন। আমার মতে, এই ঘটনা শুধু সাহসিকতার নয়, বাঙালীসুলভ ভাবপ্রবণতারও দীপ্র দৃষ্টান্ত। এবং আজকের পূর্ব বাংলার বাঙালীদের মুক্তি-সংগ্রামে বারোশ' বছর আগেকার সেই দৃষ্টান্ত আরও উজ্জ্বল আরও ব্যাপকভাবে যেন পুনরাবৃত্ত হলো। ভাবপ্রবণতা যে বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ভিন্‌দেশীদের রচনাতেও তার উল্লেখ মেলে, মিতাক্ষরার প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর এবং ১৮৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ্য। কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর দর্পোপদেশ গ্রন্থে বাঙালীদের আত্মগর্বের কথা বলেছেন, সেই সঙ্গে তাদের কলহপ্রিয়তারও।

এই সব দোষ-গুণের কালো-সাদায় প্রাণবন্ত বাঙালী চরিত্রের প্রতিফলন আমাদের একাধিক কবির কাব্যকৃতিতে উপস্থিত : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, নজরুল ইসলাম—প্রতিনিধিস্থানীয় 'বাঙালী' কবিদের মধ্যে চারটি উজ্জ্বল নাম। পাশ্চাত্য প্রভাব সত্ত্বেও মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র মূলত 'বাঙালী' কবি, এবং বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে আমি এঁদের সঙ্গে একাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই না, কারণ এঁদের কেউই রবীন্দ্রনাথের মতো একই সঙ্গে 'দেশজ' ও 'দেশান্তর' হতে পারেন নি। প্রতিভায় এঁরা রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা ন্যূন, এঁদের কাব্যজীবনও মিতায়ু, সুতরাং এঁদের রবীন্দ্রনাথের সমপর্যায়ভুক্ত করার প্রয়াসে সাহিত্যবোধের ও যুক্তিনিষ্ঠার অভাব সূচিত হয়।*

আমার মূল বক্তব্য, পূর্বোক্ত কবি-চতুষ্টয় স্ব স্ব ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান কবি, এবং প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন নিঃসন্দেহে বাংলা-কাব্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ; কিন্তু বিশ্বকাব্যের মানদণ্ডে এঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় নন। এঁদের কাছ থেকে যা পাই নি তা নিয়ে খেদ করা যেমন নিরর্থক, তেমনই হাস্যকর পরিমিত কাব্যজীবন লাভ করলে এঁরা কি হতে পারতেন তা নিয়ে অলস কল্পনায় কালক্ষয়। এঁরা আমাদের যা দিয়েছেন, তা-ই আমাদের পাঠ্য ও বিচার্য হওয়া উচিত।

* হাস্যকর এই প্রয়াসের সর্বোত্তম নিদর্শন এক নিঃশ্বাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুল ও সুকান্তের নামোচ্চারণ। মূর্খসুলভ এমন উক্তিও শুনেছি যে, নজরুল বোধশক্তিরহিত না হলে এবং সুকান্ত দীর্ঘজীবী হলে রবীন্দ্রনাথের সমতুল প্রতিভার পরিচয় দিতেন।

।২।

এত কবি থাকতে নজরুল প্রসঙ্গে আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত ও নবীনচন্দ্র সেনের উল্লেখ করলাম কেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এ নিবন্ধের শুরুতেই নজরুলকে আমি খাঁটি বাঙালী কবি বলে নন্দিত করেছি এবং আমার মতে মাত্রার সামান্য হেরফেরে পূর্বোক্ত কবিত্রয়ও তাঁদের বিশিষ্ট বাঙালীয়ানার জন্য নজরুলের সগোত্র। অর্থাৎ, সামগ্রিক বিচারে নজরুলের কাব্যচরিত্রের সঙ্গে এঁদের কাব্য-চরিত্রের চমৎকার মিল আছে। সেই মিল কখনো কখনো কাব্যকে ডিঙিয়ে কবিজীবনকেও স্পর্শ করেছে, উদ্দাম প্রাণশক্তিতে ও বেহিসাবী জীবনযাত্রায় নজরুল ও মধুসূদনের সমগোত্রীয়তা বিস্ময়কর। উভয়ের কাব্যকৃতির তুলনামূলক আলোচনায় অনিবার্যভাবে নজরুলের 'বিদ্রোহী' মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে পড়ে। যুদ্ধবিষয়ক মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্য মূলত বীর রসাত্মক, এর স্রষ্টা 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' ব'লে গ্রন্থের সূচনা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্দিষ্ট মহাকাব্যকে করুণ রসপ্রধান গীতিকাব্যের আঙিনায় দাঁড় করিয়েছেন। অনুরূপভাবে, নজরুলও নিজেকে 'বিদ্রোহী' বলে ঘোষণা করায় এবং 'মহাপ্রলয়ের নটরাজ' 'সাইক্লোন' 'ধ্বংস' 'ঝঞ্ঝা' 'ঘূর্ণি' ইত্যাদি হরেক বর্ণনায় ভূষিত করার সঙ্গে সঙ্গে অবচেতনভাবে উপস্থিত করেছেন তাঁর বিদ্রোহবিরোধী শান্ত সুধীর কবি সত্তাকে, যে-সত্তা কখনও 'বন্ধনহারা কুমারীর বেণী', কখনও 'গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি', কখনও বা কুমারী কন্যার 'থর-থর-থর প্রথম পরশ'! আসলে, নদীমাতৃক শস্যশ্যামল বাংলার কবির কলমে বীর রসের স্বতোৎসার যেন অভাবনীয়, জয়দেবের সময় থেকে অদ্যাবধি বাঙালী কবি রোম্যান্টিক আবেগপ্রবণ রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য ও নৈপুণ্যের নির্ভুল স্বাক্ষর রেখেছেন। বিগত ও বর্তমান শতকের দুই প্রতিভাধর বাঙালী কবি মধুসূদন ও নজরুলের কাব্যকৃতিতে রোম্যান্টিক আবেগোচ্ছ্বাস অন্য সকল বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে গেছে। নবীনচন্দ্রের সঙ্গেও নজরুলের মিল অনস্বীকার্য: ব্যক্তিজীবনে উভয়েই ছিলেন চির-তারুণ্যের অধিকারী, কাব্যজীবনেও সেই প্রাণোন্মাদনার পরিচয় প্রদীপ্ত; নবীনচন্দ্রের মতো নজরুলের রচনাতেও ভাব ও ভাষার সংযমের অভাব পরিলক্ষ্যমান। অতিকথনের বা রুচির দোষে নজরুলের বহু গান যে নষ্ট হয়েছে, প্রসঙ্গত সুবিদিত এ তথ্যের পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও আমি নবীনচন্দ্র বা নজরুলকে

 কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

যথাযথ বাঙালী লেখক বলে মনে করি, কারণ বাগ্‌বাহুল্য ও পরিমিতিবোধের অভাব বাংলা সাহিত্যের অবশ্য স্বীকার্য দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

অসংযম, অশ্লীলতা, রুচিবিকৃতি ইত্যাদির সূত্রে নজরুলের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তুলনাও অনিবার্য। বঙ্কিম-বর্ণিত 'খাঁটি বাঙালী কবি' ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে নজরুলের আত্মীয়তা একাধিক ক্ষেত্রে এবং ভাষায় ভঙ্গীতে দৃষ্টিকোণে বোধ করি অন্য সকল পূর্বসূরীদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই নজরুলের নিকটতম আত্মীয়। 'যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথাই বিদ্রোহ' জাতীয় নজরুল-পংক্তি প্রমাণ করে ঈশ্বর গুপ্তের মতো নজরুলও মেকির শত্রু ছিলেন। অতি-লৌকিক, কথ্য শব্দের ও অনুপ্রাসের বাহুল্য, রঙ্গরস, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, গ্রাম্যতাদোষ, অশ্লীলতা প্রভৃতির সংক্রামে উভয় কবির বহু রচনা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নজরুলের 'অঘ্রাণের সওগাত' ঈশ্বর গুপ্তের 'পৌষপার্বণ' জাতীয় রচনার স্মারক। নজরুলের 'সার্জেন্ট যবে আর্জেন্ট' 'মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা' ইত্যাদি পংক্তির অনুপ্রাস, গুপ্ত কবির 'বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে' 'মদননিধন করণকারণ চরণ-শরণ লয়' 'মুরগির আণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা খেয়ে কর প্রাণ ঠাণ্ডা' প্রভৃতি অনুপ্রাসবহুল পংক্তিকে মনে করিয়ে দেয়। নজরুলের 'প্যাক্ট' 'দে গরুর গা ধুইয়ে' প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক রচনা ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরূপ একাধিক কবিতার সমীপবর্তী। ঈশ্বর গুপ্তের মতো নজরুলও সমসাময়িক ঘটনা ও বিষয়বস্তুকে অবলম্বন ক'রে কবিতা লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। আরও একটি ক্ষেত্রে পূর্বসূরীর সঙ্গে নজরুলের মিল আছে: গুপ্ত কবির মতো নজরুলও সাংবাদিকতা করেছেন; 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মাধ্যমে ঈশ্বরচন্দ্র যে সৎ সাংবাদিকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, 'নবযুগ' ও 'ধূমকেতু'র পৃষ্ঠায় নির্ভীক লেখনীর সাহায্যে নজরুল সেই ক্ষেত্রের সদ্ব্যবহার করেন। শুধু সদ্ব্যবহার নয় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সহিংস অভ্যুত্থানের সমর্থনে রচনা প্রকাশ করে সেই ক্ষেত্রকে দূরপ্রসারী করেছিলেন। 'ধূমকেতু'র অসাধারণ জনপ্রিয়তা সাংবাদিক নজরুলের ঈর্ষণীয় সাফল্যের পরিচায়ক।

সর্বোপরি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত এবং নবীনচন্দ্র সেন—এই তিন বাঙালী কবির মতো নজরুলও ছিলেন দেশপ্রেমিক। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ছিল কথঞ্চিৎ নিরুকণ্ঠ, স্বদেশকে 'শিবের কৈলাসধাম' বা 'শিবধাম' কিংবা 'দেশের কুকুর'কে 'বিদেশের ঠাকুরের' চেয়ে বরণীয় মনে করলেও গুপ্ত কবি কখনও ইংরেজ-বিরোধী হন নি বা হতে সাহস পান নি। তবু ঈশ্বরচন্দ্রের দেশপ্রেম তাঁর একাধিক

রচনায় সপ্রমাণ। মধুসূদনের রাবণের মুখেও পরোক্ষভাবে উচ্চারিত হয়েছে দেশানুরাগ (দৃষ্টান্ত : 'মেঘনাদবধ কাব্য', প্রথম সর্গ)। নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না, 'পলাশির যুদ্ধ' তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। আর নজরুল? নজরুলের গোটা সাহিত্যজীবনই তো দেশপ্রেমের জীবন্ত মানচিত্র। মুকুন্দদাসের উত্তরসাধক নজরুল সার্থকতম বাঙালী চারণকবি।

॥ ৩ ॥

এ প্রবন্ধের সূচনায় বাঙালী চরিত্রের যে তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি সেগুলি হলো: ভাবপ্রবণতা, ধর্মীয় ঔদার্য ও চিত্তের সরসতা। নজরুলের মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই নানাভাবে মূর্ত হয়েছে। ভাবপ্রবণতা বা তারুণ্যের প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস নজরুলের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে গুণ ও অপগুণ হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'বিদ্রোহী'। জনপ্রিয়তম এই কবিতাটিতে কবির ভাবাবেগ জোয়ারের ঐশ্বর্যে প্রবাহিত, কিন্তু সে আবেগ মননের বকযন্ত্রে পরিশোধিত না হওয়ায় সুপাঠ্য হয়েও কবিতাটি শেষ পর্যন্ত মহৎ কবিতার ছাড়পত্র পেল না। স্ববিরোধী চিন্তায় ও উক্তিতে পূর্ণ এই কবিতা যতখানি আবৃত্তির যোগ্য, ততখানি পাঠ্য নয়, যতখানি পাঠ্য, ততখানি মননযোগ্য নয়, অথচ কবির দুর্ভাগ্যক্রমে এই কবিতাটিই তাঁকে আবেগপ্রবণ বাঙালীর কাছে 'বিদ্রোহী' রূপে খ্যাতি চিহ্নিত ক'রে রেখেছে। ভাবপ্রবণ বাঙালীর কাছে ভাবাবেগসর্বস্ব কবিতার সমাদর স্বাভাবিক। যে রাজ-'নৈতিক অধ্যয়ন ও শিক্ষা 'বিদ্রোহের' প্রাথমিক শর্ত, 'বিদ্রোহী'তে তা পালিত হয় নি, হ'লে 'বিদ্রোহী'-তে কবি নিজেকে 'চেঙ্গিজ', 'নৃশংস' বা 'অভিশাপ পৃথ্বীর' ব'লে বর্ণিত করতেন না, 'শত্রুর সাথে গলাগলি'তে রাজী হতেন না, কিংবা ঘোষণা করতেন না --'আমি মানি না ক' কোন আইন'। কারণ সহজ বুদ্ধিতে বোধগম্য, বিদ্রোহেরও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম একটা আইন আছে, কোন সমাজ-সংস্কারক কোন জাতবিদ্রোহী কখনই শত্রুর সাথে গলাগলি করেন না। নজরুল ছিলেন আজন্ম কবি, তাঁর দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব প্রেরণা ও উপলব্ধি-গত। এই একই মন্তব্য তাঁর সাম্যবাদ সম্পর্কে প্রযোজ্য; নজরুলের সাম্যবাদ শিক্ষাগত নয়, কবিসুলভ অনুভবের ফল। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যতই বলুন না কেন, নজরুল কখনই মার্কসবাদে শিক্ষিত সাম্যবাদী ছিলেন না,

অন্তত রূপবিদ্রোহের প্রভাবকে তিনি সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। নজরুল যে বিদ্রোহী নন, মনে-প্রাণে রোমান্টিক প্রেমিক বাঙালী, বহুপঠিত 'বিদ্রোহী' কবিতা ছাড়া অন্যত্রও তার পরিচয় মেলে। কবি নিজেই বলেছেন :

আজ বিদ্রোহীর এই রক্তরথের চূড়ে
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে! ('বিজয়িনী' : ছায়ানট)

ধর্মীয় ঔদার্য নজরুল-সাহিত্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এবং এ ক্ষেত্রেও নজরুল বাঙালী। প্রাদেশিক শোনালেও উল্লেখযোগ্য, ধর্মের ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় বাঙালী অপেক্ষাকৃত ভাবে উদার। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ও উত্তেজনার কারণ বাঙালীর মৌল চরিত্রে নয়, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে নিহিত। ব্যক্তি জীবনে নজরুল ছিলেন সকল রকম সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে, তাঁর কাছে মানুষের একমাত্র পরিচয় ছিল নির্মল মানবতা। ধর্মসূত্রে মুসলমান হয়েও তিনি হিন্দু রমণী বিবাহ করেছিলেন, পুত্রদের হিন্দু নামকরণ করেছিলেন, স্রষ্টা হিসাবে রচনা করেছিলেন বহু শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণবগীতি; ব্যবহার করেছিলেন হিন্দু ধর্ম ও পৌরাণিক প্রসঙ্গবহুল বহু উপমা, রূপক ও বাক্‌-প্রতিমা : 'শ্যামের বাঁশরী', 'ছিন্নমস্তা চণ্ডী', 'পরশুরামের কঠোর কুঠার', 'হল বলরাম-স্কন্ধে', 'ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য'। স্ব-সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় নজরুল স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন :

"'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্যধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।"

সার্থক কবির মতো নজরুল যে যথার্থই মানবতাবাদী, তার অসংখ্য প্রমাণ নজরুল-কাব্যে বিকীর্ণ। এবং যে সুরে তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন, তা আবহমান বাঙালী কবির সুর, চণ্ডীদাস থেকে যার সূচনা। চণ্ডীদাসের 'শুনহ মানুষ ভাই। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এবং নজরুলের 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান' একই মনোভূমি থেকে আবির্ভূত। বাংলার লোকায়ত কবিদের সঙ্গেও নজরুলের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ : মানুষের মধ্যেই ভগবান, মানবদেহেই মন্দির-মসজিদ, সত্যের পথ মন্দির-মসজিদে ঢাকা থাকে বলে পরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে মানুষের বিলম্ব কিংবা ব্যর্থতা ঘটে— বাউল গানের অন্যতম এই সুর নজরুল কাব্যেও ধ্বনিত। 'এই হৃদয়ের চেয়ে

বড়ো "কোনো মন্দির-কাবা নাই' এবং 'তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়, ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়' এই দুই বিখ্যাত নজরুল-পংক্তি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য। বক্তব্যের স্পষ্টতার জন্ম অনুরূপ ভাবে স্মরণীয় আরেকটি অংশ (যদিও এতে কাব্যগুণ কিঞ্চিৎ ন্যূন): 'জননী আমার ফিরিয়া চাও/ ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও/চাই মানবতা তারে দ্বারে/কর হানি মাগো বারে বারে/দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।' হিন্দু বা ইসলাম, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান, তথাকথিত সকল ধর্মের চেয়ে বড়ো ধর্মের নাম মানবধর্ম, মানুষকে ও মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত ধর্ম ধর্মবিকৃতির নামান্তর, অতএব তা সর্বথা ও সর্বদা পরিত্যাজ্য, নজরুল নানাভাবে এই প্রত্যয়কে বাণী-মূর্তি দিয়েছেন। এবং আমার মতে এইখানে সার্থক বাঙালী, যে-বাঙালীকে ধর্মীয় গোঁড়ামি কখনও আচ্ছন্ন করে নি।

বাঙালী চিত্তের ঔদার্য, অন্যভাবে সর্বজনীনতা, শিল্প-সাহিত্যেও সপ্রমাণ। অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় বহিরাগতকে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে বরণ করে নেওয়ার ক্ষমতা বাঙালীর অধিকতর—প্রাদেশিক শোনালেও এ উক্তির উচ্চারণে আমি কুণ্ঠাহীন। অন্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আপাতত সাহিত্য সূত্রে বলি, বিদেশী প্রভাবের স্বীকরণে বাঙালীর ভূমিকা বরাবরই অগ্রপথিকের। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে বৈদেশিক প্রভাবের সক্রিয়তা আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না, এবং দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রভাব সঞ্জীবনীশক্তির কাজ করে এসেছে। আরবী-ফার্সী শব্দের অনুপ্রবেশে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য এবং এই ধরনের বিদেশী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ নজরুল-সাহিত্যে প্রশংসার্হ-ভাবে লক্ষণীয় হলেও মনে রাখতে হবে, মুকুন্দরাম, আলাওল, ভারতচন্দ্র থেকে শুরু ক'রে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলালের মতো নজরুলের পূর্বসূরী এবং সমসাময়িক লেখকরাও আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহারে স্ব স্ব সৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বলা দরকার, আমার এই উক্তি নজরুলের কৃতিত্ব কমাবার জন্য উচ্চারিত নয়, বিদেশী ভাষার শব্দাবলীর আমদানিতে নজরুল যে বাংলার ঐতিহ্যকে সার্থকতর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এইটিই আমার মূল বক্তব্য। এবং এই ঐতিহ্যের পথে পদচারণার সময়েই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, আরব-ইরান থেকে আমদানির যোগ্য আরও অনেক সম্পদ আছে। বাংলা সাহিত্যের জন্য নজরুলের সমাহৃত সেই সম্পদ : আরবী ছন্দ, গজল গান, ইসলামী আর্সিয়া গান এবং অসংখ্য আরবী-ফার্সী শব্দ। বলা বাহুল্য, এই সব বিদেশী সম্পদ নজরুলের প্রতিভা স্পর্শে পুরোপুরি বাংলার হয়ে উঠেছে। 'দোদুল দুল' (দোলন-

ছাপার অন্তর্গত) পড়ার সময় মনে হয় না ওটি আরবী মোতাকারিব্ ছন্দে লেখা, 'বসিয়া বিজনে/কেন একা মনে, পানিয়া ভরনে চল লো গোরী' শুনলে মনে হয় না বিদেশী গজল গান শুনছি, আবার 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' গানটি 'আমিনা' প্রভৃতি ফার্সী শব্দগুলি বদলে দিলে রামপ্রসাদী গান হয়ে দাঁড়ায়। নজরুলের ক্ষেত্রে বিদেশী ভাব-ভাষার দেশীয়করণ সহজ হওয়ার একটি কারণ বোধ করি, দেশের মাটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ। দেশী-গ্রাম্য-কথ্য শব্দাবলীকে নজরুল অনায়াসেই মেলাতে পেরেছিলেন সংস্কৃত তৎসম ও আরবী-ফার্সী শব্দনিচয়ের সঙ্গে এবং সেই সার্থক মেলবন্ধনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্পন্ন ও শক্তিমান করেছিলেন। উদাহরণ না বাড়িয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়, ধর্মীয় ঔদার্য ও চিত্তের সর্বজনীনতা বাঙালী চারিত্র্যের উত্তরাধিকার নজরুলের জীবনে ও সাহিত্যে সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এ দিক থেকে তিনি সার্থক বাঙালী লেখকদের অন্যতম।

হাজার দুঃখেও বাঙালীর মুখের হাসি মেলায় না, শীর্ণ হয় না তার চিত্তের রসধারা। প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১-এর পূর্ববাংলায় বিদেশী বর্বরতার ভয়াবহ দিনগুলি পর্যন্ত—ইতিহাসের উপল বন্ধুর পথে বাংলা-দেশে বাঙালীর জীবনে অসংখ্যবার আঘাত অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, তবু বাঙালী কোনদিন ভেঙে পড়ে নি, বারংবার রাত্রিকে জয় করে নতুন উষার স্বর্ণদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। মুকুন্দরাম কিংবা ঈশ্বর গুপ্ত থেকে নজরুল ইসলাম, বাংলার বহু ক্ষমতাপন্ন লেখক জাতিগত দুর্যোগকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই ব্যক্তিগত জীবন ছিল দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জরিত, তবু এঁদের রচনায় হাস্যরস রঙ্গকৌতুকের স্নিগ্ধধারা কখনও দুর্লক্ষ্য হয় নি। যে-কলমে পরাধীনতার জ্বালা যন্ত্রণা ও দারিদ্র্যের বেদনা রূপায়িত করেছেন নজরুল, সেই কলমেই তিনি সৃষ্টি করেছেন বহু অনবদ্য ব্যঙ্গকবিতা ও হাসির গান। এই সূত্রে আবার মনে পড়ে ঈশ্বর গুপ্তকে, ব্যক্তিগত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টিতে যিনি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। 'পাঁঠা'র স্তোত্র রচনায়, 'তপ্‌সে মাছে'র উপভোগে বা 'আনারস'র রসাস্বাদনে ব্যস্ত গুপ্ত কবি 'অঘ্রাণের সওগাতে' উল্লসিত নজরুলের নিকট প্রতিবেশী। নজরুলের "'গিন্নি-পাগল' চালের ফিরনি/তশতরী ভরে নবীনা গিন্নি/হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে" কিংবা "বৌ করে পিঠা, 'পুর'-দেওয়া মিঠা জিভে সরে আসে জল"-এর সরস পংক্তি উচ্চারণের সময় মনে আসে ঈশ্বর গুপ্তের 'পৌষপার্বণ'। অনুপ্রাসবহুল ব্যঙ্গাত্মক কাব্য-রচনায় নিপুণ

ঈশ্বর গুপ্তের একাধিক রচনা স্মরণে আনে নজরুলের 'বিরহিনী নিমফুল কাটা খায়ে ফুল / ফুল দেখে ফুলবালা ফুল না ফুলে' জাতীয় পংক্তি। এবং এই মুহূর্তে মনে আসছে একটি অসাধারণ ব্যঙ্গগর্ভ নজরুল-পংক্তি 'সস্তা দরে দস্তা-মোড়া আসছে স্বরাজ বস্তা-পচা'। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির বহু পূর্বে উচ্চারিত এই উক্তি এক নিমেষেই উন্মোচিত করে আমাদের ইতিহাসের একটি নির্মম অধ্যায়, সৌভাগ্য-বশত কবির সঙ্গে যার পরিচয় ঘটে নি। কবি মাত্রই ক্রান্তদর্শী, যিনি এ কথা বলেছিলেন, এখন আমি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করি।

নিঃসন্দেহে নজরুল বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ। দোষেগুণে তিনি এমন একজন কবি, যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। নিখাদ দেশপ্রেম, গভীর মানবতাবোধ, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, তারুণ্যের মাদনা, সহজ রসবোধ, স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গী তাঁর রচনার গুণ; অন্য পক্ষে সংযমের অভাব, গ্রাম্যতা এবং স্থূল রুচি তাঁর বহু কবিতা ও গানকে অনিন্দ্য হতে দেয় নি। নজরুল সম্পর্কে আমার বক্তব্যের সারাংসার এই: নজরুল শক্তিমান কবি হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের দূরবর্তী; আসলে, যা নেই তা নিয়ে খেদ নিরর্থক, নজরুলে যা পাওয়া যায়, নজরুল তাতেই মহৎ। আমার বিচারে, নজরুল বিশ্বকবি নন, বাঙালী কবি; ঈশ্বর গুপ্তের মতো খাঁটি বাঙালী কবি। এবং সম্ভবত শেষ খাঁটি বাঙালী কবি। গুপ্ত কবি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি নজরুল সম্পর্কেও প্রযোজ্য: 'এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না, জন্মিবার যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই।'

। লেখক পরিচিতি ।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুবক্তা, কবি, গীতিকার ও লেখক। রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও সুপরিচিত।

ডঃ আনিসুজ্জামান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীডার।

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী। ক'লকাতার সিটি কলেজ (কমার্স)-এর বাঙলাভাষার অধ্যাপক। গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা- এবং গল্পকার হিসেবে পরিচিতি আছে।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাশ। ক'লকাতার মৌলনা আজাদ কলেজ এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রখ্যাত গবেষক।

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। ক'লকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

নেপাল মজুমদার। রবীন্দ্র-সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক।

রণেশ দাশগুপ্ত। ঢাকার 'সংবাদ' দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। কবি ও প্রবন্ধকার হিসেবে সুপরিচিত।

সুনীল মুখোপাধ্যায়। 'জসীমউদ্দীন' গ্রন্থের জন্য 'দাউদ-পুরস্কার' প্রাপ্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক।

চিন্মোহন সেহানবীশ। সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক, গবেষক ও প্রবন্ধকার।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। প্রবীন রাজনৈতিক নেতা, সুলেখক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবীন সাংবাদিক ও সুলেখক।

গোপাল হালদার। প্রাক্তন অধ্যাপক, 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক এবং গবেষক হিসেবে সুপরিচিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র। সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত সুকবি, ঔপন্যাসিক ও অজস্র ছোট গল্পের রচয়িতা।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সুকবি ও প্রখ্যাত সাংবাদিক; 'যুগান্তর' ও 'দৈনিক বসুমতী' সংবাদ-পত্রের প্রাক্তন সম্পাদক। বর্তমানে 'সত্যযুগ' (ক'লকাতা) দৈনিক সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক।

দক্ষিণারঞ্জন বসু। 'যুগান্তর' দৈনিক সংবাদপত্রের বার্তা সম্পাদক, সুলেখক ও কবি।

হাসান মুরশিদ। 'হাসান মুরশিদ' ছদ্মনামে প্রকৃত নাম গোলাম মুরশিদ। রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক এবং সুলেখক।

ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত। নজরুল-সাহিত্যের সুপরিচিত গবেষক।

বাঁধন সেনগুপ্ত। নজরুল-সাহিত্যের গবেষক, কবি এবং লেখক হিসেবে পরিচিতি আছে।

আতাউর রহমান। বাঙলাদেশের অন্তর্গত বগুড়া (সরকারী) কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও সুকবি।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কবি এবং গবেষক হিসেবে পরিচিত।

রঘুবীর চক্রবর্তী। (বর্তমান 'রবীন্দ্রনাথ' নজরুল ও বাঙলাদেশ' সংকলন গ্রন্থটির সম্পাদক); বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত হুগলী মহসীন কলেজ এবং ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও প্রবন্ধকার, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুচিন্তিত মতামতের জন্য সুপরিচিত।